দুই তার

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. এম্‌. লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌
কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার

ডি. এম্. লাইব্রেরী

৪২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible] টাকা

প্রিণ্ট

আলে

যে

"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ

প্রেয়ঃ সর্ব্বস্মাদ্ অন্যাৎ"

তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দিবার জন্য

"আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়ন-জলে

ব্যর্থ সাধনখানি।"

এই বইয়ের প্রথম ও শেষ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার মোটা সূত্র কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মুখে মুখে আমায় বলিয়াছিলে সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমি মধ্যের ঘটনাগুলি গাঁথিয়াছি।

এই উপন্যাস "প্রবাসীতে" ধারাবাহিক ভাবে এক বৎসর প্রকা হইয়াছে। তারপর প্রবাসীর সম্পাদক পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চা পাধ্যায় মহাশয় উহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সুবিধা অনুমতি দিয়াছেন।

এইজন্য ইঁহাদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীক করিতেছি।

দোল-পূর্ণিমা
১৩ই চৈত্র, ১৩২৪

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

"জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে।
জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে।"

দুই তার

(১)

সন্ধ্যা হব হব। উজাড়-পড়া নীলমহানি গ্রামের পোড়ো নীল
র যে ঘন জঙ্গল গজাইয়া উঠিয়াছিল সেই বনের ধারে একজন
ত সন্তর্পণে চারিদিকে উঁকি মারিতে-মারিতে বকের মতন পা ফে
লিয়া কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। সে অল্প অগ্রসর হইতে
র থমকিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতেছিল কোথাও কিছু
না যাইতেছে কি না; চকিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে
থাও কিছু দেখা যাইতেছে কি না। বনের প্রান্তে একটা ব
মরাঙা গাছ মাথায় অস্ত-সূর্য্যের সোনালি আভার পাগড়ি
াইয়া ঘন পল্লবপুঞ্জ কাঁপাইতেছিল। সেই লোকটি এই গাছের
আসিয়া একবার সন্তর্পণে চারিদিক চাহিল, তারপর ক্ষিপ্রতার সহিত
ড়িতে লাগিল। কিছুদূর উঠে আর চারিদিকে তাকায়। ক্রমে
ছের আগডালে উঠিয়া ঘন-পল্লবপুঞ্জের মধ্যে আপনাকে গোপন ক
করিয়া বসিয়া রহিল।

লোকটির অসীম ধৈর্য্য। সূর্য্য অস্ত গেল; কামরাঙা গাছের
হইতে সোনালি আভা মুছিয়া গেল; বনের মাথার আকাশের ল
দিয়া ধূসর হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা কালো হইয়া উঠিল, সমস্ত গাছপ
র রূপ লুপ্ত হইয়া সমস্ত বন একটি বড় ঝোপের মতন দেখ
ল; কুঠির কামরা ছাড়িয়া বাদুড় চামচিকা ফরফর ফরফর ক
অন্ধকারের জমাট টুক্‌রার মতন ছিট্‌কাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া প

লাগিল। কয়েকটা বাদুড় ফলের লোভে কামরাঙা গাছের উপর ঝপ্-ঝপ্ করিয়া আসিয়া পড়িল; নীলকুঠির অসংখ্য নর্দ্দমা হইতে শেয়ালের দল বাহির হইয়া আকাশের দিকে মুখ উঁচু করিয়া লেজ ঝুলাইয়া গলা ছাড়িয়া রাত্রির আরত্রিক-আহ্বান করিল; ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়িয়া প্রবল গুঞ্জনে অন্ধকার যেন জমাট করিয়া তুলিল; সেই লোকটি তবু নিশ্চল, ঠায় বনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়াই আছে।

এই নীলমহানি গ্রামে এখন আর একঘর লোকেরও বাস নাই। এক কালে ইহা বেশ শ্রীসম্পন্ন ছিল। এখানে হাতীকান্দা ও ঘোড়ামারা পরগণার বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার গুণময় চৌধুরীর নীলকুঠি ছিল; একজন ইংরেজ ছিল কুঠিয়াল। সুতরাং পরিষ্কার পথ-ঘাটে ও সুবিন্যস্ত বাগান-বাগিচায় গ্রামখানি সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। নীলের কাজে খাটিবার জন্য বহু ভিন্নদেশী মজুর আসিয়া গ্রামখানিকে জনবহুল করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর বিলাতী কৃত্রিম নীলের প্রতিযোগিতায় যখন নীলের ব্যবসায়ে লোকসান হইতে লাগিল তখন গুণময়-বাবু নীলের কারবার তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন; ইংরেজ বিদায় হইল; ভিন্নদেশী মজুরেরা অন্যত্র কর্ম্মের সন্ধানে সরিয়া পড়িল; ছবির মতো সুশ্রী গ্রামখানি সুন্দরী বিধবার মতন শূন্য নিরর্থক হইয়া গেল।

ক্রমে ফুলবাগানে আগাছার জঙ্গল ভরিয়া উঠিল; সাহেবের কুঠিতে বাদুড়-চামচিকার বাসা হইল; নীলকুঠির অসংখ্য [illegible] নালী সুড়ঙ্গ সুঁড়িপথের গোলকধাঁধায় শেয়াল শূওর ও বাঘের লুকাচুরি হুড়াহুড়ির আড্ডা হইল; অশ্বথ-বটের চারা কুঠির টুঁটি মুঠিতে চাপিয়া তাহার অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহিতেছিল; রোদ বাতাস উই ইঁদুরে মিলিয়া দরজা-জানালাগুলি কঙ্কালের পঞ্জরের ন্যায় জীর্ণ জর্জ্জর করিয়া তুলিয়াছিল।

লোকটি গাছের ডগায় বসিয়া-বসিয়া ভগ্ন নীলকুঠির জীর্ণ দরজা-

জানলার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিতেছিল। দেখাও ত আর চলিল না; অন্ধকার ঘন হইয়া বনকে গহন করিয়া তুলিল। তবু তাহার নড়িবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

অকস্মাৎ বনের মধ্য হইতে মৃদু আলোর ক্ষীণ রেখা অন্ধকার আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠিল, যেন কষ্টিপাথরে সোনার কষ, যেন নীলাম্বরী শাড়ীতে জরির ডোরা।

তখন সেই লোকটি গাছের ডগা হইতে নিঃশব্দে নামিয়া পড়িল। আলোক লক্ষ্য করিয়া বনজঙ্গল দুহাতে সরাইয়া সরাইয়া সে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল। বন পার হইয়া নীলকুঠির পাকা নালীর গোলক-ধাঁধার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; সেই ঘরের জানলা সব বন্ধ, তাহাদেরই জীর্ণ পঞ্জর দিয়া আলোর সোনালি ঝারা বাহির হইয়া আসিতেছিল। লোকটি কপাটের ফাঁকে-ফাঁকে চোখ দিয়া অনেকক্ষণ উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া ভিতরে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বুঝিতে পারিল না ভিতরে কোনো লোক আছে কি না; কোথাও মানুষের এতটুকু সাড়াশব্দও নাই।

তখন সে দরজায় জোরে আঘাত করিয়া হাঁকিল—ঘরে কে আছ দরজা খোলো।

অমনি ফস করিয়া ঘরের আলো নিভিয়া গেল—নিবিড় অন্ধকার।

লোকটি তখন সর্ব্বাঙ্গের চাপ ও জোর দিয়া দরজায় আঘাত করিয়া ঠেলা মারিল জীর্ণ দরজার পল্কা হুড়কা, মড়াৎ করিয়া ভাঙিয়া দরজা খুলিয়া গেল; লোকটিও অমনি দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই একটি বিদ্যুৎমশালের চাবি টিপিয়া ধরিল আর অমনি সমস্ত ঘর বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে প্লাবিত হইয়া গেল; লোকটি চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। পড়িয়া আছে একটা জীর্ণ শয্যা, একখানা কাপড়,

গোটাকতক হাঁড়িকুঁড়ি, আর একটা সন্থ-নির্ব্বাপিত তেল-ভরা প্রদী
তাহার সলিতার মুখ হইতে তখনো ধোঁয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া উঠিতেছি
সেই লোকটি মশালের উজ্জ্বল আলোক সামনে ছড়াইয়া পাশের এক
খোলা দরজা দিয়া ছুটিয়া যাইতেই দেখিতে পাইল একজন যুবতী স্ত্রীলো
একজন তরুণ কান্তিমান্ পুরুষকে জড়াইয়া ধরিয়া লইয়া সেই কামরা পা
হইয়া পলাইতেছে—পুরুষটি এক হাতে স্ত্রীলোকটির গলা জড়াইয়া ধরি
তাহার উপর সর্ব্বাঙ্গের ভর রাখিয়া অতি কষ্টে দ্রুত চলিবার চেষ্
করিতেছে। আগন্তুক লোকটি দেখিয়াই বুঝিল যে, তরুণী স্ত্রীলোক
যাহাকে লইয়া পলাইতেছে সে পীড়িত ও দুর্ব্বল।

আগন্তুক লোকটি চকিতে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া উহাদের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া হাঁকিয়া বলিল—দাঁড়াও বলছি, নইলে এই গুলি করলাম!

স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল আর বিদ্যুৎমশালের সমস্ত আলোটা তাহার সুন্দর মুখের উপর গিয়া পড়িল।

লোকটি তরুণীর মুখ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত! তাহার হাতের পিস্তল নামিয়া পড়িল, তাহার বিদ্যুতের মশাল কাঁপিতে লাগিল; তাহার মুখে বিস্ময় বিরক্তি সন্দেহ ক্রোধ পর পর ফুটিয়া উঠিল; সে গর্জ্জন করিতে গিয়া গোঙানি স্বরে বলিয়া উঠিল—রাজু! তুমি এখানে!

রাজবালা যেমন দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া ছিল নীরবে তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

পীড়িত লোকটি রাজবালার গলা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—নমস্কার দারোগা-বাবু! আপনি আমার এই নতুন বাসার ঠিকানা জানতে পেরে সদলবলে নিমন্ত্রণ করতে আসছেন

সেই খবরটি আপনার স্ত্রী অনুগ্রহ করে আমাকে আগেই দিতে এসেছিলেন!

দারোগা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঢোক গিলিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—খোকা কই?

রাজবালা দিব্য সহজ ভাবে বলিল—সে তার দিদি-মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ী বেড়াতে গেছে।

দারোগা এতক্ষণে আপনার বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিল। রুক্ষ স্বরে বলিল—স্বামী পুত্র ফেলে এই বিজন বনে রাত্রিকালে পলাতক আসামীর কাছে আসা দারোগার স্ত্রীর উপযুক্ত বটে!

রাজবালা স্বামীর শ্লেষপূর্ণ তিরস্কারে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত না হইয়া তেমনি দৃপ্তভাবেই বলিল—তুমিই ত আমাকে আসতে বাধ্য করেছ! একজন নির্দ্দোষী লোককে দশ বচ্ছর দ্বীপান্তরে পাঠিয়েও তোমার তৃপ্তি হয়নি; সে দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এসে তোমার ছেলেকে যমের মুখ থেকে কেড়ে এনে দিল, তার পুরস্কারে তোমরা তাকে ঠেঙিয়ে আধমরা করে ফেললে; তাকে আবার জেল-খাটাতে হবে বলে তাকে তোমরা শিকারের মতন বনে বনে তাড়া করে বেড়াচ্ছ! নির্দ্দোষীকে নির্য্যাতন করলে আমার স্বামীপুত্রের অকল্যাণ হবার ভয়েই আমাকে এমন জায়গায় আসতে হয়েছে। এঁকে রক্ষা করে আমি আমার স্বামীকে অধর্ম্ম থেকে রক্ষা করব।

দারোগা দারুণ ক্রোধ দমন করিয়া বলিল—তুমি ওকে কি করে রক্ষা করবে? এই বন কনষ্টেবল চৌকীদার ঘেরাও করে আছে। জমাদার কুঠির বাইরে হাজির আছে; আমার বাঁশীর সঙ্কেত শুনলেই তারা ছুটে এসে ওকে গেরেপ্তার করবে। তুমি ওকে বাঁচাবে কি করে?

রাজবালা সহজ ভাবেই বলিল—তুমি বাঁশী বাজাতে পারবে না; বাঁশী

বাজালে তোমার লোকেরা এসে দেখবে দারোগা-বাবুর স্ত্রী আসামীকে দুই হাত দিয়ে আগ্‌লে রয়েছে। তারা আমার গায়ে হাত না দিয়ে এঁর গায়ে হা দিতে কিছুতেই পারবে না। তুমি যদি তোমার সে অপমান দেখতে চাও বাজাও তবে তোমার বাঁশী !

দারোগা বিব্রত হইয়া বলিল—আঃ রাজু ! কী ছেলেমানুষী কর ? খুনী মামলায় গভর্মেণ্ট ফরিয়াদী ! গভর্মেণ্ট তোমার আবদার শুনবে না। সে বড় শক্ত ঠাঁই !···তুমি একবার পাশের ঘরে যাও, জমাদার একে নিয়ে থানায় চলে যাক, তারপর আমি তোমায় নিয়ে যাব।

রাজবালা স্বামীর কথার উত্তর দিল না বা তাহার দিকে আর তাকাইল না। সে নত হইয়া ভূমিতে পতিত পীড়িত লোকটিকে দুই হাতে ধরিয়া মমতা-ভরা স্বরে বলিল—চল, তুমি বিছানায় শোবে।

সে একবার রাজবালার মুখের দিকে, একবার তাহার স্বামীর মুখের পানে চাহিল। রাজবালা আবার বলিল—ওঠ।

দারোগা আসামীর দৃষ্টিতে দ্বিধা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল—বীরেন-বাবু, আপনি রাজুকে বুঝিয়ে বলুন।

বীরেন্দ্রের মুখে ক্লান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে কি বলিতে যাইতেছিল। রাজবালা তাহাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া তাহার বাম হাত লইয়া আপনার গ্রীবার উপর রাখিল এবং দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া স্বামীকে আদেশ করিল—আলো দেখাও।

দারোগা অবাক হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আলো দেখাইয়া আগে-আগে চলিল। প্রথম ঘরে আসিয়া রাজবালা বীরেন্দ্রকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল এবং দেশালাই জ্বালিয়া প্রদীপটি জ্বালিল ; তারপর একটা ভাঁড় হইতে একটা খুরিতে একটু দুধ ঢালিয়া বীরেন্দ্রকে খাওয়াইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

দারোগা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ স্ত্রীর কাণ্ড দেখিল। তারপরে ডাকিল —রাজু!

রাজবালা মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিল।

"আসামীকে আশ্রয় দিচ্ছ, এতে তুমি বিপদে পড়বে জ[illegible]"

"তোমার স্ত্রীকে বিপদে ফেলা না-ফেলা ত তোমার হাত। তুমি এঁকে আসামী না করলেই ত [illegible]ল গোল মিটে যায়—আরো যখন জানো যে ইনি নির্দোষ।"

"জানলেই বা কি করছি বল? জমিদার গুণময়-বাবুর এঁর ওপর জাতক্রোধ; নায়েব-মশায় বলছে শশী-জেলে এঁরই প্ররোচনায় তার কান কেটে ছেড়ে দিয়েছে! এঁকে না গেরেপ্তার করলে তারা আমার শত্রু হবে; শেষে আমার চাকরিটি যাবে।"

রাজবালা দৃপ্তভাবে বলিয়া উঠিল—যে চাকরীতে নির্দোষকে বিপদে ফেলতে হয় এমন চাকরী যাওয়াই ভালো!

দারোগা বলিল—নির্দোষ যদি তবে তার আর ভয় কি? বিচারে খালাস পেয়ে যাবে।

রাজবালা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—হ্যাঁ, যেমন খালাস পেয়েছিলেন সেবার!

দারোগা অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি তবে একে ছেড়ে বাড়ী যাবে না?

—যতদিন তুমি খোকার দিব্যি করে না বলছ যে এঁকে আসামীর দলে টানবে না, ততদিন আমি এঁকে ছেড়ে যেতে পারব না।

দারোগা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—এরপর যদি তোমায় আমি ঘরে ঠাঁই না দিই?

রাজবালা শান্ত অবিচলিত স্বরে বলিল—কাৎলামারি বিলের কোলে আমার ঠাঁই মিলবে।

বীরেন্দ্র ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—ওকি রাজু! তুমি বাড়ী যাও। স্বামীর প্রতিকূলতা করা তোমার উচিত হচ্ছে না।

রাজবালা তেজের সহিত বলিল—স্বামীর অনুকূল হয়ে ধর্ম্মের প্রতিকূলতা করাই কি উচিত হবে?

দারোগা স্ত্রীর দৃপ্ত ভাব দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিল—তবে এঁকে সুদ্ধ নিয়ে বাড়ী চল।

রাজবালা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—যেখানে যেতে বলছ, সেটা আমাদের বাড়ী বটে, কিন্তু এঁর কাছে সে জায়গা থানা—হাজত।

তাহার এই অসাময়িক হাসি ও ব্যঙ্গ দেখিয়া দারোগার অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি সে ক্রোধ দমন করিয়াই বলিল—আচ্ছা, আমি এঁকে আসামীর দল থেকে খারিজ করে দেবো।

রাজবালার সুন্দর চোখ দুটি উৎসুক আগ্রহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে স্বামীকে বলিল—তুমি দারোগা, তোমার কথায় বিশ্বাস কি?

দারোগা মর্ম্মাহত হইয়া বলিল—দারোগাকে তার স্ত্রীও কি বিশ্বাস করতে পারে না রাজু? তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ, কিন্তু তুমি আমায় ভাঁড়িয়ে এই বিজন বনে এসে আছ, আমি ত তার জন্যে তোমায় অবিশ্বাস করিনি।

রাজবালার মনে পড়িল স্বামীর ক্রুদ্ধ অবিশ্বাসের নির্ম্মম কথা—"এরপর যদি তোমায় আমি ঘরে ঠাঁই না দিই?" কিন্তু সে তাহার ইঙ্গিতমাত্র না করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—আমি দারোগার সহধর্ম্মিণী হলেও আমি ত আর দারোগা নই।

দারোগা স্ত্রীর শ্লেষ আর ব্যঙ্গে বিব্রত ও বিরক্ত হইয়া বলিল—ধর্ম্ম সাক্ষী, ভগবান জানেন,……

রাজবালা বাধা দিয়া বলিল—থামো। ধর্ম্ম কিংবা ভগবান তোমার নেই, থাকলে তুমি এত অন্যায় অধর্ম্ম করে বেড়াতে পারতে না।

দারোগা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আচ্ছা, তবে তোমার দিব্য……

রাজবালা গম্ভীর হইয়া বলিল—এতদিন বিশ্বাস ছিল যে তুমি আমায় খুবই ভালো বাস; কিন্তু এই মাত্র তুমি আমায় ঘরে ঠাঁই দেবে না বলে ভয় দেখাতে পেরেছ—তুমি আমায় ভালো বাসলে অমন কথা বলতে পারতে না। বল—খোকার দিব্য……

দারোগা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—রাজু, তুমি তার আপন মা হলে এমন কথা বলতে পারতে না! তুমি তার সৎ-মা কিনা, তাই তার অকল্যাণে তোমার ভয় নেই।

—ভয় আছে বলেই ত তার বাবাকে অধর্ম্ম থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি। আমার ছেলেকে বসন্ত-রোগের গ্রাস থেকে যে বাঁচিয়েছে তাকে সেই ছেলের বাপ যে বধ করবে এ আমি দেখতে পারব না। তাই খোকার দিব্যি করতে হবে তোমায়।

—না না, আমি ছেলের দিব্যি করতে পারব না। আর যে দিব্যি বল করছি।

রাজবালা স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া বীরেন্দ্রকে বাতাস করিতে লাগিল।

ঘর নিস্তব্ধ। ক্ষণেক পরে একদল শেয়াল কোলাহল করিয়া উঠিল; একটা পেঁচা চ্যাঁ চ্যাঁ করিতে-করিতে কুঠির উপর দিয়া উড়িয়া গেল; কয়েকটা ঝিঁঝিঁ কঠিন শব্দে অন্ধকার যেন চিরিয়া ফেলিতে লাগিল।

কাতর স্বরে বীরেন্দ্র বলিয়া উঠিল—হংসেশ্বর-বাবু, আমি স্বেচ্ছায় পালিয়ে আসিনি; আমি দুপক্ষের দাঙ্গার মধ্যে পড়ে জখম হয়ে পড়েছিলাম, জেলেরা আমার নিষেধ না শুনে আমাকে এখানে এনে

ফেলেছে। আমি একটু চলতে পারলেই আপনি গিয়ে ধরা দিতাম। আমার জন্যে আপনাদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটছে মিছামিছি। আপনি আমাকে গেরেপ্তার করে নিয়ে চলুন।

রাজবালা দৃঢ়স্বরে বলিল—তোমাকে গেরেপ্তার করতে হলে আমাকেও গেরেপ্তার করতে হবে; আমি ফেরারী আসামীকে লুকিয়ে রেখেছি!

দারোগা হংসেশ্বর স্ত্রীর দৃঢ়তা দেখিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, খোকার দিব্যি করেই বলছি।

রাজবালা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার সুন্দর মুখ সফলতার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

দারোগা বলিল—এখন একখানা গোরুর গাড়ী দেখতে হয়, নইলে তোমরা যাবে কি করে?

রাজবালা হাসিয়া বলিল—তোমায় কিছু করতে হবে না, আমি সব ঠিক করছি।

দারোগা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তুমি অন্ধকারে বন জঙ্গল ভেঙে কোথায় গাড়ী ঠিক করতে যাবে?

রাজবালা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ডাকিল—শশী!

একটা বড় নালির সুড়ঙ্গ হইতে ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা একটা প্রকাণ্ড মাথা উঠিয়া বলিল—আজ্ঞে, মাঠাকরুণ!

দারোগা ত অবাক আশ্চর্য্য! এই শশে-জেলেটা দাঙ্গার প্রধান আসামী, পলাতক ফেরারী। আর যে-দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য খুঁজিয়া-খুঁজিয়া হয়রান তাহার স্ত্রী তাহাদের হাটহদ্দ সব জানে, সে তাহাদের সর্দ্দারণী আশ্রয়দাত্রী!

ঘরের মধ্যে সুড়ঙ্গ হইতে শশী-জেলের মাথার আকস্মিক আবির্ভাবে

দারোগা-স্বামীর মুখের ভাব কটাক্ষে একবার দেখিয়া লইয়া রাজবালা বলিল—একখানা গরুর গাড়ী আনতে হবে যে শশী!

শশী একবার তাহার প্রকাণ্ড কালো মুখের ছোট ছোট লাল লাল চোখ দুটা পাকাইয়া দারোগা-বাবুর দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া লইয়া বলিল—আমরা পঞ্চাশ-জন জেলে লাঠি শড়কী নিয়ে হাজির আছি; পুলিশ যদি ঠাকুরের গায়ে হাত দিত ত আমরা ওদের জান নিতাম! আপনি যে-পাল্কীতে এসেছিলেন সেই পাল্কী আর একখানা ডুলিও হাজির আছে, আপনাকে আর ঠাকুরকে নিয়ে আমরা পালাতাম।······

দারোগার মুখে কথা সরিতেছিল না। সে আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল।

রাজবালা শশীকে বলিল—তবে ডুলি পাল্কী নিয়ে আয়। পাল্কীতে তোদের ঠাকুর যাবেন, আমি ডুলিতে যাব।

শশীর ঝাঁকড়া-চুলো মাথা সুড়ঙ্গে ডুব মারিল।

তখন দারোগা স্ত্রীকে বলিল—এই খুনেটাকেও ছেড়ে দিতে হবে নাকি?

রাজবালা বলিল—দেখ, ওরা নিরীহ গরীব মানুষ; বড় অত্যাচার না হলে ওরা জমিদারের বিপক্ষে দাঁড়ায়নি। তবু ওরা দোষ করেছে; ওদের আমি একেবারে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করব না······

দারোগার পশ্চাৎ হইতে শশী বলিয়া উঠিল—আমাদের ভাবনা ছিল ঠাকুরের জন্যে। তানার ভার মাঠাকরুণ নেলেন, আমরা আপনা হতেই থানায় যেয়ে ধরা দেবো দারোগা-বাবু। তারপর আপনার ধর্ম্ম আর আমাদের কপাল।

দারোগা হংসেশ্বর ভয় পাইয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল আটজন সাজোয়ান লোক দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহাদের আগে শশী। দারোগার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

দারোগাকে ভয় পাইতে দেখিয়া শশী হাসিয়া বলিল—এজ্ঞে, ওরা বেহারা।

শশী আর বেহারারা ধরাধরি করিয়া বীরেন্দ্রকে পাল্কীতে শোয়াইয়া দিল। রাজবালা ডুলিতে উঠিল। বিনা দাঙ্গায় আসামী গেরেপ্তার করিয়া জমাদার নির্ভরোম সিং এইবার কসিয়া গোঁফে চাড়া দিল। কিন্তু হংসেশ্বরের মুখে হর্ষ কি বিষাদ প্রবল তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছিল না।

পুলিশ-পাহারায় ঘেরাও হইয়া হাজতে যাইতে-যাইতে একজন জেলে গলা ছাড়িয়া গাহিয়া উঠিল—

পেঁচার পরামর্শ শুনে হংস বেচারা
প্রাণে বুঝি যায় মারা রে যায় মারা!……

শশী তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—এই, চুপ কর, মাঠাকরুণ শুনতে পাবে!

(২)

বীরেন্দ্রের বয়স যখন আঠারো বৎসর তখন তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাহাদের যে সামান্য জমিজমা ছিল তাহারই উপস্বত্ব হইতে তাহাদের সচ্ছল ভাবেই চলিয়া যাইত; এজন্য বিধবা হইয়াও বীরেন্দ্রের মাতা নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ করেন নাই। বীরেন্দ্র লেখাপড়া শিখিতেছে, এই বয়সেই সে বি-এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছে; শীঘ্রই বড় ও বিদ্বান হইয়া উপার্জনক্ষম হইয়া উঠিবে; এই ভরসাতেই তাহার মাতা একাকী ছেলেটিকে লইয়া স্বামীর ভিটায় পড়িয়া থাকিবেন আশা করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহাকে অভিভাবকহীন দেখিয়া গ্রামের জমিদার গুণময় চৌধুরীর আয় বৃদ্ধি করিবার লোভ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। গুণময়

দুই তার

চৌধুরী দুইটা বড় বড় পরগনার ষোল আনার মালিক ; তাঁহার পরগনা দুটির নাম হইতেই তাঁহার জমিদারীর আয়তনের আন্দাজ পাওয়া যায়— একটি পরগনা ঘোড়ামারা, অপরটি হাতীকান্দা, অর্থাৎ এমুড়া হইতে ওমুড়া যাইতে ঘোড়ামারা পড়ে এবং অমন যে বলিষ্ঠ হাতী সেও কাঁদিয়া ফেলে। তাঁহার সংসারে মাত্র তিনটি প্রাণীর খরচ—তিনি, তাঁহার স্ত্রী দয়াদেবী ও কন্যা মায়া। সুতরাং তাঁহার প্রয়োজন অধিক হইবার কথা নয়। কিন্তু তাঁহার মনের খাঁই আর কিছুতেই মিটিত না। নানা-প্রকারে আয় বৃদ্ধি করবার চেষ্টা সময়ে-সময়ে এমন উৎকট-রকমে প্রবল হইয়া উঠিত যে তখন তাঁহার আর ধর্ম্ম অধর্ম্ম জ্ঞান থাকিত না। তাঁহার প্রজাশাসন ও খাজনা-আদায়ের কড়াকড়ি এমন বিষম যে তাঁহার প্রজারা তাঁহার নামের ণ ও ম অক্ষর দুইটা একটু টানিয়া একটি বিশেষ শ্লেষের সুরে এমন করিয়া উচ্চারণ করিত যে তাঁহার নাম শুনিয়াই লোকে বুঝিতে পারিত তাঁহার গুণ কত।

এইসব অকাজে গুণময়ের প্রধান সহকারী জুটিয়াছিল নায়েব পঞ্চানন ; লোকে তাহাকে আদর করিয়া পেঁচো বলিয়া ডাকিত এবং সেই আদরের ডাকের অবস্থা-বিশেষে তিন-রকম মানে হইত—প্রথম, লক্ষ্মীর বাহন স্বনামধন্য পক্ষী ! দ্বিতীয়, অসহায় দুর্ব্বল শিশুর মারাত্মক প্রেত-ব্যাধি ; এবং তৃতীয়, যে-লোকের মধ্যে প্যাঁচের অন্ত নাই। পঞ্চানন ওরফে পঞ্চু পাঁচু বা পেঁচো আকারে লম্বা কৃশ ফর্সা ; তাহার শুকনো তোবড়ানো মুখের মাঝে বঁড়শীর মতন চোখা বাঁকা নাকটা তাহার তীক্ষ্ণ কুটিলতা ও নির্দ্দয়তারই যেন জয়ধ্বজা। লোকে এইজন্য তাহাকে আর-এক নাম দিয়াছিল নাকেশ্বরী—কিন্তু নামটা যে কেন স্ত্রীলিঙ্গবাচক হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

পঞ্চানন সামান্য গোমস্তা হইতে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই সদর

নায়েব হইয়া উঠিতে পারিল কেমন করিয়া তাহার একটু সামান্য ইতিহাস আছে।

গুণময় চৌধুরীর জীবনের মধ্যে প্রধান সখ ছিল তাঁহার চিরযৌবন অক্ষয় রাখার সতত জাগ্রত চেষ্টা। শত্রুপক্ষের নিন্দুক লোকেরা রটাইত বটে তাঁহার বয়স ষাটের কোটায় পৌঁছিয়াছে, কিন্তু তিনি নিজে যাহা বলিতেন তাহাতে আজ বিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার বয়স সাঁইত্রিশ হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত বার বার উঠানামা করিতেছে, ভদ্রলোকের এক কথা বলিয়া বয়স সম্বন্ধে তাঁহার কথার বিশেষ কিছু নড়চড় হয় নাই; এবং পাছে নিজেরই গোঁপ-দাড়ি তাঁহার মুখেরই উপর তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বানাইয়া দ্যায় এই ভয়ে মাসে একবার করিয়া তাঁহার নামে এনি-ব্ল্যাকের ভিপি-পার্শেল আসিত; তাহার ফলে তাঁহার চুল আর গোঁপ কখনো বা ভ্রমরকৃষ্ণ এবং কখনো বা লোহার মরিচার ন্যায় লালচে-কালো বা কালচে-লাল রং ধারণ করিত। তিনি সকল বুড়াকেই সমীহ করিয়া চলিতেন, হাজার হোক তাহারা বয়সে বড় ত। যুবাদের গলা ধরিয়া ইয়াকি দিবার ব্যগ্রতা তাঁহার প্রবল ছিল, এবং যে যুবা সাহস করিয়া তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া নিজের সমবয়সী বলিয়া স্বীকার করিতে পারে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় জমিদারের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, জমিদারী সেরেস্তায় তাহার একটা হিল্লে লাগিয়া যায়।

ধূর্ত্ত পঞ্চু এই সুযোগটিকে অবলম্বন করিয়া জমিদারী সেরেস্তায় একটা গোমস্তার কাজ পাইয়াছিল; তারপর গুণময়ের বয়স যে-পরিমাণে কমিতেছিল সেই অনুপাতে নিজের বয়স চটপট বাড়াইয়া ও জমিদারের সকল অত্যাচারের সমর্থন ও সাহায্য করিয়া পাঁচু ক্রমে জমিদারের সদর-নায়েব ও দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি যে যুবা ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য গুণময়ের মধ্যে মধ্যে বিবাহ

করিবার ঝোঁক চাপিত। পাঁচু তাঁহার এই সখেরও যেমন পোষকতা করিত এমন আর কেহ নহে। কিন্তু অন্দরে তাঁহার স্ত্রীর কান্নাকাটিতে ও তর্জ্জনগর্জ্জনে ভয় পাইয়া গুণময় বহুদিন তাঁহার সাধ মিটাইবার সুযোগ পান নাই। অকস্মাৎ পাঁচু তাঁহার সম্মুখে এমন এক প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিল যে, তাঁহার স্ত্রীর মায়া ও ভয় সমস্তই চাপা পড়িয়া গেল।

হরেন্দ্র রায়ের ও গুণময়ের পূর্ব্বপুরুষ একসঙ্গেই জমিদারী পত্তন করেন। তদবধি পুরুষানুক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বীতার বিরোধে ও শরিকানি মামলায় হরেন্দ্রদের অবস্থা ক্রমে হীন হইয়া পড়িয়াছিল; হরেন্দ্র এখন গুণময়েরই জোতদার প্রজা। কিন্তু গুণময়ের মন হইতে পুরুষানুক্রমের আক্রোশ ইহাতেই মিটে নাই; হরেন্দ্র যে খাইয়া পরিয়া আপনার ভিটায় বর্ত্তিয়া আছেন ইহাও তাঁহার অসহ্য বোধ হইত; কিন্তু হরেন্দ্র খুব হুঁসিয়ার সাবধানী লোক বলিয়া গুণময়ের আক্রোশ ও পাঁচুর চক্রান্ত তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় পাঁচু খবর পাইল যে হরেন্দ্র তাহাদেরই গ্রামের যাদব হালদারের মেয়ে দয়াদেবীকে বিবাহ করিতে যাইতেছে; হরেন্দ্র দয়াকে ছেলেবেলা হইতে খুব ভালো বাসেন, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য তিনি এতদিন অপর কোথাও বিবাহ করেন নাই। পাঁচু গুণময়কে বুঝাইল যে তিনি যদি দয়াকে বিবাহ করিতে পারেন তবে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যায়—তিনি এমন সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেন এবং হরেন্দ্রকে আশাভঙ্গের দুঃখ দেওয়া ও অপমান করা হয়। গুণময় এই সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পরামর্শ ঠিক হইল যে বিয়ের দিনের আগে এই খবর গুণময়ের স্ত্রী বা হরেন্দ্র কাহাকেও জানিতে দেওয়া হইবে না।

গুণময়ের চর পাঁচু চুপিচুপি গিয়া যাদব হালদারের সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া ফেলিল; মেয়ে রাজরাণী হইবে বলিয়াও বটে এবং

জমিদারের প্রসন্নতা লাভের জন্যও বটে, যাদব অতি সহজেই পাঁচুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

বিবাহের দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হরেন্দ্র দয়াদেবী বা গুণময়ের গৃহিণী জানিতে পারেন নাই যে গুণময় দয়াদেবীকে বিবাহ করিবেন। পাছে হরেন্দ্র আসিয়া বিবাহে কোনো প্রতিবন্ধক ঘটান এই ভয়ে গুণময়ের একশো লাঠিয়াল সন্ধ্যার সময় হরেন্দ্রের বাড়ী ঘেরাও করিয়া বসিল; দয়াদেবী চোখের জলের ভিতর দিয়া গুণময়ের সঙ্গে শুভদৃষ্টি করিলেন, এবং গুণময় যখন নূতন শ্বশুরবাড়ীতে বর সাজিয়া শালী-শালাজদের সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করিয়া বাসর জাগিতেছিলেন তখন তাঁহার শয়নকক্ষে তাঁহার গৃহিণী চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে মহানিদ্রার সঙ্কল্প আঁটিতেছিলেন।

পরদিন প্রভাতে জোড়ে বাড়ী ফিরিয়া গুণময় দাসীদের হুকুম করিলেন—গিন্নিকে ডাক্, নতুন বৌকে বরণ করে ঘরে তুলুক।

দাসী ছুটিয়া গিন্নিকে ডাকিতে গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে গো, গিন্নিমা আর নেইগো।

সেই চীৎকার শুনিয়া গুণময় তাঁহার স্থূল দেহ লইয়া যথাসম্ভব দৌড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে নিজের শয়নকক্ষে গেলেন; গাঁটছড়া-বাঁধা দয়া-দেবীকেও বাধ্য হইয়া সঙ্গে-সঙ্গে যাইতে হইল। গিয়া দয়াদেবী দেখিলেন সপত্নীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার ভয়ে গুণময়ের গৃহিণী গলায় ক্ষুর দিয়া মরিয়া আছেন! সমস্ত বিছানায় রক্ত জমিয়া আছে, সর্ব্বাঙ্গে ও ঘরের মেঝেতে রক্ত ছিটাইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপে বিছানাটা যেন বিমথিত হইয়া গিয়াছে! কাল সমস্ত দিন অনাহার, সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা, ও ভালোবাসার পাত্র হরেন্দ্রের সহিত বিবাহ হইবার আনন্দের উপর হঠাৎ নিরাশার দারুণ আঘাত দয়াদেবীর শরীর ও মনকে ক্লান্ত অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছিল; তাহার উপর এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িয়া গেলেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া গুণময় বলিয়া উঠিলেন—গিন্নির মরতেই যদি সাধ হয়েছিল বাপের বাড়ী গিয়ে মরলেই হত! নিজে ত মরলই, নতুন বৌকেও মারলে বুঝি!

নতুন বৌ মরিলেন না। কিন্তু তাঁহার কৃশ দুর্ব্বল শরীরে ও ভাবপ্রবণ মনে যে আঘাত লাগিল তাহা সামলাইয়া তিনি আর কখনো সুস্থ প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। তিনি চিররুগ্ন হইয়া পড়িলেন; ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীর ও শোকার্ত্ত মনে একটু উত্তেজনা তাঁহার সহে না—মন একটু চঞ্চল হইলেই তাঁহার দেহের রক্ত যেন শুকাইয়া যায়, সমস্ত রক্ত হৃদয়ে জমিয়া বুকের মধ্যে ধকধক করে, কিন্তু অতি সুশ্রী বলিয়া রক্তহীন অবস্থাতেও তাঁহাকে শ্বেতপদ্মের কলিকাটির মতন সুন্দর দেখায়। তাঁহার মুখে কেহ কখনো হাসি দেখিতে পায় না, তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠের স্বল্প বাক্যও যেন কান্নার মতন করুণ শুনায়।

এহেন পত্নীকে গুণময় ভয় করিয়া চলিতেন, কখনো সাহস করিয়া তাঁহার কাছে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতেন না। এজন্য অল্প দিন পরেই আর-একটি বিবাহের ইচ্ছা গুণময়ের প্রবল হইয়া উঠিল; পাঁচু কনে খুঁজিতে লাগিয়া গেল। কনে মিলিতেও দেরী হইল না।

সংবাদটা শুনিয়া হরেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। দয়াদেবীকে না পাইয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন; বাড়ী হইতে বাহির পর্য্যন্ত হইতেন না। এখন দয়াদেবীর সতীন হইবার আশঙ্কায় তিনি ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন; তিনি কনের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বুড়া বরে ও সতীনের ঘরে কন্যা দিতে নিবৃত্ত করিবার জন্য কনের বাপকে অনেক বুঝাইলেন। কনের বাপ বলিয়া বসিলেন—তুমি একটি সুপাত্র জুটিয়ে দাও, আমি গুণময় চৌধুরীকে মেয়ে দেবো না। তুমি ত বিয়ে করনি, তুমিই আমার মেয়েকে বিয়ে কর না?

দুই তার

জ

দয়াদেবীকে না পাইয়া হরেন্দ্র সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কখনো বিবাহ করিবেন না; তিনি বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলে কনের বাপ জেদ ধরিলেন—হরেন্দ্র তাঁহার কন্যাকে বিবাহ না করিলে তিনি গুণময়কেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

তখন অগত্যা দয়াদেবীকে সপত্নীর দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য সেই কন্যাকে হরেন্দ্রই বিবাহ করিলেন। গুণময় মনে করিলেন তিনি হরেন্দ্রের নির্ব্বাচিত পাত্রী দয়াদেবীকে বিবাহ করিয়া হরেন্দ্রকে যে অপমান করিয়াছিলেন এখন হরেন্দ্র তাঁহার নির্দ্ধারিত পাত্রীকে বিবাহ করিয়া সেই অপমানের শোধ দিলেন। গুণময় অপমানে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

হরেন্দ্র এমন সাবধানে চারিদিক সামলাইয়া চলিতে লাগিলেন যে গুণময়ের ক্রোধে তাঁহার বিশেষ কিছুই ক্ষতি হইল না।

হরেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নীকে ও নাবালক পুত্র বীরেন্দ্রকে অসহায় দেখিয়া গুণময়ের এতদিনের চাপা আক্রোশ মাথা তুলিয়া উঠিল; বীরেন্দ্রের মায়ের উপরও গুণময়ের রাগ ছিল দুই কারণে,—তিনি গুণময়কে ত্যাগ করিয়া হরেন্দ্রকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তিনি গুণময়কে বড়ঠাকুর বলিয়া তাঁহার স্বামীর চেয়েও তাঁহাকে বৃদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেন।

পিতা ও মাতার উপর যে আক্রোশ ছিল তাহা যখন বালক বীরেন্দ্রের উপর আসিয়া পড়িল তখন পাঁচু প্রভুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাহাকে জব্দ করিতে লাগিয়া গেল। পঞ্চানন নূতন জরিপ করিয়া প্রমাণ করিল যে হরেন্দ্র অনেক জমি ছাপাইয়া ছিপাইয়া খাইতেছিলেন; সেসব জমি সরকারের খাস হইয়া গেল। যেসব জমি বীরেন্দ্রের ভাগে অবশিষ্ট রহিল তাহার নিজস্ব জমিও আওয়ল হইয়া উঠিল, তাহার নূতন

বন্দোবস্ত খাজনা বৃদ্ধি ও সেলামী আদায় কড়া-রকমে চলিতে লাগিল; এবং কয়েক সনের খাজনা বাকী পড়িয়াছে বলিয়া দাবী হইলে, বীরেন্দ্রের মাতা চেকদাখিলা দেখাইতে না পারাতে বাকী খাজনার নালিশ রুজু হইল।

বীরেন্দ্রের মা জমিদার-গৃহিণী দয়াদেবীর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন।

বীরেনের মায়ের কাহিনী শুনিয়া তিনি অনেকক্ষণ কিছু কথা বলিতে পারিলেন না। একটু সামলাইয়া তিনি চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—ওঁর কিসের অভাব যে উনি এরকম অত্যাচার করেন তা বুঝতে পারিনে। প্রজারা ত ছেলের মতন, তাদের কান্না দেখে বুক যে ফেটে যায়। ওঁকে বললে বলেন আমার যা হক্-পাওনা আমি তা আদায় করে নেবো, তাতে লোকের কাঁদলে চলবে কেন? ওঁর শনি হয়েছে ঐ পেঁচোটা। সে থাকতে উনি কারো কথা শুনবেন না। তবু আমি যতদূর পারি চেষ্টা করে দেখব।

বীরেন্দ্রের মা আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিতেছিলেন না। দয়াদেবীকে অনেক করিয়া পায়ে ধরিয়া বলিয়া আসিলেন—দেখো দি—মা, আমার দুধের ছেলে বীরেন যেন পথে না বসে। আমি মরে তোমাদেরই ত তাকে দেখবার কথা।

গুণময় যখন রাত্রে খাইতে বসিয়াছেন তখন দয়াদেবী ঘনাইয়া বসিয়া এ-কথা সে-কথার পর বলিলেন—আজকে গইয়া বলিল— এসেছিল······

গুণময় তাঁহার খুব মোটা ভুঁড়ির ওপার হইতে খা খাইতে হিতোপ- কষ্টে একগ্রাস খাবার সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড ছাঁটা গোঁ ন বলিয়া উঠিল— মুখবিবরে চালান করিয়া দিয়া ভরা গালে জিজ্ঞাসা করিলে, দর্শয়িষ্যতি।

—তার নামে নাকি বাকি-খাজনার নালিশ হয়েছে?

গুণময় আহার চর্ব্বণ করিতে-করিতে বলিলেন—তা হবে। খাজনা বাকি পড়লেই নালিশ করতে হয়।

—নাবালক ছেলেটি নিয়ে বিধবা হয়েছে……এই সেদিন ওর সোয়ামী মারা গেছে……

—তাতে আমার পাওনা-গণ্ডা ত মারা যেতে পারে না!

—সে বলছিল, বড়ঠাকুর……

গুণময় খাটো-খাটো বিপুল মোটা দুই হাত নাড়িয়া প্রকাণ্ড ছাঁটা গোঁপ শজারুর কাঁটার মতন ফুলাইয়া জোরে বলিয়া উঠিলেন—বড়ঠাকুর! বড়ঠাকুর! তা হলে আমি বীরেনের বাপের চেয়ে বড়! আমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে বলতে চাও……

গুণময়ের দুপাটি বাঁধানো দাঁত ক্রোধে ঠকঠক শব্দ করিতে লাগিল।

দয়াদেবী বিপদে পড়িয়া গেলেন। তিনি স্বামীর দয়া উদ্রেক করিতে গিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানে ঘা দিয়া তাঁহাকে যে বিমুখ করিয়া তুলিলেন ইহার জন্য লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া চুপ করিলেন; মনে করিলেন উঠিবান্তরে কথাটা আবার পাড়িতে হইবে, এখন আর নয়।

তিনি গুণময় খানসামাকে বলিলেন—ওরে চতুর, পাঁচুদাকে বলে আয়, গুণময়কেসঙ্গে যেন একবার দেখা করে যায়।

করিতে চাহিবী প্রমাদ গণিলেন। তিনি ঢোক গিলিয়া মৃদুস্বরে বলি[illegible]লেন—

পিতা ও মচুকে কেন?

উপর আসিয়া ভার হইয়া বলিলেন—একটু দরকার আছে। তোমাদের জন্দ করিতে লা[illegible]-সব খোঁজে কাজ কি?

যে হরেন্দ্র অন্যের কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি কতবার জমি সরকারের খা[illegible] স্বামীর কাছে সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা করিয়া এই এক রহিল তাহার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন—তোমরা মেয়েমানুষ; দশ হাত

কাপড়ে যাদের কাছা নাই, তাদের কিছু বুঝিবার সাধ্য ও যোগ্যতা থাকিতেই পারে না; তাহারা আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবরের জন্য মাথা যেন না ঘামায়। পাঁচুর সহিত স্বামীর আলাপের বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার মন ছটফট করিলেও তিনি জানিতেন যে তাহা জানিবার আর কোনো উপায় নাই।

(৩)

সকাল হইতে-না-হইতেই পঞ্চানন বীরেনদের বাড়ীর সদর দরজায় গিয়া ডাকিল—বীরেন! ও বীরেন! এত বেলাতেও ঘুমুচ্ছিস নাকি?

পেঁচোর গলা শুনিয়াই বীরেনের মায়ের প্রাণ শুকাইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল কাল তিনি দয়াদেবীকে যে প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছেন, তাহারই মঞ্জুরী হুকুম জানাইতে পঞ্চানন আসিয়াছে বোধ হয়। তিনি নিদ্রিত পুত্রের গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন—বাবা বীরু, ওঠ বাবা, পাঁচু ভটচায্ ডাকছে!

বীরেন্দ্র ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল,—মা, কাল-পেঁচাটা ভোরবেলা জ্বালাতে এসেছে কেন?

—কি জানি বাবা। কাল দয়াদিদিকে বলে এসেছিলাম···

পঞ্চানন আবার ডাকিল—ওরে বীরে! ঘুম ভাঙ্গল?

বীরেন্দ্র নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে একটু বিদ্রূপের স্বরে চেঁচাইয়া বলিল—আজ্ঞে যাই।

বীরেন কাপড়খানা কষিয়া পরিতে পরিতে যাইতে যাইতে হিতোপদেশের লঘুপতনক বায়সের কথা স্মরণ করিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—প্রাতরেব অনিষ্টদর্শনং জাতং, ন জানে কিম্ অনভিমতং দর্শয়িষ্যতি।

বীরেন সদর দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছেন ?

—তোর মা কোথায় ? তোর মাকে বল্, আমি এসেছি।

—মা এইখানেই আছেন, আপনি বাড়ীর ভেতরে আসুন।

বীরেন্দ্রের মা ঘরের দরজার একপাটি কপাট ভেজাইয়া তাহার আড়ালে দাঁড়াইলেন, বীরেন্দ্র খোলা কপাটের নিকট দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন দালানে দাঁড়াইয়া একটু উঁচু গলায় বলিতে লাগিল—বাবু কতকগুলি খুব দামি কুকুর কিনেছেন, সেগুলিকে সর্ব্বদা চোখের উপর রাখা দরকার।

এই দরকারের সহিত বীরেন্দ্রের মায়ের কি সম্পর্ক তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। পঞ্চানন আবার বলিতে লাগিল—বাবুর বাড়ী থেকে এই বাড়ীটি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর ইচ্ছে এই বাড়ীটি তিনি বীরেনের কাছ থেকে দাম দিয়ে কিনে নিয়ে এইখানে কুকুরগুলি রাখেন।

বীরেন্দ্রের মা বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—যে বাড়ীতে ঠাকুর-দেবতার পূজো হয়েছে, সোয়ামী শ্বশুর চোদ্দপুরুষ ধরে মানুষ হয়েছেন, সেই ভিটেই হবে কুকুরের বাথান, সেখানে থাকবে মেথর মুদ্দফরাস ! আমার জীবন থাকতে তা কখনো হবে না।

পঞ্চানন ক্রূর হাসি হাসিয়া খড়্গের ন্যায় বাঁকা নাক আরো বাঁকাইয়া, লাউ-বীচির মতন শাদা শাদা বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া বলিল—শাস্ত্রেই আছে যত্র জীব তত্র শিব। কুকুর মেথর সবই ত কেষ্টর জীব ! কুকুর ঠাকুর, বামুন মেথর, সব সমান ! ভেদবুদ্ধি মায়াতে বৈ ত নয় !

বীরেন্দ্রের মা লজ্জা ভুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—তা হলে আমার আর মায়া নেই, দেখতে পাচ্ছি পেঁচো ভটচায্ মেথর মুদ্দফরাস কুকুরেরও অধম !

পঞ্চানন একটুও অসন্তুষ্ট বা অপ্রতিভ না হইয়া তেমনি হাসিমুখে বলিতে লাগিল—আমাকে যত ইচ্ছে গাল দিন। কিন্তু আমার কি দোষ বলুন। আমরা মুনিবের হুকুমের চাকর। বাবু বলেছেন বাড়ীর ন্যায্য দামের চতুর্গুণ দাম দেবেন……

বীরেনের মা আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন—বীরু, কুকুরটাকে মেরে তাড়িয়ে দে ত!

পঞ্চানন আশ্চর্য্য-রকম শান্তভাবে মিনতি করিয়া বলিল—আপনি অত তপ্ত হয়ে উঠছেন কেন? একটু তলিয়ে সব দিক ভেবে দেখুন। জমি জমিদারের; তাঁর দয়াতে আমরা প্রজারা জমির ওপর চাষবাস করে উপর-স্বত্ব ভোগ করতে পাই। তাঁর ন্যায্য অধিকার তিনি ফিরিয়ে চাইলে আমাদের দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি বলুন! তবে আমাদের বাবুর খুব নাকি দয়ার শরীর, তাই তিনি একখানা পুরোনো বাড়ী নতুনের চতুর্গুণ দাম দিয়ে কিনতে চাচ্ছেন। অন্য লোক হলে লেঠেল দিয়ে জোর করে দখল করত। কিন্তু আমাদের বাবু ত সে-রকম অধার্ম্মিক নন!……

বীরেনের মা ক্রমে বেশী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন; রুষ্ট স্বরে বলিলেন—বাবু ছলে কৌশলে ত সব নিয়েছেন, এখন বাকি আছে ভিটেটুকু; তা লেঠেল দিয়ে জোর করে কেড়ে না নিলে আমি দেবো না, আর তাও আমার প্রাণ থাকতে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না!

বীরেনের মা যত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন পঞ্চানন তত সন্তুষ্ট হইয়া পরম বিনয় ও মিনতির ভাবে মিষ্ট করিয়া কথা বলিতেছিল। সে বলিল—আপনি যখন অমন অবুঝের মতন একগুঁয়েমি করছেন তখন আমাকে আসল কথাটি খুলে বলতে হল, মনে করেছিলাম প্রকাশ করব না। বীরেনের বাবা এই বাড়ী আর তাঁর জমি জমা সব বাবুর কাছে

পাঁচ হাজার টাকায় বন্ধক রেখেছিলেন ; সাতশ টাকা উশুল দিয়েছিলেন ; সুদে-আসলে দেনা এখন সাড়ে পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছে। সেই দেনার দায়ে এ বাড়ী ত বিকিয়েই গেছে ; তবু বাবুর আমাদের দয়ার শরীর কিনা তাই কিছু টাকা ধরে দিয়ে বাড়ীটে চাচ্ছিলেন।

বীরেনের মা বলিলেন—আমরা তিনটি প্রাণী ; আমাদের অত টাকা ধার করবার কি দরকার হয়েছিল ?—মেয়ে ছেলের বিয়ে পৈতে দিয়েছি, না দোল দুর্গোচ্ছব করেছি যে ধার হবে !

পঞ্চানন একটু হাসিয়া কিন্তু-ভাবে বলিল—শেষদানি দাদার চরিত্তিরটা……

বীরেনের মা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—মিথ্যেবাদী জালিয়াত ! তুই আমার বাড়ী থেকে এক্ষুণি দূর হ বলছি। তারপর যা পারিস করগে যা।

বীরেনও রাগে ফুলিতে-ফুলিতে বলিল—দূর হও শিগগির, নইলে—

পঞ্চানন হাসিমুখে একবার বীরেনের দিকে তাকাইয়া তাহার মাকে উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া গেল—তবে আসি বৌঠাকরুণ, একটু ভেবে চিন্তে বীরেনকে দিয়ে আমায় খবরটা পাঠাবেন। যদি জেদ না ছাড়েন আদালত-ঘর করতে হবে।

(৪)

বাবু পঞ্চাননকে ডাকিয়া অত রাত্রে বীরেন্দ্রের জমিজমা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিলেন তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া সমস্ত রাত্রি দয়াদেবী ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারেন নাই। প্রভাতে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়াই যে-ঘর হইতে বীরেন্দ্রদের বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায় সেই ঘরের জানলায়

আসিয়া দাঁড়াইয়া অন্যমনস্কভাবে সেই দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে কেমন করিয়া উহাদের রক্ষা করিবার কি উপায় তিনি করিতে পারেন। এমন সময় দয়াদেবী দেখিতে পাইলেন পঞ্চানন আসিয়া বীরেন্দ্রদের দরজায় দাঁড়াইল। তাঁহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি উৎসুক হইয়া সেই জানলার কাছে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দাসী আসিয়া ডাকিল--মা, মুখ ধোবার জল দেওয়া হয়েছে।

"যাচ্ছি" বলিয়াও দয়াদেবী সেখান হইতে নড়িলেন না।

তিনি দেখিলেন বীরেন আসিয়া পঞ্চাননকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

দয়াদেবীর দশ বছরের মেয়ে মায়া আসিয়া ডাকিল—মা, আমায় খেতে দেবে এস।

দয়াদেবী বলিলেন—মোহিনীকে বলগে খেতে দেবে।

মায়া আব্দার করিয়া বলিল—না, তুমি দেবে এস।

মাতা কন্যার দিকে না ফিরিয়া বলিলেন—আমি এখন যেতে পারব না, তুই যা।

মেয়ে রাগ করিয়া পা ছড়াইয়া সেইখানে মেঝেতে বসিয়া রহিল, তাহা তিনি দেখিলেন না, তাঁহার দৃষ্টি বীরেনদের বাড়ীর দিকেই নিবদ্ধ।

মোহিনী দাসী আসিয়া মায়াকে ডাকিল—দিদিমণি, খাবে এস।

মায়া কোনো কথা বলিল না, গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

মোহিনী বলিল—মা, দিদিমণিকে খেতে যেতে বল।

দয়াদেবী বীরেন্দ্রদের বাড়ীর দিক হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতে-ছিলেন না, যে মুহূর্ত্তে তিনি চোখ ফিরাইবেন সেই মুহূর্ত্তে যদি এমন কিছু ঘটিয়া যায় যাহা তাঁহার দেখা উচিত ছিল। তিনি না ফিরিয়াই বলিলেন—মায়া, যা।

পাশ মায়ার নড়িবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। যে মা রোজ তাহাকে নিজের হাতে খাবার দিয়া কাছে বসিয়া খাওয়ান, সেই মা আজ একবার ফিরিয়াও চাহিতেছেন না, এই উপেক্ষায় আদুরে মেয়ের অভিমান উছলিয়া উঠিতেছিল।

মোহিনী বলিল—মা, দিদিমণি যে নড়ে না।

দয়াদেবী শুধু বলিলেন--থাক, পরে খাবে'খন।

দাসী অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল—কাল রাত্রে বাবুর সঙ্গে মায়ের বোধহয় ঝগড়া হয়েছে।

পঞ্চানন বীরেন্দ্রদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। অমনি জানলা হইতে ফিরিয়াই দয়াদেবী বলিলেন—মোহিনী, যা ত বীরেনের মায়ের কাছে, বলগে আমি ডাকছি।

মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তুমি মুখ ধোবে না।

—ধোবো'খন, তুই আগে চট করে বীরেনের মাকে ডেকে আন।

মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া গেল। এইবার মায়ের আদর পাইবে মনে করিয়া মায়া খুব রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসিয়া আড়চোখে মায়ের দিকে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু দয়াদেবী দাঁড়াইয়া অন্যমনে কি ভাবিতেছিলেন, মেয়ের দিকে তাঁহার নজর পড়িল না।

বীরেনের মা আসিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন—দিদি, ডেকেছ ?

"হ্যাঁ" বলিয়া দয়াদেবী একবার মোহিনীর দিকে একবার মেয়ের দিকে চাহিলেন। তারপর বীরেনের মাকে বলিলেন--তুমি আমার সঙ্গে এস।......মোহিনী তুঁই মায়ার কাছে থাক।

মায়ের আজ এই নূতন ভাব দেখিয়া মায়ার কান্না পাইতেছিল। মোহিনী কাছে গিয়া যেই বলিল—দিদিমণি, ওঠ, খাবে চল।—

অমনি মায়া ঝাঁঝের সহিত "যাঃ আমি যাব না" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

দয়াদেবীর কানে আজ সেই কান্না পৌঁছিলেও তিনি তাহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন না। তিনি বীরেনের মাকে নির্জ্জন মালখানার ঘরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—পেঁচো এত সকালে কি করতে এসেছিল তোমাদের বাড়ী?

বীরেনের মায়ের কাছে সমস্ত শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন—বাড়ীটা ওঁকে ছেড়ে দাও বৌ; ওঁর যখন ঝোঁক চেপেছে তখন স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও রদ করতে পারবে না। যে টাকা দিতে চাচ্ছেন সেই টাকা নিয়ে অন্য জমিদারের এলাকায় গিয়ে বাস করগে; নইলে টাকাও পাবে না, বাড়ীও যাবে।

দয়াদেবীর মুখেও এই কথা শুনিয়া বীরেনের মা মনে করিলেন ইহাও জমিদারের ফন্দি, নানান-রকমে ভুলাইয়া তাঁহাকে ভিটা-ছাড়া করিবার চাল। তাই তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে সোয়ামী-শ্বশুরের ভিটে আমি ছাড়তে পারব না! তা তোমরা যা করতে পার কর।

বীরেনের মা রুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া দয়াদেবী বলিলেন—তবে এক কাজ কর বৌ; যে টাকাটায় বাড়ী বন্ধক আছে ওরা বলছে, সেই টাকাটা ওদের ফেলে দাও।

বীরেনের মা ক্রোধ বিদ্রূপ ও হতাশার হাসি হাসিয়া বলিলেন—আমার সর্ব্বস্ব ত তোমরা নিয়ে চুকেছ দিদি, অত টাকা আমি আর কোথায় পাব!

"সেই পরামর্শ করতেই ত তোমায় ডেকেছি" ব্যথিত স্বরে বলিয়া দয়াদেবী আঁচল হইতে চাবির গোছা লইয়া একটি লোহার আলমারি

খুলিলেন; তাহার ভিতর হইতে একটি হাত-বাক্স টানিয়া বাহির করিয়া তাহার ডালা খুলিয়া ফেলিলেন; বাক্সটি গহনায় ভরা। দয়াদেবী বলিলেন—বৌ, এই বাক্সয় যে গহনা আছে তাহার দাম অনেক হবে; এইসব বেচে কি বন্ধক দিয়ে তুমি ওদের দাবী মেটাও। সন্ধ্যার পর বীরেনকে পাঠিয়ে দিও বাক্স নিয়ে যাবে।

দয়াদেবীর এতখানি দয়া বীরেনের মা সরল মহত্ব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ মিশাইয়া হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, ওটা আর বাকী থাকে কেন? গহনা নিতে এসেই হোক, কি বিক্রী বন্ধক করতে গিয়েই হোক, চোর-দায়ে ধরা' পড়ে বীরেনের জেল না খাটলে মনঃপূত হবে কেন!

সরল দয়াদেবী বীরেনের মায়ের বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বলিলেন—তবে কি হবে বৌ? আমার কাছে নগদ টাকা ত অত নেই। আমি দুশো টাকা মাসহারা পাই; আজ থেকে আমি তার এক পয়সা খরচ করব না; তোমরা মকদ্দমা কর, বীরেন যেন চুপিচুপি মাস-মাস সেই টাকা নিয়ে যায়। আমি এই সোনা ছুঁয়ে দিব্যি করছি বৌ, বীরেনের বাপের ভিটে খালাস করতে না পারলে আমি এ গহনার একখানিও অঙ্গে তুলব না; মা-কালীর কাছে মানত করে তুলে রাখছি। যদি বাড়ী না খালাস হয়, এই সোনা রূপো হামামদিস্তায় কুটে তাল পাকিয়ে বীরেনকে দেবো, তা হলে ত ধরা পড়বার কোনো ভয় থাকবে না। আমার স্বামীর ঋণ আমাকে শোধ করতে হবে।

বীরেনের মা আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কাঁদিতে-কাঁদিতে দয়াদেবীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—দিদি, আমায় ক্ষমা কোরো, দয়াদেবীর যে এত দয়া তা আমি বুঝতে পারিনি। তোমার আশীর্ব্বাদে বীরেনের আমার কোনো অকল্যাণ হবে না!

দমকা হাওয়ার মতন হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া মায়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—আমায় খেতে দেবে এস না।

দয়াদেবী আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন—চ, যাচ্ছি।

মায়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল—সক্কালে উঠেই পাড়ার লোককে ডেকে গপ্প!

দয়াদেবী মায়ার মাথার হাত রাখিয়া বলিলেন—তোরই অকল্যাণের ভয়ে রে! তোরই কল্যেণের জন্যে!

(৫)

বীরেনের বাবার সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করার তমস্থক তামাদি হইয়া যাইতেছে বলিয়া বাধ্য হইয়া গুণময়-বাবুকে বীরেন ও তাহার মায়ের নামে নালিশ করিতে হইল; কেবল ডিক্রিটা করাইয়া রাখিলেন, নতুবা বিধবা ও নাবালকের উপর ডিক্রি জারি করিয়া তাহাদিগকে জেরবার করা ত তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। বিশেষ করিয়া তাঁহাকে নালিশ করিতে হইয়াছে বীরেনের মা তমস্থক জাল বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন বলিয়া। যিনি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি খুব তিলক ফোঁটা কাটেন, তিন ঘণ্টা ধরিয়া জপ আহ্নিক করেন, গেরুয়া পরেন, আলোচাল নিরামিষ খান, স্বয়ং সেই হরদেব মুখুয্যের হাতের লেখা তমস্থক; তমস্থকের ইসাদী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, চতুর বিশ্বাস, নফর পোদ্দার, বেচারাম পরামাণিক, আর রামকালী গাঙ্গুলি। তাহাদের মধ্যে নফর পোদ্দার ও রামকালী গাঙ্গুলির মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সই জলজ্যান্ত বিদ্যমান আছে; তমস্থকের পিঠে বীরেনের বাবার নিজের হাতে লেখা সাতশো

টাকা উশুল দেওয়া আছে। শুধু তাই নয়, বাবুর খাস নগ্‌দী লক্ষ্মণ বাগ্দী, খানসামা হারাণে কৈবর্ত্ত আর রতনহাটির মদন মজুমদার টাকা উশুল দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিল, তাহারাও সাক্ষী দিবে। সকলেই জানে কোন্ বাড়ীর কোন্ ঘরে কিসের কলমে কোন্ সময়ে কখন্ ঐ তমসুক লেখা হইয়াছিল ও তখন কে কে কোন্ মুখে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া ছিল এবং টাকার মধ্যে কত ছিল রোক নগদ আর কত ছিল কোম্পানির নোট!

ঐ তমসুক সর্ব্বৈব জাল বলিয়া বিধবা ও নাবালকের পক্ষে একমাত্র যিনি সাক্ষ্য দিতে পারিতেন তিনি বীরেনের বাবা—তিনি এখন পরলোকে।

বীরেন লেখাপড়া বন্ধ করিয়া ভিটা রক্ষার জন্য জেলা আর ঘর ছুটাছুটি করিতেছে; কিন্তু সে উকিল মোক্তার কাহাকেও পাইল না, সবাইকে আটক-দক্ষিণা দিয়া জমিদারের তরফ হইতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে একজন উকিল আনা হইয়াছে, সে উকিল কাজে দক্ষ না হইলেও তাঁহাকে মফঃস্বলে আনার জন্য দক্ষিণা প্রচুর দিতে হইতেছে। বীরেনের মা ছেলেকে জেলায় পাঠাইয়া ঠাকুর-দেবতার কাছে মাথা খুঁড়িতে থাকেন, অশ্রুর ধারায় তাঁহাদের স্নান করান, তাঁহার প্রাণ ভুকভুক করিতে থাকে পাষণ্ড জমিদার গরিবের বাছাকে একলা কারে পাইয়া প্রাণে বা বধ করে।

ঠাকুরের দরজায় বীরেনের মাতার মাথা খোঁড়া আর দয়াদেবীর মানতের চেয়ে দেখা গেল পঞ্চাননের তদ্বির ঢের জোরালো। তমসুকের টাকার ডিক্রি হইয়া গেল।

দয়াদেবী স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন—আমার একটি কথা রাখবে?

গুণময় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—কি?

—বিধবা আর নাবালককে ভিটে-ছাড়া করো না ; ধর্ম্মে সইবে না।

—কী! যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! আমাকে ধর্ম্ম দেখানো! আমি ওদের উচ্ছেদ করে দেখাবো যে ধর্ম্ম-ফর্ম্ম কিছু নেই।

গুণময় পা ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন।

কাল বীরেনদের বাড়ী ক্রোক হইবে।

বীরেনের মা সন্ধ্যাবেলা দয়াদেবীর কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—দিদি, তুমি করতে কসুর করলে না, আমাদের ভাগ্যের দোষ! কাল বীরু আমার পথে দাঁড়াবে। পারো ত তাকে তুমি দেখো।

স্বামীর কঠিন জেদের কাছে নিতান্ত অক্ষম দয়াদেবী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন—দেখ বৌ, গহনা-পত্তর যা আছে এনে আমার কাছে রেখে যাও ; জিনিস-পত্তর যা পার বাড়ী-বাড়ী সরিয়ে রাখ; সব কেন ক্রোক করতে দেবে?

বীরেনের মা জিভ কাটিয়া বলিলেন—না দিদি, তা কি হয়! এঁরা জোচ্চুরি করছেন বলে আমি কি তা পারি! বীরুর তাতে অকল্যাণ হবে যে। বীরুকে তুমি দেখো।

দয়াদেবী আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বীরেনের মা আবার তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বিদায় হইলেন।

রাত্রে মায়ের কোলের কাছে শুইয়া বীরেন কাতরস্বরে বলিল—মা, আমাদের বাড়ীতে শোওয়া আজ এই শেষ! কাল কোথায় শোব মা?

"ভয় কি বাবা, তুই বেটাছেলে······" বলিয়া তাহার মা আর কোনো কথা বলিতে পারিলেন না ; ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ছেলেও কাঁদিতে লাগিল।

কাঁদিতে-কাঁদিতে বীরেন ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার মা উঠিয়া বসিলেন।

তাঁহার একবার মনে হইল সমস্ত বাড়ীতে কেরোসিন ছড়াইয়া আগুন লাগাইয়া দিয়া বীরেনের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেলে কেমন হয়। তখনই মনে হইল আশেপাশের বাড়ীতে আগুন লাগিয়া অপরের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিয়া-ভাবিয়া সন্তর্পণে পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া তিনি আস্তে-আস্তে কপাট খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সকাল বেলা পঞ্চাননের ডাকাডাকিতে বীরেনের ঘুম ভাঙিল। বীরেন ঘরে মাকে দেখিতে পাইল না। সে পেঁচোর ডাকে সাড়া দিয়া সদর দরজা খুলিয়া পঞ্চাননের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চানন বলিল—তোমার মাকে বল, আস্তে-আস্তে মানে-মানে বেরিয়ে যান, আদালতের পেয়াদা এসে বার করে দেবে সেটা কি ভালো হবে?

বীরেন্দ্র মাকে পেঁচোর কথা বলিতে বাড়ীর মধ্যে গিয়া ডাকিল—মা!

কোনো সাড়া পাইল না!

এ-ঘর সে-ঘর খুঁজিল, কোথাও তাহার মা নাই। খিড়কির পুকুরে হাতমুখ ধুইতে গিয়াছেন মনে করিয়া খিড়কির দিকে যাইতেই ভয় পাইয়া বীরেন চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শুনিয়া পঞ্চানন ছুটিয়া আসিয়া দেখিল খিড়কির পথের ধারে শিউলি-গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়া বীরেনের মা ঝুলিতেছেন; মরণযন্ত্রণায় সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপে নাড়া পাইয়া শিউলি-গাছ হইতে হাসির মতন শুভ্র ফুলগুলি ঝরিয়া ঝরিয়া গাছের তলা একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মরণ যেন পঞ্চাননের স্পর্দ্ধাকে হাসিয়া বিদ্রূপ করিতেছে!

পঞ্চানন বীরেনকে টানিতে-টানিতে বাহিরে লইয়া আসিল। বীরেন্দ্র মা-মা করিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া মাটি ভিজাইতে লাগিল।

তাহার কান্নার শব্দে পাড়াপ্রতিবাসী ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করিল—ভটচায্যি-মশায় কি হয়েছে?

পঞ্চানন মুচকি হাসিয়া বলিল—মাগী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

পঞ্চানন একজন পাইককে বলিল—ওরে যদু, যা ত হংসেশ্বর-দারোগাকে খবর দিয়ে আয়।

প্রভাতে উঠিয়াই দয়াদেবী ম্লান চিন্তাকুল মুখে যে জানলা হইতে বীরেনদের বাড়ী দেখা যায় সেই জানালাটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া বীরেনদের বাড়ীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিলেন। তিনি দেখিতে লাগিলেন পঞ্চানন আসিল, বীরেন বাহিরে আসিয়া আবার বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল, একটু পরেই পঞ্চাননও ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া আকুল-কান্নায়-কাতর বীরেন্দ্রকে টানিতে-টানিতে বাহিরে লইয়া আসিল, বীরেন মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে, পাড়ার লোকেরা আসিয়া জমিতেছে। দয়াদেবী ক্রোধে জ্বলিতেছিলেন, এই মনে করিয়া, যে, পাষণ্ড পেঁচোটা ঐ দুধের ছেলেটার গায়ে হাত তুলিতে পারিয়াছে! আর পাড়ার লোক সব দাঁড়াইয়া দেখিতেছে! নিষ্ফল বেদনায় তিনি ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিলেন। তারপর দেখিলেন হংসেশ্বর দারোগা চৌকীদার সঙ্গে করিয়া আসিল। দয়াদেবীর বুক কাঁপিয়া উঠিল, এত করিয়াও ইহাদের মনের সাধ পূর্ণ হইল না—শেষে দুধের ছেলেটাকে পুলিশে দিবে নাকি! রাগে দুঃখে তাঁহার চিররুগ্ন দুর্ব্বল শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এমন সময় মোহিনী ঝি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—মাগো মা শুনেছ?—বীরেন-দাদার মা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

দয়াদেবী শোকমূর্ত্তি হইয়া কপালে চোখ তুলিয়া ভয়ার্ত্ত ব্যথিত কণ্ঠে বিস্ময়প্রকাশ করিয়া শুধু বলিতে পারিলেন—অ্যাঁ!

তারপর উন্মাদিনীর ন্যায় বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া স্রোতের ন্যায় নামিয়া খিড়কি দরজা পার হইয়া বীরেনদের বাড়ীর দিকে নক্ষত্র-গতিতে ছুটিলেন। তাঁহার মাথা হইতে ঘোমটা খসিয়া পড়িয়াছে,

রাত্রিবাসে কবরী শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, উত্তেজনায় তাঁঃ মুখখানি রক্তপদ্মের মতন হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সমাগত জনত দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বীরেনের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দু হাতের সমস্ত বলে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আর্তস্বরে ডাকি উঠিলেন—বাবা বীরেন!

সমস্ত লোক তটস্থ হইয়া সরিয়া গিয়া সসম্ভ্রম বিস্ময়ে চাপা গলা বলিয়া উঠিল—রাণীমা!

বীরেন দ্বিগুণ ব্যথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—জেঠিম গো, মা যে মরে গেল, আমার কি হবে?

—ভয় কি বাবা, আমি তোর মা। আয় তুই আমার সঙ্গে বাড়ীতে। —বলিয়া দয়াদেবী বীরেনের হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠিক সেই সময় দু'জন লোকে ধরাধরি করিয়া বীরেনের মায়ের শবদেহ বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া আসিল, গলার দড়িটা মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে আসিতেছে। ইহা দেখিয়াই দয়াদেবী জোরে বলিয়া উঠিলেন—উঃ!—তারপর থরথর করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে বীরেনের পায়ের কাছে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

চারিদিকে মহা কলবর পড়িয়া গেল—জল আনো, পাখা আনো, লাস সরাও, শিগগির একখানা পাল্কী আনাও, বাবুকে খবর দা ......

জল আসিল, পাখা আসিল, কিন্তু জমিদারের গৃহিণীর গায়ে হাত দিবে কে? সকলেই বলিতে লাগিল—বীরেন, বীরেন, তুই মুখে জল দে, আমরা বাতাস করছি।

দেখিতে দেখিতে পাড়াপড়সী স্ত্রীলোকেরা লজ্জা অতিক্রম করিয়া সেখানে আসিয়া দয়াদেবীর সেবায় নিযুক্ত হইল।

দয়াদেবী চোখ মেলিয়াই চারিদিকে চাহিয়া মাথার ঘোমটা টানিতে

চেষ্টা করিলেন। একজন স্ত্রীলোক মাথায় কাপড়টা তুলিয়া দিল। দয়াদেবী ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—বাবা বীরেন, আমাকে তুই ধরে বাড়ী নিয়ে চ।

পঞ্চানন আগাইয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে পাল্কী আনতে লোক গেছে।

দয়াদেবী জোর করিয়া টলিতে-টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বীরেনকে বলিলেন—বাবা, তুই আয়।

পঞ্চানন অমনি বলিয়া উঠিল—বীরে, বীরে, ধর, ধর, রাণীবৌ টলছেন, এখনি পড়ে যাবেন!

বীরেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে ধরিল; দুএকজন স্ত্রীলোকও ধরিল; অনেক লোকে ধরিল দেখিয়া বীরেন দয়াদেবীকে ছাড়িয়া দিয়া মায়ের পায়ের কাছে আবার বসিয়া পড়িল।

দয়াদেবী বীরেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—বাবা বীরেন, আমাকে বাড়ীতে তুই নিয়ে চ, ছোট-বৌএর সংকারের ব্যবস্থা করে দিইগে।

বীরেন কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি তোমাদের বাড়ীতে যেতে পারব না জেঠিমা—আমায় ওখানে যেতে বোল না।

দয়াদেবী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—ও-বাড়ীতে তোকে যেতে বলব কেন? এই বাড়ীই আজ থেকে আমার বাড়ী, আমি যে তোর মা!

বীরেন আর পঞ্চানন অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সমস্ত লোক স্তব্ধ।

দয়াদেবী হংসেশ্বর দারোগার দিকে ফিরিয়া হুকুমের স্বরে বলিলেন—লাস আপনারা নিয়ে যাবেন না।

হংসেশ্বর ব্যস্ত হইয়া বলিল—আজ্ঞে না, আপনারা দাহ করবার ব্যবস্থা করুন।

দয়াদেবী ডাকিলেন—বীরেন, লোক ডাক।

সমবেত জনতার ভিতর হইতে অনেকেই বলিয়া উঠিল—আমরাই নিয়ে যাচ্ছি।

পঞ্চানন আগাইয়া আসিয়া বলিল—আপনি বাড়ীর মধ্যে যান, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি।······

দয়াদেবী দুর্ব্বল চরণে ধীরে ধীরে বীরেনের বাড়ীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

(৬)

দয়াদেবী বীরেনের বাড়ীর মধ্যে গিয়াই যেমন করিয়া মোমের পুতুল আগুন-আঁচে নুইয়া পড়িয়া গলিয়া যায় তেমনি আস্তে আস্তে বসিয়া মাটিতেই শুইয়া পড়িলেন এবং অচেতন হইয়া গেলেন। বীরেনের প্রতিবেশিনীরা চোখে মুখে জল দিতে লাগিল, হাওয়া করিতে লাগিল; পঞ্চানন ডাক্তারকে ও গুণময়-বাবুকে খবর পাঠাইল।

বীরেনের মা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছেন এই খবর পাইয়াই গুণময় অত্যন্ত ভয় পাইয়া ছুটাছুটি তাঁহার মোটা শরীর লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিতেছিলেন। পথে তাঁহার কাছে খবর পৌঁছিল যে দয়াদেবীর মূর্চ্ছা হইয়াছে। গুণময় তাড়াতাড়ি চলিবার চেষ্টা করিয়া আরো হাঁপাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে কেবলি হইতেছিল—ধ্যা! শেষকালে আমা হতে এতগুলো স্ত্রীহত্যা হল!

গুণময়ের মনের মধ্যে ভয় জমিয়া উঠিতে লাগিল। দয়াদেবীকে

বিবাহ করিয়া আনিয়া তিনি তাঁহার প্রথম স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিলেন। বীরেনের মায়ের জমিজমার লোভে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। হয়ত বা দয়াদেবীরও মৃত্যুর কারণ তিনিই হইতেছেন। তাঁহার সমস্ত গা কেমন ছমছম করিতে লাগিল, মনের মধ্যে কেমন একটা শীত-শীত বোধ করিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল এইসব অপঘাত মৃত্যুর বিভীষিকা যেন চারিদিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার দম বন্ধ করিয়া তুলিতেছে।

গুণময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া পঞ্চাননকে দেখিয়াই তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—পাঁচু-দা, এসব কী কাণ্ড ঘটালে দেখ-দেখি!

পঞ্চানন বুঝিল বাবুর মনটা সুস্থ নাই, সে তিরস্কার শুনিয়া নীরবে মাথা নত করিল।

গুণময় জিজ্ঞাসা করিলেন—বীরেন কই?

দশ বারো জনে বলিয়া উঠিল—বাড়ীর ভেতর।

গুণময় বাড়ীর ভিতরে গিয়াই আবেগ-ভরে বীরেনের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—বীরে, তোর মা এমন কেন করলে? আমি কি সত্যি তোদের পথে বার করতাম। তোরা জেদ করলি তাই ডিক্রিটে করিয়ে রাখলাম। তাতে আমার এমন কি দোষ বল্?

বীরেন তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়াও চাহিল না, দয়াদেবীর পায়ের উপর নত হইয়া বসিয়া রহিল, চোখ দিয়া তাহার টপটপ করিয়া জল ঝরিতেছে।

গুণময় ব্যগ্রভাবে বলিলেন—যা হয়ে গেছে তার ত আর চারা নেই। এখন আয়, মায়ের সৎকার করবি আয়।······তোর মায়ের এ ভারি অন্যায়, শেষকালে আমায় নিমিত্তের ভাগী করে গেল!

বীরেন অনুভব করিল তাহার মা মরিয়া জিতিয়াছেন, এই গর্ব্বি অত্যাচারীকেও অবনত করিয়াছেন। বীরেন উঠিয়া মায়ের সৎ করিতে গেল।

বীরেন যখন মায়ের সৎকার সারিয়া বাড়ী ফিরিল, তখন দয়াদে জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উঠিবার শক্তি নাই। কাচা-গলায় খ পায়ে ম্লান মুখে দীন বেশে যখন বীরেন তাঁহার শয্যার শিয়রে আসি দাঁড়াইল তখন তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। একে পুরুষ তায় ছেলেমানুষ, ঘরকন্নার কিছুই জানে না; এখন যিনি তাহার মা তিনি শয্যাগত; বীরেন নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত ও অসহায় বোধ করিতে লাগিল। দয়াদেবীও বীরেনকে একটু কিছু খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরের বাড়ীতে কোথায় কি আছে তাহা জানেন না, তাহার উপর আবার নিজে উত্থানশক্তিরহিত। তিনি কাহাকে অনুরোধ করিবেন দেখিবার জন্য একবার ঘরের চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন গুণময় আসিতেছেন; অমনি তিনি চোখ বুজিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন।

গুণময় ঘরের দরজার কাছে আসিয়া ইঙ্গিতে বীরেনকে ডাকিয়া লইয়া একটু তফাতে গিয়া বলিলেন—গিন্নি এখন কেমন আছেন?

বীরেন অনিচ্ছায় বিরক্ত ভাবে জবাব দিল—জ্ঞান হয়েছে।

গুণময় একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—ছাখ্, এখন উনিই তোর মা। শুনলাম উনি তোকে ছেড়ে বাড়ী যাবেন না বলেছেন। এখন ওঁর যে-রকম শরীরের অবস্থা তাতে ওঁকে জোর করে ত কিছু বলা চলবে না, তুই যদি একটু বুঝিয়ে বলিস ত শুনতেও পারেন হয়ত।

বীরেন দৃপ্ত ভাবে বলিল—আচ্ছা আমি বলছি গিয়ে।

বীরেন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া গুণময় তাড়াতাড়ি বলিলেন—তুই বলিস যে তুইও সঙ্গে যাবি·····

বীরেন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি যেতে পারব না।

গুণময় অপ্রতিভ হইয়া বীরেনের হাত ধরিয়া বলিলেন—তা হলে

কি তুই ওঁকে বাঁচতে দিবিনে? এখানে ওষুধ-পত্তি যত্ন-আত্তি হবে কি করে? উনি ত তোকে ছেড়ে যাবেন না।

বীরেন থমকিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

একটি ছোট মেয়ে আসিয়া ডাকিল—বীরেন-দা, তোমাকে দয়া-মাসী ডাকছে।

বীরেন একবার গুণময়ের দিকে চাহিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

দয়াদেবী বীরেনকে দেখিয়া বলিলেন—বাবা বীরেন, আজকে ত আর কিছু খেতে নেই, একটু সরবৎ করে খা।......কোথায় কি আছে নিজে উঠে দেখে শুনে করে কর্ম্মে যে দেবো সে শক্তি তোর মায়ের নেই।

একজন প্রতিবেশিনী বলিল—তুমি ব্যস্ত হয়ো না দিদি, আমরা এনে রেখেছি।

বীরেন সরবৎ পান করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—এ বাড়ীতে আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না মা, তুমি আমাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে চল।

দয়াদেবী উৎসুক দৃষ্টিতে একবার বীরেনের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি ভাবিলেন মায়ের স্মৃতিতে-ঘেরা এই বাড়ীতে থাকিতে তাহার বোধ হয় কষ্ট হইতেছে, মায়ের অপঘাত মৃত্যুর কথা মনে হইয়া বালকের মনে বোধ হয় ভয় হইতেছে; তাই তিনি বীরেনের প্রস্তাবে অন্যায় কিছু দেখিলেন না; বরং তিনি খুসী হইলেন যে নিজের ঘরকন্নার মধ্যে গিয়া পড়িলে তিনি সহজে ইচ্ছানুরূপ বীরেনের যত্ন করিতে পারিবেন। তিনি বলিলেন—তবে আমাকে ধরে নিয়ে চ।

বীরেন বলিল—পাল্কী এসেছে।

বীরেন মনে করিয়াছিল দয়াদেবীকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়াই সে চলিয়া আসিবে। কিন্তু বাড়ীতে গিয়াই দয়াদেবী আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং এবার তাঁহার চেতনা হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইল। তাঁহার চেতনা হইবা মাত্র তিনি চোখ খুলিয়াই চারিদিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—বীরেন কই ?

বীরেন তাঁহার শিয়রের কাছে ছিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল—এই যে মা আমি।

দয়াদেবী অত্যন্ত মিনতির স্বরে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—আমাকে ছেড়ে তুই চলে যাস্‌নে বাবা।

বীরেনের মনের সঙ্কল্প তিনি বোধ হয় সন্দেহ করিয়াছিলেন।

সেই মিনতির পর বীরেন আর পলাইতে পারিল না। তখন সে মনে করিল দয়াদেবী একটু সুস্থ হইলে কলিকাতায় পড়িতে যাইবার নাম করিয়া এ-বাড়ী ও এ-গ্রাম হইতে চিরবিদায় লইবে। সে বলিল—না মা, আমি তোমায় ছেড়ে আর কোথায় যাব? কলেজ খুললে কলকাতা যাব।

মায়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, বীরেন-দা কি আর নিজের বাড়ীতে যাবে না, আমাদের বাড়ীতেই থাকবে ?

দয়াদেবী উচ্ছ্বসিত অশ্রু দমন করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ।

মায়া উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—বেশ হবে আমি রোজ বীরেন-দার কাছে গল্প শুনব।

দয়াদেবী সেই যে শয্যা লইয়াছেন আর উঠিতে পারিলেন না। ডাক্তার বলিয়াছেন দুর্ব্বল শরীরে অতি উত্তেজনায় হৃদয় পীড়িত হইয়াছে;

অল্পেই হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে; মন খুব শান্ত থাকে এমন ব্যবস্থা করিতে পারিলে কিছুদিন বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।

বীরেন সেই শয্যাগত দয়াময়ীর সেবায় আপনাকে এমন করিয়া নিযুক্ত করিয়া দিল, যে, তাহার আর মায়ের জন্য শোক করিবার অবকাশ রহিল না। কিন্তু সে বড় বিষণ্ণ গম্ভীর স্বল্পবাক্ হইয়া উঠিল।

পঞ্চানন চাণক্যনীতি আওড়াইয়া গুণময়কে বলিল—ভায়া, ঋণের শেষ, আগুনের শেষ, ব্যাধির শেষ আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই; অল্প স্ফুলিঙ্গই শেষকালে খাণ্ডবদাহন করতে পারে!

গুণময় অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন—ও আর আমাদের কি বা করবে? গিন্নির মায়া পড়ে গেছে—নিজের ঘরে শোওয়ান; নিজের সামনে বসিয়ে খাওয়ান; ওষুধ খেতে চান না, বীরেন দিলে তবে খান। এখন ত ওকে সরানো চলবে না। গিন্নি সরলে কি একটু সারলে তখন যা হয় করলেই হবে।

বীরেন তাহাদের বাড়ীতে থাকিবে শুনিয়া মায়া খুব খুসী হইয়াছিল। কিন্তু দুদিনেই সে বুঝিতে পারিল যে এ তাহার সে বীরেন-দাদা নহে; তাহার সেই আগেকার উল্লাস চঞ্চলতা নাই, মায়াকে দেখিলেই সে আগেকার মতন তাহাকে দুই-হাতে জড়াইয়া ধরিয়া হাসে না, সে একলা মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে; আগে সে যাচিয়া গল্প শুনাইত, কত রঙ্গ করিয়া হাসাইত, এখন অনেক সাধ্যসাধনা না করিলে তাহাকে দিয়া গল্প বলানো যায় না; গল্প শুনিয়া মায়া হাসিয়া কুটিকুটি হইলেও, যে গল্প বলে তাহার মুখে হাসির একটি রেখাও ফুটে না, ইহাতে গল্প শোনার আনন্দ মায়ার মনে জমিতে পারে না। মায়া এখন মায়েরও যেন পর হইয়া পড়িতেছে;—মা সর্ব্বদা বিছানায় পড়িয়াই আছেন, মায়ার নাওয়া-খাওয়া তিনি আর আগের মতন নিজে দেখিতে পারেন না, যা করে

তাহার ঝি মোহিনী। মাকে সে কখনো একলা পায় না; মা আজকাল বীরেনকে লইয়াই ব্যস্ত। এজন্য তাহার মনের মধ্যে বীরেনের উপর হিংসা ও বিরক্তি একটু-একটু করিয়া জমিয়া উঠিতেছিল। এই সঙ্গীহীন বাড়ীতে বীরেনকে পাইয়া মায়া একদিকে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবার সঙ্গে গাড়ীতে করিয়া হাওয়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া মায়া মায়ের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল বীরেন তাহার মায়ের কোলের কাছে বসিয়া একখানা বই পড়িয়া শুনাইতেছে এবং মা বীরেনের পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে চোখের জল মুছিতেছেন। মায়া ক্ষুধিত ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বীরেনের কোল হইতে বইখানি ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং বীরেনের পিঠ ও মায়ের কোলের মাঝখানে ঠেলিয়া শুইয়া পড়িয়া মাকে আদেশ করিল—আমার বড় ঘুম পেয়েছে, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দাও!

দয়াদেবী মেয়ের মনের ভাব বুঝিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্নেহ-সান্ত্বনার স্পর্শ বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন—সন্ধ্যে বেলা ঘুম পেয়েছে কি? খাবিনে?

মায়া ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল—না, আমি খেতে চাইনে! তুমি আমার গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও।

দয়াদেবী বলিলেন—বাবা বীরেন, মোহিনীকে বল ত, বামুন-ঠাকুরকে বলবে মায়ার লুচি ভেজে এই ঘরে দিয়ে যাবে।

বীরেন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল—অমনি মায়াও তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া বীরেনের হাত চাপিয়া ধরিয়া এক নিশ্বাসে বলিল—বীরেন-দা, আমার পড়বার ঘরে এস, আমায় গল্প বলতে হবে।

কাঁচপোকা যেমন করিয়া তেলাপোকাকে টানিয়া লইয়া যায়, মায়া তেমনি করিয়া বীরেনকে টানিয়া লইয়া গেল। বীরেনকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া, আর-একখানা চেয়ার তাহার সামনে টানিয়া আনিয়া তাহার কোল ঘেঁসিয়া নিজে বসিয়া মায়া হুকুম করিল—সেই র‍্যাক্কোস না খোক্কোসের গল্পটা বল।

দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতন বীরেন একটানা বলিয়া যাইতে লাগিল—এক যে ছিল ব্রাহ্মণ, সে যাবে দেশ-ভ্রমণ করতে……

দয়াদেবী একাকী বিছানায় পড়িয়া-পড়িয়া ভাবিতেছিলেন বীরেন ও মায়ার কথা। মায়া বীরেনকে বেশ ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু মায়ের ভালোবাসার এতটুকু ভাগ দেওয়া সে সহিতে পারে না, তখন তাহার মধ্যে তাহার বাপের হিংস্রতা ফুটিয়া উঠে। তাহার বাপ বীরেনকে মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, ইহা যদি মায়া বুঝিতে পারিত তবে সে উহার উপর মায়ের মমতা দেখিয়া হিংসা করিতে পারিত না। তাহার বাপ বীরেনের যে বিষম ক্ষতি করিয়াছে তাহার সুদে আসলে পূরণ করিতে হইবে তাহাদিগকে। অমনি দয়াদেবীর মনে হইল মায়া তাহাদের একমাত্র সন্তান; সে-ই এই অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইবে; বহু অনাথ দরিদ্রের সর্ব্বনাশ করিয়া সঞ্চিত, অশ্রু-শ্বাসে কলঙ্কিত অভিশপ্ত এই সম্পত্তি দিয়াই তাহাকে তাহার পিতার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; অতএব তাহাকে এমন একটি সুপাত্রে সম্প্রদান করিতে হইবে, যে ব্যথিতের দরদ বুঝিবে, যে শ্বশুরের অত্যাচারে অর্জ্জিত সম্পত্তি প্রজাদের গচ্ছিত ন্যাস বলিয়া মান্য করিয়া প্রজাহিতেই তাহাকে নিযুক্ত করিবে, নিজের বিলাস চরিতার্থ করিবার সাধন করিয়া তুলিবে না। চারিদিক হইতে যে অবস্থা ঘনাইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বীরেন্দ্রের সঙ্গে মায়ার বিবাহ দিতে পারিলে সব দিক বজায় থাকে।

এই কথা মনে হইতেই দয়াদেবীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াই আবার চিন্তাকুল হইয়া পড়িল। যদি মায়ার বাবা বীরেন্দ্রকে জামাই করিতে অস্বীকার করেন! দয়াদেবীর মনে হইল একবার স্বামীকে অনুরোধ করিয়া দেখিবেন। কিন্তু তিনি যদি এই প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া বীরেনের অপর কোনো অনিষ্ট করিয়া বসেন! দয়াদেবী ভাবিলেন, মরণ ত আমার বুকে বাসা বাঁধিয়াছে—যে-কোনো মুহূর্তে সে আমার গলা টিপিয়া মারিতে পারে; এমন অবস্থাতেও কি স্বামী আমার একটা অনুরোধ রাখিবেন না? কিন্তু রাখিবেন যে তাহারই বা ভরসা কিসে? বড় রাণীর সন্তান হয় নাই বলিয়া যে স্বামী স্ত্রীর অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে যাইতে পারিয়াছিলেন এবং সতীনকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতে হইবে বলিয়া দুঃখে ক্রোধে বড় রাণী আত্মহত্যা করিলে যে স্বামী খুসী হইয়া বলিয়াছিলেন—গেছে, বেশ গেছে, এয়োরাণী ভাগ্যিমানী শাঁখা সিঁদুর নিয়ে গেছে, এ ত তার পরম ভাগ্য! কিন্তু বিয়ের গোলমালটা চুকে যাওয়ার পর গেলেই ভালো হত!—সে স্বামী যে তাঁহার মৃত্যুর জন্য কিছুমাত্র ব্যথিত হইবেন এমন দুরাশা দয়াদেবী করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। এই ত তিনি এতদিন শয্যাগত হইয়া পড়িয়া আছেন, স্বামী একবারও ত তাঁহাকে দেখিতে আসেন নাই, চাকর-দাসীকেও ত তিনি পত্নীর কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই! তবু, দয়াদেবী স্থির করিলেন একবার মরণান্ত চেষ্টা তিনি করিয়া দেখিবেন।

বীরেনের আন্তরিকতা ও আগ্রহশূন্য গল্প শুনিতে মায়ার ভালো লাগিতেছিল না। বক্তাকে নোটিশ না দিয়াই শ্রোত্রী গল্পের মাঝখানে হঠাৎ উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং অভিমান-ভরে মায়ের ঘরে ঢুকিয়া দয়াদেবীর চিন্তায় বাধা দিয়া বলিল—মা, আমার ঘুম বুঝি পায় না, খিদে বুঝি পায় না?

দয়াদেবী মেয়েকে কাছে বসাইয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ মায়া, বীরেনকে বিয়ে করবি ?

মায়া মায়ের আদুরে মেয়ে ; নূতন খেলনা দেওয়ার প্রস্তাবের মতন বিবাহের প্রস্তাবে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—করব মা ! কিন্তু বীরেন-দাকে তোমার কাছে শুতে দেবো না কিন্তু ; আমি একলা তোমার কাছে শোব ; বীরেন-দা পাশের ঘরে শোবে।

মা হাসিয়া বলিলেন—তাই হবে।

মায়া খুসী হইয়া এক ছুটে বাহির হইয়া গেল। বীরেনের গলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—বীরেন-দা ভাই, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, মা বল্লে ! আজ থেকে তুমি আর মায়ের ঘরে শুতে পাবে না, আমি একলা মায়ের কাছে শোবো।

(৮)

মায়া জনে জনে এই খবর এমন উৎসাহের সহিত শুনাইয়া বেড়াইল যে তাহা তাহার বাবার কানে উঠিতেও বিলম্ব হইল না। গুণময় কন্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ রে মায়া, বীরেনের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে কে বল্লে ?

মায়া ভয়ে-ভয়ে তাহার উচ্ছ্বসিত সহস্র কথা দমন করিয়া শুধু বলিল—মা।

গুণময় শুধু একটা "হুঁ" করিয়া চিন্তার মধ্যে ডুব দিলেন। মায়া বাপকে যমের মতন ডরাইত ; সে বাবাকে গম্ভীর হইতে দেখিয়া সেখান হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া-সরিয়া একটু আড়ালে গিয়াই দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

গুণময় ভাবিতে লাগিলেন—বীরেন ছেলেটা মন্দ নয়, মায়ার সহি বিবাহ দিয়া দিলে বীরেন ঘর-জামাই হইয়াই থাকে, তাহা হইলে মেয়েটাকেও পরের ঘর করিতে যাইতে হয় না এবং বিষয়সম্পত্তিও দূরের কোনো লোকের হাতে গিয়া পড়ে না।

কিন্তু তখনি আবার তাঁহার মনে হইল দয়াদেবী ত শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি ত ঘরসংসার আর দেখিতে পারেন না, স্বামী-সেবাও করিতে পারেন না; অতএব এ-সবের জন্য একজন লোকের আবশ্যক! মাইনে-করা লোকের দ্বারা তেমন কাজ পাওয়া যায় না, তাহারা দরদ দিয়া যত্ন করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকে আর-একটি ডাগর মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ করিলে সেই স্ত্রীর যদি সন্তান হয় তবে ত বিষয়সম্পত্তি সব তাহার। তখন বীরেন মায়াকে লইয়া দাঁড়াইবে কোথায়? মায়াকে কোনো ধনীর এক পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিতে হইবে।

গুণময়ের চিন্তা জন্মিয়াই কাজে পরিণত হইতে চায়। তখনি পঞ্চাননকে ডাক পড়িল।

পঞ্চানন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভায়া আমায় তলব করেছ কেন?

গুণময় তাড়াতাড়ি গড়গড়ার নলটা রাখিয়া দিলেন—পঞ্চানন তাঁহার কর্ম্মচারী হইলেও হাজার হোক বয়সে বড় ও ব্রাহ্মণ ত! বলিলেন—মায়া ত বড় হয়ে উঠেছে, তার একটা বিয়ের চেষ্টা ত করতে হয়।

—হ্যাঁ তা হয় বৈ কি। ঘটকদের খবর দেবো।

—খবর দেবো নয়; এই অগ্রাণ মাসেই বিয়ে দেওয়া চাই; গিন্নি ত এখন-তখন হয়ে আছেন, মেয়ের বিয়েটা দেখে যেতে পারলেও…

পঞ্চানন প্রভুর মুখের কথা নিজের মুখে লুফিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল—

তবু সুখে মরতে পারবেন—সে কথা কি আর বলতে! আমি দশজন ঘটক লাগিয়ে এই মাসেই সমস্ত ঠিক করে ফেলব।

গুণময় একটু ইতস্তত করিয়া আমতা-আমতা করিতে করিতে বলিলেন—হ্যাঁ, তা···আর একটা কথা···কি ভালো বলব মনে করে ডেকেছিলাম···ভুলে যাচ্ছি···ওর নাম কি···হ্যাঁ গিন্নি ত এখন-তখন হয়ে রয়েছেন···বুঝলে কিনা···

ধূর্ত্ত পঞ্চানন আঁচে গুণময়ের মনের কথা আন্দাজ করিয়া বলিয়া উঠিল—আমিও তোমাকে একটা কথা বলব-বলব কদিন থেকে মনে করছি। রাণী-বৌএর ত ঐ অবস্থা! রাজ-সংসারটা ত বজায় রাখতে হয়! এত বড় বিষয় সম্পত্তি ভোগ করবে কে? বাপপিতম'র পিণ্ডিই কি লোপ পাবে? এর একটা ত সত্বর ব্যবস্থা করা দরকার।

গুণময় মনে-মনে খুসী হইয়া গোঁপের তলায় উদ্ভাসিত হাসি চাপিয়া বলিলেন—তবে কি তুমি পুষ্যিপুত্তুর নিতে বল!

পঞ্চানন মহা-ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—আরে রাম রাম! পুষ্যিপুত্তুর আবার মানুষে নেয়? ঐ ত পাহাড়পুরের ধনেশ্বর চৌধুরীর রাণী পুষ্যিপুত্তর নিয়েছিল, তাতে কার ভালোটা হল? তোমার বয়েস কি? আর-একটা বিয়ে কর, সংসার বজায় হবে, ছেলে নেই ছেলে হবে—জমিদারী ভোগ করবার কি পিণ্ডি পাবার জন্যে পরের ছেলেকে ভাড়া করে আনতে হবে না। মায়ার জন্যে ঘটকেরা যেমন পাত্তর খুঁজবে অমনি সেইসঙ্গে একটি ডাগর সুন্দর পাত্রীরও তল্লাস নেবে! মায়ার বিয়ের পর তোমারও বিয়ে অঘ্রাণ মাসে হয়ে যাবে।

গুণময় আহ্লাদে গদগদ হইয়া বাঁধানো দাঁত দুপাটি বিকশিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—তা···তা···গিন্নির এই অবস্থায় বিয়ে করাটা কি ভালো দেখাবে? লোকে কি বলবে?

পঞ্চানন জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—লোকে! কার ধড়ে ভর ওং দুটো মাথা আছে যে তোমায় কিছু বলবে? আর রাণীবৌ।? তঁ এমন অবস্থা বলেই ত তোমার বিয়ে করা বেশী করে দরকার! বং রাখতে হবে না? পিতৃপুরুষ এক গণ্ডূষ জলের জন্যে হাহাকার করছে যে—জরৎকারু মুনির গল্প ত জানো।

গুণময় গোঁপ টানিতে টানিতে খুব গম্ভীর হইয়া বলিলেন—হাঁ তা তো জানি, সেইজন্যেই ত বিয়ে করবার এত আকিঞ্চন—আমার নিজের জন্যে কি? পিতৃপুরুষের পিণ্ডির জন্যে! ঐ বীরেনটা ত আমারই ছেলে হতে পারত, ওর মায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তাকে অমন অপঘাতে মরতেই বা হত কেন। শুভ কার্য্যে হন্তারক হলে তার কখনো ভালো হয় না। তা ঘটকদের একটি পাত্রীরও খোঁজ করতে তা হলে বলে দিয়ো, কিন্তু খুব গোপনে। গিন্নির একটা ভালো-মন্দ হয়ে গেলেই কাজটা সেরে ফেলা যাবে। কিন্তু দেখো ঘুণাক্ষরেও এখন যেন কথাটা না ফাঁস হয়।

পঞ্চানন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আরে রামঃ! সে কথা আমাকে বলতে হবে কেন? আমি রটিয়ে দেবো মায়ার পাত্র খুঁজতে ঘটক লাগিয়েছি; তা হলে আর কেউ আন্দাজও পাবে না।

পঞ্চানন চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া গুণময় এদিক ওদিক চাহিয়া চাপা গলায় বলিলেন—মেয়েটি সুন্দর যত হোক না হোক যেন বেশ ডাগর হয়…এসেই যেন ঘরসংসার বুঝে নিতে পারে…

পঞ্চানন গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া গেল—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক ভায়া, ডাগরও হবে সুন্দরও হবে।

দয়াদেবী যখন শুনিলেন যে বীরেনের সহিত মায়ার বিবাহ দেওয়ায় বাবুর মত নাই এবং মায়ার বর খুঁজিতে অনেক ঘটক লাগানো হইয়াছে,

তখন আর-একটি অভিলাষ সফল না হওয়ার দুঃখ তাঁহার রোগজীর্ণ বক্ষে দারুণ হইয়া বাজিল। তাঁহার রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

(৯)

পূজার ছুটির পর বীরেনের কলেজ খুলিয়াছে, এবার সে বি-এল পরীক্ষা দিবে, তাহার কলিকাতা না গেলেই নয়। বীরেন চলিয়া গেলে দয়াদেবীর কাছে-কাছে থাকিয়া সেবাযত্ন করিবার একজন লোক দরকার। দয়াদেবী মোহিনীকে দিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন—হোব-পুরের মাসীকে আনিয়ে নিলে হয় না? তিনি অনেক দিন থেকে একবার আসতে চাচ্ছেন।

গুণময় বলিলেন—ঝঞ্ঝাট বাড়াবার দরকার নেই। ঝি-চাকর ত রয়েছে।

মোহিনী ফিরিয়া আসিয়া আবার বলিল—মা বললেন, তিনি ত শয্যাগত হয়ে পড়ে আছেন, আপনার খাওয়া-দাওয়া কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে পারেন না, হোবপুরের দিদিমা এলে আপনার খাওয়া-দাওয়া দেখতে পারেন।

গুণময় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—আমার জন্যে গিন্নির ভাবতে হবে না, আমার ব্যবস্থা আমি শিগ্‌গির করে নেবো।

দয়াদেবী মোহিনীর মুখে স্বামীর উক্তি শুনিয়া ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া বালিশের তলা হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আমার কাছে আবার লোকে সাহায্য চায়!

মায়া চিঠিখানি কুড়াইয়া লইয়া আপনার খেলাঘরে এই নূতন সম্পত্তিটি রাখিতে চলিল।

গুণময় সেই সময় বাড়ীর ভিতর খাইতে আসিতেছিলেন। গম্ভীর হইয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মায়া, তোর হাতে কি?

মায়া ভয়ে-ভয়ে বলিল—চিটি।

—দেখি।

মায়া আস্তে আস্তে গিয়া চিঠিখানি বাবার হাতে দিল। খাম হইতে বাহির করিয়া গুণময় যেই চিঠির উপর চোখ রাখিয়াছেন সেই অবকাশে মায়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

গুণময় চিঠি পড়িয়া দেখিলেন দয়াদেবীর হোবপুরের মাসী বয়স্থা কন্যা রাজবালার বিবাহ এখনো দিতে না পারিয়া বিব্রত হইয়া ধনীর গৃহিণী বোনঝির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। যদি বোনঝি ও জামাইএর অনুমতি পান তিনি মেয়েটিকে লইয়া তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া একটি সুপাত্রের সন্ধান করিতে পারেন।

গুণময় দুবার চিঠিখানি পড়িয়া ভাঁজিয়া খামে ভরিয়া পকেটে রাখিলেন।

(১০)

দয়াদেবী একদিন বীরেনকে বলিলেন—বাবা, তোর কি কলেজ খুলে গেছে?…তুই কবে কলকাতায় যাবি?

বীরেন দয়াদেবীর পায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল—তোমায় একলা ফেলে আমি কেমন করে যাব মা।

—আমার জন্যে তোর ভাবনা? আমার ত শেষ হয়ে এসেছে বাবা; এই মড়া আগলে থেকে তুই নিজের পরকাল নষ্ট করিসনে।

—যদি তোমায় দেখবার কেউ থাকত, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে

পারতাম। কিন্তু কেউ ত একটিবারও তোমায় দেখতে আসে না।

সেই কেউটি যে কে তাহা দয়াদেবী বুঝিলেন; বীরেন যে তাঁহার জন্যই শুধু এ বাড়ীতে আবদ্ধ হইয়া আছে তাহা গুণময়ের উপর বীরেনের বিরাগ হইতেও তিনি বুঝিলেন; তাই দয়াদেবী ব্যথিত স্বরে বলিলেন—তিনি যে পুরুষমানুষ বাবা; তাঁদের ঢের কাজ; মেয়েমানুষের রোগে শোকে আসা-যাবার তাঁদের সময় নেই। মোহিনী আছে আমায় দেখবে তুই একটা ভালো দিন দেখে কলকাতা চলে যা।

এমনি সময় ঘরে একজন বিধবা ও তাঁহার পশ্চাতে একজন যৌবনোন্মুখী কিশোরী আসিয়া প্রবেশ করিল।

দয়াদেবী বিধবাকে দেখিয়াই অভিমানের রুষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিলেন—মাসিমা, তুমি এলে কেন? তোমাকে ত আমি আসতে লিখিনি।

আগন্তুক বিধবাটি অভিমানে ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন—তুমি আমার তেমনি মেয়েই বটে বাছা! নিজে রাজরাণী হয়েছ, গরিব দুঃখী মা-মাসীদের কি আর মনে পড়ে। মেয়েটা ডাগর হয়ে উঠছে বলেই তোমায় জানিয়েছিলাম; তা এমন হেনস্তা, যে, চিঠিখানার জবাব পর্য্যন্ত দিলে না। জামাই আমার লক্ষেশ্বর হয়ে শতেক বচ্ছর পেরমাই পান, তাঁর যাই দয়ার শরীর, তাই তিনি আমার চিঠি কুড়িয়ে পেয়ে সব জানতে পেরে আমাদের আনতে লোক পাঠিয়েছিলেন। নইলে কি আমি তোমার বাড়ীতে মেয়ে নিয়ে অমনি বেচে এসেছি বাছা!

দয়াদেবী স্বামীর অকস্মাৎ দয়ার পরিচয়ে সন্দেহাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—রাজুও এসেছে বুঝি?

—জামাইএর আমার দয়ার শরীর! তিনি রাজুর বিয়ে দিয়ে দেবেন বলে আনিয়েছেন। রাজু, তোর দিদিকে পেন্নাম কর।

মায়ের পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া গিয়া রাজবালা শয্যাশ দয়াদেবীর পায়ের ধুলা লইল।

দয়াদেবী হাত বাড়াইলেন, রাজবালা কাছে সরিয়া গেল। দয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তারপর মাসীকে বলিলে মাসী, আমার ত ওঠবার শক্তি নেই, পায়ের ধুলো দাও।

মাসী অভিমানের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—থাক, বাছা, অম আশীর্ব্বাদ করছি······

যতক্ষণ মাসী-বোনঝিতে আলাপ হইতেছিল ততক্ষণ বীরেন দয়াদে শিয়রের কাছে খাটের দাণ্ডা ধরিয়া অবাক মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া f তাহার চক্ষে পলক পড়িতেছিল না, তাহার হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-দর্শনের আ ধরিতেছিল না, সে একদৃষ্টে দেখিতেছিল রাজবালাকে। কুসুম-লগ যৌবনলীলার মতন অনুপম লাবণ্যময়ী এই যে কিশোরীর সর্ব্বা বসন্ত-দর্শনে আনন্দিত বনশ্রীর স্মিতহাস্যের ন্যায় একটি সলজ্জ হা জড়াইয়া আছে তাহা বীরেন্দ্রের মর্ম্মস্থলে গিয়া জ্যোৎস্না-প্রলেপের মত লাগিতেছিল; বীরেন্দ্রের দুঃখাভিহত জীবন-বীণার মর্চেধরা তার আ যেন সকল জীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া জন্মসার্থক-করা আনন্দ-রাগিণীত বাজিয়া উঠিয়াছিল; তাহার অন্তরের যৌবন-মুকুল এই নবোদি আলোক-রেখাটির স্পর্শ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল; তাহা সমস্ত প্রাণমন হৃদয় যৌবন বলিয়া উঠিল—তোমারই অপেক্ষায় আ ছিলাম!

বীরেনকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া রাজবালার মুখ সলজ্জ স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল; সে সঙ্কুচিত হইয়া মাথ নত করিয়া দাঁড়াইল। তাহাতে রাজবালার মায়ের নজর বীরেনের উপর পড়িল। সেই সুগৌর সুকুমার ছেলেটিকে মুগ্ধনেত্রে রাজবালার

দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি দয়াদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দয়া, এই ছেলেটি ?

দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ওটি আমারই ছেলে মাসিমা। বীরু, তোর দিদিমাকে পেন্নাম কর্।

বীরেনের চমক ভাঙিল; সে অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি রাজবালার পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল। রাজবালা দ্বিগুণ লজ্জায় লাল হইয়া পিছু হটিয়া গেল।

দয়াদেবী বলিলেন—বীরু, তোর দিদিমাদের বসতে দে।

বীরেন তাড়াতাড়ি শ্বেতপাথরের মেঝের উপর একখানা কার্পেট বিছাইয়া দিল।

রাজবালার মা তাহাতে বসিয়া ভাবিলেন—এই ছেলেটির সঙ্গে রাজুর বিয়ে দেবার জন্যেই জামাই রাজুকে আনিয়েছেন দেখ্‌ছি। তা দিব্যি ছেলেটি! রাজুর শিবপূজো সার্থক হল এতদিনে!

বীরেনকে দয়াদেবী বলিলেন—বীরু, এইবার তুই কলকাতা যা; মাসিমা এসেছেন আর ভাবনা কি ?

বীরেন বড় জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দয়াদেবীর মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—দয়া, তোর মেয়ে......

এমন সময় সকলকে অবাক করিয়া দিয়া গুণময় সেইঘরে প্রবেশ করিলেন।

রাজবালার মা তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা টানিয়া চাপা গলায় বলিলেন—ওমা! জামাই!...রাজু, তোর জামাই-দাদাকে পেন্নাম কর।

রাজবালা দেখিল একজন অতি কালো অতি বেঁটে অতি মোটা লোক! তাহার হাত-পাগুলি খাটো-খাটো, মাথাটি ছোটো, ভুঁড়িটি

বিপুল! খুব বড় খোঁচা-খোঁচা গোঁপ, মাথায় টাক পড়িবার পরোয়ান জারি হইয়াছে! এই নাকি তাহার দয়া-দিদির বর! তাহাকে দেখিয় রাজবালার অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল। রাজবালা চকিতে একবা সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল, আর সকলেও হাসিতেছে কি না। কিন্তু সে দেখিল ভয়ে বীরেনের মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে; দয়াদের অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছেন। আর গুণময়ের মুখে হাসি দেখা দিলেও তাহা ভয়ানক দেখাইতেছে, যেন জল্লাদের খাঁড়ার ধার রাজবালা ভয়ে-ভয়ে দূর হইতে প্রণাম করিল।

গুণময় গদ্গদভাবে বলিয়া উঠিলেন—থাক্ থাক্! দিব্যি মেয়েটি ত!

গুণময় অগ্রসর হইয়া গিয়া রাজবালার চিবুক ধরিয়া নত মুখ তুলিয় মুগ্ধ নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

রাজবালার মা চাপা গলায় ঘোমটার মধ্য হইতে বলিলেন—এখ আমার জাঁতি ধর্ম্ম তোমার হাতে এনে দিলাম বাবা। নিজের মেয়ে কথা নিজের মুখে বলতে নেই; তবে তুমি আপনার লোক, দেখতেই পাচ্ছ বাবা, রাজু আমার দেখতে শুনতে মন্দ নয়, ঘরকন্নার সব কাজকর্ম জানে, গোবরপুরে খৃষ্টানদের মেয়েস্কুলে লেখাপড়া সেলাই গানবাজন সবই শিখেছে, ডাগর নয়, তা যা হতে হয়! কিন্তু হলে কি হবে বাবা আজকাল ত মেয়ে অমনি বিকোয় না; তুমি দয়া করে যখন ভার নিয়েছ তখন আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। ঐ ছেলেটিকে পাত্তর ঠিক করেছ বুঝি আহা! দিব্যি ছেলেটি!

রাজবালা চকিতে একবার চোখ তুলিয়া বীরেনের দিকে চাহিল বীরেন তখন ব্যাধভীত হরিণের মতন দারুণ ত্রাসে বড় বড় চঞ্চল চোখে গুণময়ের দিকে চাহিতে-চাহিতে ঘর হইতে পলায়ন করিতেছে।

গুণময় গর্জ্জন করিয়া ডাকিলেন—হ্যাঁরে বীরে!

বীরেন্দ্র জল্লাদের খাঁড়ার নীচে পরমুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান দণ্ডিতের স্থায় আড়ষ্ট হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ্ঞে ?

—এখনো কলকাতা যাসনি যে বড় ?

বীরেন শুষ্ককণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলিল—আজ্ঞে কাল যাব।

বীরেন পলায়ন করিলে গুণময় বলিলেন—রাজুর জন্যে আমি খুব ভালো পাত্তর ঠিক করে রেখেছি মাসিমা। রাজুকে একেবারে রাজরাণী করে দেবো! সে-সব কথা পরে হবে; এখন হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে জপটপ করে একটু জল খেয়ে ঠাণ্ডা হোন। এস রাজু, তোমার থাকবার ঘরটর সব দেখিয়ে দিগে।

রাজবালা চকিতে একবার মায়ের ও দয়াদেবীর দিকে চাহিয়া মাথা নত করিয়া বসিল। গুণময় তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আবার ডাকিলেন—এস।

রাজবালার মা মেয়ের গায়ে ঠেলা দিয়া চাপা গলায় বলিলেন—যা না।

রাজবালা নিতান্ত অনিচ্ছায় গুণময়ের সঙ্গে উঠিয়া গেল।

গুণময় রাজবালার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া আপনার প্রকাণ্ড অট্টালিকার সুসজ্জিত এক ঘর হইতে আর-এক ঘরে লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একএকটা ঘর দেখান আর রাজবালাকে জিজ্ঞাসা করেন—কেমন রাজু, তোমার পছন্দ হয় ?

রাজবালা স্মিত মুখ নত করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে তাহার নিষ্কৃতি নাই, গুণময় পীড়াপীড়ি করেন—বল, জবাব দাও।

রাজবালা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেও গুণময়ের মনঃপূত হয় না, বলেন—আমার সঙ্গে কথা কও ভাই।

সমস্ত ঘর দেখাইয়া গুণময় বলিলেন—রাজু, এ সমস্ত ঘর, সমস্ত জিনিস, তোমার। আমি তোমায় বিয়ে করব, তুমি আমার রাণী হবে।

রাজবালা মনে করিল ভগ্নীপতি তাহার সহিত রসিকতা করিতেছে। সে মৃদু হাসিয়া লজ্জিত মুখ নত করিল।

ইহা দেখিয়া গুণময়ের মনে আগুন ধরিয়া উঠিল, তিনি গণেশের শুঁড়ের মতন দুখানি খাটো খাটো স্থূল বাহু বিস্তার করিয়া রাজবালাকে ধরিতে গেলেন। রাজবালা "বাবারে!" বলিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়া সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

ঘর-বারান্দা দালান-সিঁড়ির গোলকধাঁধা পার হইয়া সে যে কোথায় গিয়াছিল এবং কোন্ পথে ফিরিলে সে আবার আপনার মায়ের বা দয়া-দিদির কাছে পৌছিতে পারিবে তাহা সে ঠিক করিতে না পারিয়া আনায়-বদ্ধ হরিণীর মতন ফ্যালফ্যাল করিয়া চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে এক ঘর হইতে অপর ঘরে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক-একটা ঘরে দেয়ালসই আয়নায় নিজের ভয়চকিত মূর্ত্তি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠে; কান্নায় তাহার বুক ফাটিয়া পড়িতে চাহে, কিন্তু কান্নার তাহার অবসর নাই। এত বড় বাড়ী—ঘরের অরণ্য—একটা লোক কিন্তু কোথাও নাই যাহার আশ্রয় সে লইতে পারে, যাহাকে সে পথ জিজ্ঞাসা করিতে পারে।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে দেখিল সম্মুখের দালান দিয়া বীরেন যাইতেছে। রাজবালা ছুটিয়া গিয়া ব্যাকুল হইয়া বীরেনকে বলিল—তুমি আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল না!

বীরেন একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল—এস।

রাজবালা যাইতে যাইতেও চকিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল কোনো আড়াল হইতে গুণময়ের গোঁপের খোঁচা বাহির হইয়া আসিতেছে কি না।

রাজবালাকে সঙ্গে লইয়া বীরেন্দ্র দয়াদেবীর ঘরে আসিল; সেখানে রাজবালার মা ছিলেন না, মায়া ছিল। বীরেনের সঙ্গে রাজবালাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই মায়া বলিয়া উঠিল—বীরেন-দা, ও কে?

বীরেন রাজবালার পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিয়া একবার রাজবালার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল; রাজবালাও মুচকি হাসিয়া মাথা নত করিল। দয়াদেবী বলিলেন—ও তোর মাসী হয়।

মায়া অবাক হইয়া রাজবালার দিকে চাহিয়া রহিল; সে বুঝিতে পারিতেছিল না এই মাসী আবার কোথা হইতে কখন্ আসিল, এবং আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে সে বীরেন-দাদার সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিল কেমন করিয়া।

বীরেন দয়াদেবীকে বলিল—মা, দিদিমা কোথায়, এ খুঁজছে।

—মাসিমা ঠাকুর-ঘরে জপ করতে গেছেন, নিয়ে যা।

রাজবালা লজ্জিত মুখ বীরেনের দিকে ঈষৎ তুলিয়া বলিল—আমি দিদির কাছেই থাকি।

দয়াদেবী বলিলেন—আয় বোস্। মায়া, মোহিনীকে বল্ তোর মাসীকে জলখেতে দেবে।

মায়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিয়া উঠিল—বীরেন-দা বলুক না, ওর সঙ্গে তুই আগে থাকতে ভাব করা হয়েছে!

রাজবালা হাসিয়া অপাঙ্গে একবার বীরেনের দিকে, একবার মায়ার দিকে, একবার দয়াদেবীর দিকে চাহিল, তাহার টানা-টানা চোখ দুটি এক চমকে চারিদিকে শফরীর ন্যায় খেলিয়া গেল। তারপর সে ধীর মৃদু স্বরে বলিল—আমি এখন কিছু খাব না।

দয়াদেবী বলিলেন—তবে মায়ার সঙ্গে খাস। আয় এইখানে বোস্।

রাজবালা দয়াদেবীর পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

বীরেনও দয়াদেবীর পদসেবার উপলক্ষ করিয়া রাজবালার পাশে গিয়া বসিল; রাজবালা স্মিতমুখে অপাঙ্গে বীরেনের দিকে একবার চাহিয়া একটু তফাতে সরিয়া বসিল। পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বীরেনের আঙুল বার-বার রাজবালার হাতে ঠেকিতে লাগিল, এক-একবার স্পর্শ লাগে আর রাজবালার মুখ লাল হইয়া উঠে, মাথা ঝুঁকিয়া পড়ে। রাজবালা বীরেনের হাতের গতির অভিমুখেই নিজের হাত চালাইতে চায়, কিন্তু বীরেন বার-বার নিজের হাতের গতি বদলাইয়া রাজবালার হাতের বিপরীতগামী করিয়া লইতেছিল এবং মধ্যপথে রাজবালার হাতের কাছাকাছি আসিয়া বীরেনের একটা-দুটো আঙুল হঠাৎ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। এই তরুণ যুবকের এই খেলায় কিশোরীর মনে কম কৌতুক উদয় হইতেছিল না। তাহার সারা অন্তর হাসিতে খিলখিল-খিলখিল করিয়া বাজিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। ক্রমে সঙ্কোচ দূর করিয়া সাহস করিয়া রাজবালা থাকিয়া থাকিয়া বীরেনের অভিসারী আঙুলের উপর মৃদু টোকার তিরস্কার বর্ষণ করিতে লাগিল এবং এক-একবার উচ্ছ্বসিত হাসি চাপিতে-চাপিতেও মৃদু খিখ-খিখি শব্দ করিয়া উঠিতে লাগিল।

এই যে প্রীতির কৌতুকলীলা দয়াদেবীর পায়ের উপর দিয়া চলিতেছিল তাহা তাঁহার অবিদিত থাকিতেছিল না; তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বাবা বীরু, কালকেই তুই কলকাতা যাবি ত?

বীরেন্দ্র হঠাৎ-আহ্বানে চমকিয়া উঠিয়া বলিল—হ্যাঁ মা, নইলে কি

বাকি থাকবে?

বীরেন ব্যথিত দৃষ্টিতে রাজবালার মুখের দিকে চাহিল। রাজবালাও অর্দ্ধেক বুঝিয়া এবং অর্দ্ধেক না বুঝিয়া ভয় ও মমতায় দৃষ্টি ভরিয়া বীরেনের দিকে চাহিল; তারপর দুইজনের মিলিত দৃষ্টি পুষ্পাঞ্জলির মতন দয়াদেবীর চরণের উপর গিয়া পড়িল।

দয়াদেবী আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—একবার পাঁজিখানা দেখ ত।

বীরেন পাঁজি খুলিয়া ঢোক গিলিয়া মিথ্যা করিয়া বলিল—কাল তেরোস্পর্শ।

—তবে কাল কিছুতেই তোর যাওয়া হবে না। পরশু?

—অশ্লেষা!

—তবে ত পরশুও হবে না; তরশু মঘা, তরশুও হবে না। তারপর?

তারপর কি বলিলে তাহার যাত্রাটা সেদিনকার মতনও স্থগিত থাকে বীরেন্দ্র তাহাই খুঁজিতেছিল। দয়াদেবী বীরেনের উত্তর না পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—তার পরদিন কি?

বীরেন থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—শুক্কুরবার।

—শুক্কুরবার ত জানি। কোন্ তিথি দ্যাখ্ না।

—ত্রয়োদশী।

—সর্ব্বসিদ্ধি তেরোদশী। শুক্কুরবারই তুই যাস। এই কদিন তুই একটু লুকিয়ে থাকিস। উনি টের পাবেন না, আমার ঘরেই থাকিস; এঘরে ত তিনি কখনো আসেন না। দ্যাখ মায়া, তুই যেন ওঁর কাছে বলে ফেলিসনে যে তোর বীরেন-দা কলকাতা যায়নি।

মায়া গোঁজ হইয়া বসিয়া চোখ পাকাইয়া বীরেন ও রাজবালার কৌতুক-লীলা দেখিতেছিল, মায়ের কথায় হাঁ-কি না কিছুই বলিল না।

পাঁজির উপর বীরেন্দ্রের অত্যন্ত রাগ হইল, এত তাড়াতাড়ি সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী না আসিলেই কি চলিত না! বীরেন নিজের উপরও খুব রাগ করিল—ত্র্যহস্পর্শ অশ্লেষা মঘা সে পাঁজিতে না দেখিয়াও বলিতে পারিল, এবং পাঁজি দেখিয়া বলিল কিনা ত্রয়োদশী এবং তাহা তাহার কপালগুণে হইয়া পড়িল সর্ব্বসিদ্ধি! বীরেনের অকারণে কেন অত্যন্ত কান্না আসিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাঁজি তুলিয়া রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মায়া এতক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রাগে ফুলিতেছিল। বীরেন ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবামাত্রই সেও মায়ের খাট হইতে এক লাফে নামিয়া ছুটিয়া গিয়া বাঘিনীর মতন বীরেনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং দুই হাতে চড় কিল বর্ষণ করিতে করিতে কেবলি বলিতে লাগিল—কেন কেন তুমি কেন ওর সঙ্গে······

বীরেন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া মায়ার মার খাইতে লাগিল; তাহার মনের মধ্যেকার জমা অশ্রু এই একটা উপলক্ষ পাইয়া মুক্তি পাইয়া বাঁচিল, তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এমন সময় মোহিনী-ঝি সেখানে আসিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল—ছি দাদাবাবু! ছেলেমানুষের মারে তুমি কাঁদছ!

মায়া চোখ তুলিয়া বীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া যেই দেখিল বীরেনের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, অমনি সেও ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার কান্না দেখিয়া মোহিনী বিদ্রূপ করিল ও মায়া কাঁদিল বলিয়া বীরেন নিজের উপর, মোহিনীর উপর ও মায়ার উপর বিরক্ত হইয়া তাড়াতাড়ি নিজের চোখ মুছিয়া মোহিনীর দৃষ্টি হইতে পলায়ন করিয়া মায়াকে টানিতে-টানিতে লইয়া মায়ার খেলিবার ঘরে চলিয়া গেল।

বীরেন মায়ার চোখ মুছাইয়া বলিল—চুপ করো লক্ষ্মীটি। এস গোলোক-ধাম খেলি।

মায়া রুষ্ট অভিমানের স্বরে বলিয়া উঠিল—তুমি যেমন দুষ্টু নরককুণ্ডে পড়ে পচে মর ত বেশ হয়! হে হরি কিছুতেই যেন বীরেন-দার এক-চিত না হয়!……

বীরেন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আমার একেবারে সাত চিতে গোলোকধাম গমন হবে।

মায়া জেদ করিয়া বলিল—ককখনো না। আচ্ছা খেলো।

দুজনে ছক পাতিয়া খেলিতে বসিল।

খেলিতে আরম্ভ করিয়াই মায়া নরককুণ্ডে গেল এবং তাহাতে মায়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে ক্রমাগত কড়ির দান ফেলিতেছে কিন্তু একচিত আর হয় না; ওদিকে বীরেন টপ-টপ করিয়া উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। এমন সময় বীরেন দেখিল রাজবালা সেই ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছে। বীরেন তাড়াতাড়ি চুপিচুপি মায়াকে বলিল—মায়া, তোমার মাসীকে ডাকো, তিন জনে খেলি।

মায়া একবার ঘাড় ঘুরাইয়া রাজবালাকে দেখিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—না, ওর সঙ্গে খেলব না।

রাজবালা চলিয়া যায় দেখিয়া বীরেন তাড়াতাড়ি ডাকিল—তোমাকে মায়া গোলোকধাম খেলতে ডাকছে।

রাজবালা হাসিমুখে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

বীরেন হাসিয়া বলিল—এস, গোড়া থেকে খেলি…

তাহার নিষেধ সত্ত্বেও বীরেন রাজবালাকে ডাকিল, রাজবালা আসিয়া তাহাকে নরককুণ্ডে পড়িয়া থাকিতে দেখিল বলিয়া; এবং তাহার সহিত খেলা অপেক্ষা রাজবালার সহিত খেলিতেই বীরেনের বেশী আগ্রহ,

এতক্ষণ বীরেন মুখ বিবন্ন করিয়া খেলিতেছিল, এখন রাজবালাকে দেখিয়া তাহার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, মায়া রাগে একেবারে জলিয়া উঠিল এবং "তোমরাই খেল, তোমরাই খেল" বলিতে বলিতে দানের কড়ি ছুড়িয়া ছুড়িয়া বীরেনকে সজোরে মারিল ও কাগজের ছকখানা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া রাজবালার মুখের উপর ফেলিয়া দিয়া ঘর হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

এককড়া কড়ি ছিটকাইয়া গিয়া বীরেনের চোখে লাগিয়াছিল। বীরেন কাপড় দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া রাজবালা তাড়াতাড়ি গিয়া বীরেনের হাত ধরিয়া বলিল—ছাড়ো ছাড়ো আমি দেখি, কাপড়ের ভাপ দিয়ে দি।

রাজবালা বীরেনের চোখ হইতে তাহার হাত সরাইয়া নিজের আঁচলের খুঁটের নুটি পাকাইয়া সুন্দর দুখানি গাল ফুলাইয়া ফুলাইয়া তাহার উপর ফুঁ দিয়া দিয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বীরেন চোখ খুলিতে পারিলে রাজবালা ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিল—ওমা! চোখের শাদার ওপরে রক্ত জমে গেছে যে! ভাগ্যিস চোখের তারাতে লাগেনি! এখনো ব্যথা করছে কি?

বীরেন এমন মার মুহূর্তে মুহূর্তে খাইতে প্রস্তুত ছিল এমন ব্যথার ব্যথী দরদের মরমী যদি তাহার শুশ্রূষা করে। বীরেন হাসিয়া বলিল—অমন মুখের ফুঁ আরো পাবার জন্যে ব্যথা ত যেতে চাচ্ছে না!

রাজবালার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিল। বীরেন ব্যস্ত হইয়া রাজবালার হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল—তুমি চলে যেয়ো না। আমি তোমায় একটু দেখবো বলে দেবতার মতন যে মা তাঁর কাছেও মিথ্যে কথা কয়েছি—তেরস্পর্শ মঘা অশ্লেষা পাঁজিতে নেই, আমার মনে আছে বলে এ তিনদিন আমার যাত্রা

নিষেধ! মায়ার বাবা দেখতে পেলে আমায় আস্ত রাখবেন না। তবু ত আমি যেতে পারছি না। তুমি আর দুদিন পরে আমি চলে গেলে এলে না কেন?

রাজবালার মনের মধ্যে বিচিত্র সুরে জলতরঙ্গ বাজিয়া উঠিল। এই সুশ্রী সুকুমার তরুণ যুবক তাহাকে একটু দেখিতে পাইবার জন্য কী কঠিন কাজ যে করিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল। রাজবালা অল্পক্ষণেই বুঝিতে পারিয়াছে যে দয়াদেবী কিরূপ মমতাময়ী সরলহৃদয়া। তাঁহাকে প্রতারণা করা বড় অন্যায় বলিয়াই বড় কঠিন। আবার গুণময় যে কিরূপ ভয়ানক তাহা রাজবালা নিজে ঠেকিয়া বুঝিয়াছে, গুণময়কে দেখিয়াই বীরেন্দ্র ভয়ে কিরূপ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল তাহাও সে দেখিয়াছে এবং বীরেন কালই কলিকাতায় চলিয়া না গেলে যে তাহার রক্ষা থাকিবে না তাহাও রাজবালা দয়াদেবীর কাছে বীরেনকে বলিতে শুনিয়াছে। রাজবালা আবার ইহাও শুনিয়াছে যে তাহার মা গুণময়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বীরেন্দ্রই কি রাজবালার নির্দিষ্ট বর? এইসব ব্যাপার মিলিয়া মিশিয়া রাজবালার মনের মমতা ও প্রীতিকে বীরেন্দ্রেরই অভিমুখী করিয়া তুলিল; প্রীতির ফুলের পর প্রীতির ফুল দিয়া সে তাহার প্রণয়ের পুষ্পমাল্য গাঁথিয়া তুলিতে লাগিল, বীরেন্দ্রের গলায় বরমাল্য দান করিবে বলিয়া।

যখন মনোভাব পুষ্পধনু লইয়া দুটি হৃদয়ে চাঁদমারি করিতে ব্যস্ত ছিলেন তখন হঠাৎ তাঁহার সকল খেলা ভুলাইয়া ভয় লাগাইয়া গুণময়ের চটিজুতা পটাস-পটাস করিয়া ডাকিয়া উঠিল। বীরেন ঐ শব্দটি বিলক্ষণ চিনিত। বীরেন্দ্র চকিত হইয়া "মায়ার বাবা!" বলিয়াই পিছনের দরজা দিয়া পলায়নের উপক্রম করিল। বীরেন্দ্র তাহাকে অসহায় ফেলিয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া রাজবালাও তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিতে-ছুটিতে ভয়ে শুষ্ককণ্ঠে বলিল—আমাকে দয়া-দিদির ঘরে দিয়ে এস।

বীরেন বলিল—ঐ দিকেই ত ও যাচ্ছে! তোমার মা ঠাকুরঘরে আছেন, ঠাকুরঘরে চল।

ব্যাধ-তাড়িত হরিণ-হরিণীর মতন তাহারা এঘর সেঘর পার হইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া পড়িল।

(১২)

গুণময় রাজবালাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি পীড়িতা স্ত্রীকে দেখিতে এতদিন একবারও তাঁহার ঘরের চৌকাঠ ডিঙান নাই; আজ রাজবালার সন্ধানে আবার তিনি দয়াদেবীর ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। ঢুকিয়াই দেখিলেন সে-ঘরে রাজবালা নাই; দয়াদেবী শুইয়া আছেন, পাশে মায়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে। গুণময় জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজু কোথায়?

দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার বুকে কান্নার তুফান ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছিল। মায়া চোখ পাকাইয়া বাবার দিকে তাকাইয়া রহিল, কিছু বলিল না। মায়া ভাবিতেছিল—এ এক কোথা হইতে আপদ আসিয়া উপস্থিত হইল,—বীরেনদাদা তাহাকেই চায়, তাহার বাবাও তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে!

কেহ কিছু কথা বলিল না দেখিয়াও গুণময়ের রাগ হইল না, কারণ কাহারও উত্তর শুনিবার অপেক্ষায় তিনি সে ঘরে মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না, যেমন ঢোকা অমনি বাহির হইয়া চলিয়া যাওয়া। গুণময় সকল ঘরে উঁকি মারিতে-মারিতে ঠাকুরঘরেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরঘরের শুধু সামনেই দরজা ছিল, সুতরাং বীরেন্দ্র পলায়নের কোনো উপায় না দেখিয়া গুণময়ের ঘরে ঢুকিবার আগেই ফস্ করিয়া পাশ-কুঠুরীতে গিয়া

তাহার দরজা ভেজাইয়া দিল ; এই পাশ-কুঠুরীতে ঠাকুরের বাসন-কোষন থাকে, এখান হইতে বাহির হইবার পথ ঠাকুর-ঘরের ভিতর দিয়া ছাড়া অন্য দিকে নাই। বীরেনকে হঠাৎ পলায়ন করিতে দেখিয়া ভীত রাজবালা তাড়াতাড়ি গিয়া মায়ের কাছ-ঘেঁসিয়া বসিল।

গুণময় ঘরে ঢুকিয়াই দুপাটি বাঁধানো দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিলেন—এই যে রাজু, তুমি এখানে, আর আমি তোমাকে সারা বাড়ী গোরু-খোঁজা করে বেড়াচ্ছি!

শ্যালিকার প্রতি এই চাবাড়ে রসিকতা প্রয়োগ করিয়া গুণময় ভুঁড়ি কাঁপাইয়া-কাঁপাইয়া খুব হাসিতে লাগিলেন, সে হাসি আর থামিতে চায় না। সেই হাসি দেখিয়া ভয়ে রাজবালার মুখ কিন্তু শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। তাহা লক্ষ্য না করিয়া গুণময় হাসি সামলাইয়া বলিলেন—মাসিমা, আমার বাড়ীতে ত লোকজন কেউ নেই, ও ত পড়ে' ; এ বাড়ী আপনারই, আপনি সব ঘর-সংসার দেখে শুনে নেন ; খাবার-দাবার যা যখন দরকার হবে নিজে হাতে নিতে কিন্তু-বোধ করবেন না।

রাজবালার মা আধ-ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে বলিলেন—তা বাবা বলতে হবে কেন—এ ত আর আমার পাতানো সম্পর্ক নয়?

—আপনাকে আর বাড়ী ফিরে যেতে দেবো না মাসিমা, এই বাড়ীর গিন্নি হয়ে থাকতে হবে।

—আমার আর বাড়ী যাবার দরকার কি বাবা? একটি সুপাত্তরের সঙ্গে রাজুর দু-হাত এক হয়ে গেলে ও ত পরের ঘর করতে চলে যাবে, আমি বাড়ীতে আর কার জন্যে যাব?

—রাজুকেও আমি পরের ঘরে যেতে দেবো না মাসিমা ; রাজুও এই বাড়ীতেই থাকবে তার ব্যবস্থা আমি ঠিক করেছি।

—সেই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে বুঝি……

পাশের কুঠুরীতে বীরেন উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। গুণময় রাজবালার মায়ের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—না, না, সেটা একটা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, সে কি রাজুর যুগ্যি? রাজুকে আমিই বিয়ে করব ঠিক করেছি।

রাজবালার মা মনে করিলেন জামাই বুঝি শালীর সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—রাজরাণী হবার ভাগ্যি কি রাজুর হবে! তোমার মতন সোয়ামীর গলায় মালা দেওয়া সাত জন্ম শিব-পূজো করলে তবে ঘটে!

গুণময় খুসী হইয়া বলিলেন—আপনার বোনঝির যে-রকম অবস্থা তাতে সে ত আর বেশীদিন বাঁচবে না। আমার একটি বিয়ে না করলে ত চলবে না।

—তা করবে বৈকি বাবা, তোমার আর বয়েস কি হয়েছে? তোমরা ত সেদিনকার দুধের ছেলে, ও-বয়সে ত লোকের প্রথম বিয়ে হয়—তোমার ওপর মা-লক্ষ্মীর কৃপা আছে তুমি একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করতে পার।

গুণময় চরম খুসী হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন—সেইজন্যেই ত মাসিমা আপনাদের আনিয়েছি। এইসব বাড়ীঘর জিনিসপত্তর সব রাজুর —মায়া ত দুদিন পরে পরের বাড়ী চলে যাবে।

এই অভাবিত সম্ভাবনায় রাজবালার মায়ের মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি গদগদ ভাবে বলিলেন—জপের আসনে বসে প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি বাবা, তুমি আমায় যেমন নির্ভাবনা করে সুখী করলে এমনি নির্ভাবনা হয়ে তুমিও সুখী হবে; আমার মাথার যত চুল তত বছর তোমার পেরমাই হবে। রাজু আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি দুদিনেই তা বুঝতে পারবে।

তারপর তিনি আমতা-আমতা করিতে-করিতে বলিলেন—বিয়েটা তা হলে দয়ার একটা ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলেই তবে ?

—সেজন্যে অপেক্ষা করে কি হবে মাসিমা ? ও যখন মরবেই তখন বিয়েটা মুলতবি রাখা কেন ? এই অঘ্রাণ মাসেই বিয়েটা হয়ে যাক।

—তা যা ভালো বোঝো তাই কোরো বাবা, দয়া যেন মনে কষ্ট না পায়।—বলিতে বলিতে দয়াদেবীর মাসিমা অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জন করিলেন।

—ওকে এখন বিয়ের কথা কিছু বলে কাজ নেই। এর মধ্যে মরে যায় ভালোই, নয়ত বিয়ের দিন বললেই হবে। কথাটা এখন গোপন রাখবেন।

—বেশ, তাই হবে বাবা।

রাজবালার মা এ-বাড়ীতে আজ এই নূতন আসিয়াছেন ; বীরেনকে পাশের ঘরে যাইতে তিনি দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে সে সেখানেই বন্দী হইয়া থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছে, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে বীরেন ঐ ঘরের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে। গুণময়ও আশঙ্কা করেন নাই যে কেহ পাশ-কুঠুরীতে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাদের ষড়যন্ত্র শুনিতেছে। কেবল রাজবালা দেখিতেছিল দরজার ঈষৎ ফাঁকে এক-একবার একটা চোখ চকচক করিয়া উঠিতেছিল। গুণময়ের পীড়িতা স্ত্রীর প্রতি এই মমতাহীন নিষ্ঠুরতা রাজবালার ভয়কে দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল ; সে ত মায়ের মুখেই গল্প শুনিয়াছিল যে গুণময় যখন দয়াদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়া ঘরে পড়িয়া ছিলেন! আবার এই স্ত্রী যখন মৃত্যুর দ্বারে উপনীত তখন তিনি তৃতীয় বিবাহের জন্য ব্যস্ত! রাজবালার অন্তর ভয় ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল,—এই ভয়ানক লোককে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না।

গুণময় কণ্ঠস্বরে আদর ঢালিয়া বলিলেন—রাজু, এস ; বাগানে কত পাখী, খরগোশ, হরিণ, ফুল আছে দেখবে চল।

রাজবালা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া মায়ের আঁচল চাপিয়া ধরিল।

মা এক ঝটকায় আঁচল ছাড়াইয়া লইয়া চাপা তিরস্কার করিয়া বলিলেন—যা না! তুই কি এখনো কচি খুকী আছিস রাজু! আজ বাদে কাল যে সোয়ামী হবে সে আদর করে ডাকছে, যা···

তিনি মেয়েকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিলেন। রাজবালা মায়ের আঁচল দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার মা তাহার উপর বিরক্ত ও গুণময়ের নিকট অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—আজকে ওর লজ্জা করছে বাবা ; কাল ওকে নিয়ে যেয়ো···

গুণময় হতাশ হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দয়াদেবীর ঘরের সামনে দিয়া তাঁহার চটিজুতা আবার চটাস-পটাস করিয়া ডাকিয়া চলিয়া গেল।

গুণময় চলিয়া যাইতেই রাজবালা মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল—মা, আমি ওকে বিয়ে করতে পারব না, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ো না!

তাহার মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—চুপ চুপ, অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনিসনে, হাতের লক্ষ্মী হেলায় পায়ে ঠেলিসনে। ভাগ্য বলে মান যে তুই জামাইএর নজরে ধরেছিস!

বীরেন্দ্র তখনও বন্দীশালা হইতে বাহির হইতে পারিতেছিল না। রাজবালার মা না নড়িলে সে পলাইবে কেমন করিয়া।

খানিকক্ষণ পরে তাহাকে মুক্তি দিয়া মোহিনী আসিয়া ডাকিল—দিদিমা, মাসিমাকে নিয়ে এস, জলখাবার দেওয়া হয়েছে।

ঠাকুরঘরের পাশ-কুঠুরী হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়াই বীরেন্দ্রের মনে হইল সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা দয়াদেবীকে গিয়া এখনি বলিয়া দিবে। কিন্তু তখনি তাহার মনে হইল স্বামীর এই নিষ্ঠুরতার সংবাদ হয়ত তাঁহার মনে সাংঘাতিক বাজিবে; রাজবালার উপর তাঁহার মন বিরূপ হইয়া যাইবে। তাহার আশ্রয়দাত্রী মাতা দয়াদেবীকে কষ্ট দিবার ও অপমান করিবার ষড়যন্ত্র হইতেছে বলিয়া এবং প্রবল পরাক্রান্ত গুণময় এখানেও তাহার রাহুরূপে সকল সুখের আশাটুকুও গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া বীরেনের বুক যেন ভাঙিয়া যাইবার মতন হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে গুণময়কে তখন খুন করিতেও পারে। বীরেন মায়ার খেলিবার ঘরে গিয়া মেজেয় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

মায়া এতক্ষণ রাগ করিয়া মায়ের কাছে গিয়া বসিয়া ছিল। রাজবালা ও তাহার মা সেই ঘরে গিয়া জল-খাইতে বসিল দেখিয়া মায়া বীরেনের সন্ধানে বাহির হইয়া আসিল।

মায়া আসিয়া দেখিল বীরেন তখনও কাঁদিতেছে। মায়া মনে করিল, সে যে মারিয়া গিয়াছিল এ কান্না তাহারই জন্য। মায়া ঠোঁট ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—নিজে দোষ করে আবার কান্না হচ্ছে!

মায়া তাহাতেও বীরেনের কোনো সাড়া না পাইয়া একটু নরম হইয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া বলিল—মাসীকে খেলতে ডাকলে বলেই ত আমার রাগ হল।

তথাপি বীরেন তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল না বা কথা কহিল না দেখিয়া মায়ার অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। সে আরো নরম হইয়া বলিল—আমি আর কখনো মারব না।

বীরেন কান্না থামাইয়া মায়াকে সান্ত্বনা করিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু সে কিছুতেই কান্না রোধ করিতে পারিতেছিল না।

তখন মায়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—আমার ঘাট হয়েছে, ছুটি পায়ে পড়ি।

বীরেন মুখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া মায়ার যেই হাত ধরিল অমনি মায়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বীরেনকে ছুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গায়ে মুখ লুকাইল। বীরেন কান্নাভরা স্বরে বলিল—আমি তোমার মার খেয়ে কাঁদিনি মায়া। তুমি চুপ কর।

বীরেনের এই কথা শুনিয়া মায়ার অত্যন্ত রাগ ও লজ্জা হইল এই ভাবিয়া যে, বীরেনের এ কান্না তাহার মার খাইয়া নহে! এবং সে তবে শুধু-শুধুই বীরেনের কাছে খাটো হইল! কিন্তু সে বুঝিতে পারিতেছিল না বীরেনের কান্নার অপর কি কারণ থাকিতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মায়া খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল—মামী ঝগড়া করে গেছে বুঝি! বেশ হয়েছে, তুমি যেমন তাকে খেলতে ডেকেছিলে!

(১৩)

বীরেন ছলনা করিয়া চারদিন কলিকাতা যাওয়া স্থগিত রাখিয়াছিল যে আশায়, তাহা তাহার ভাগ্যে পূর্ণ হইবার কোনো সম্ভাবনাই রহিল না। গুণময় আগে একবারও অন্দরমহলে আসিতেন না; কাল রাজবালার আসা হইতে তিনি দিনে রাত্রে যখন-তখন অন্দরে আসিতেছেন এবং রাজবালার কাছে-কাছে থাকিতেছেন। ইহাতে বীরেন রাজবালার কাছে ঘেঁসিতে ত পাইতেছিলই না, অধিকন্তু শিকারীর ভয়ে হরিণের মত বেচারাকে সর্ব্বদা যেন কান খাড়া করিয়া রাখিয়া

এ-ঘর হইতে সে-ঘর ও সে-ঘর হইতে ও-ঘর পলাইয়া পলাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে হইতেছিল।

দয়াদেবী শয্যাগত হইয়া পড়া অবধি রাজবালার আসার আগে পর্য্যন্ত গুণময় একদিনও একটিবারও মুমূর্ষু স্ত্রীর ঘরের চৌকাঠ ডিঙান নাই, বা কাহাকেও তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করেন নাই। বীরেনই এতদিন নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে তাঁহার ঔষধ পথ্য দেওয়া ও সেবাশুশ্রূষার ভার লইয়া ছিল। এখন সে তাহার সেই পূজার মন্দিরেও স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। তাহাকে সন্ত্রস্ত ও চকিত দেখিয়া দয়াদেবী আশ্বাস্ দিয়া বলিতেছিলেন—এ ঘরে তোর ভয় কি বীরেন—উনি ত আমার ঘরে কখনো আসেন না!

এমন সময় বাহিরে গুণময়ের চটির শব্দ শোনা গেল। বীরেন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে পাশের দরজা দিয়া দৌড় দিল—আর রাজবালার পিছনে পিছনে গুণময় আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

রাজবালাও গুণময়ের নিরন্তর প্রণয়-নিবেদনের জ্বালায় বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে একলা পাইলেই তিনি তাঁহার ভাবী স্ত্রীর নিকট হইতে দাম্পত্য-প্রণয়ের বায়না আদায় করিবার জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন ও রাজবালাকে পীড়াপীড়ি করিতেন যে রাজবালা ভয়ে লজ্জায় অভিভূত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিত। গুণময়ের সাড়া পাইলেই সে এখন কোনো একজন লোকের কাছে গিয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু সে শীঘ্রই দেখিল মায়ার কাছে থাকিলে গুণময় আসিয়াই কন্যাকে সেখান থেকে চলিয়া যাইতে বলেন, সেও ভয়ে-ভয়ে সরিয়া পড়ে এবং রাজবালা যাইবার উপক্রম করিলেই তিনি পথ আগলাইয়া হাত ধরিয়া কণ্ঠস্বরে আদর গলাইয়া বলেন—'রাজু, তুমি যেয়ো না প্রাণেশ্বরী!' শুনিয়া রাজবালা লজ্জায় মরিয়া যায়। সে মোহিনীর কাছে আশ্রয় লইয়া

দেখিল, মোহিনী বাবুকে আসিতে দেখিয়া নিজেই সরিয়া পড়ে, তাহাকে যাইতে বলিতেও হয় না। রাজবালা মায়ের নিকট গেলে গুণময়কে আসিতে দেখিয়াই হয় তিনি উঠিয়া যান, রাজবালা সঙ্গ লইলে তিনি রাজবালাকে তিরস্কার করেন; নয় ত তিনি চাপা তিরস্কার করিতে-করিতে ক্রমাগত ঠেলিয়া চিমটি কাটিয়া গুণময়ের কাছে যাইতে বলেন। বীরেনের কাছে রাজবালার থাকিতে খুব ইচ্ছা হইলেও সে আর তাহাকে বড় একটা দেখিতেও পায় না; সে বুঝিতে পারিতেছিল যে বীরেনও গুণময়েরই ভয়ে পলাইয়া পলাইয়া লুকাইয়া ফিরিতেছে, সুতরাং তাহার কাছে আশ্রয় পাওয়ার তাহার আশা নাই। সে এই দুদিন লক্ষ্য করিতেছিল গুণময় দয়াদেবীর মহলের দিকে যান না; তাহাকে বিবাহ করিবার মতলব দয়াদেবীর নিকটে গোপন রাখিবার পরামর্শও সে শুনিয়াছে; অতএব দয়াদেবীর ঘরে আশ্রয় লইলে সে নিরুপদ্রব হইতে পারিবে বলিয়া তাহার আশা হইতে লাগিল—যদি বা গুণময় সেখানেও তাহাকে অনুসরণ করেন তবু দয়াদেবীর সাক্ষাতে তাহার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে তিনি পারিবেন না। কিন্তু দয়াদেবীর কাছে যাইতে তাহার কেমন সঙ্কোচ লজ্জা ও ভয় হইতেছিল—তাঁহার বিরুদ্ধে যে হৃদয়হীন কঠোর ষড়যন্ত্র তাঁহার স্বামী ও মাসীতে মিলিয়া করিয়াছেন তাহার প্রধান উপলক্ষ ত সেই। সে কোন্ মুখে তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতে যাইবে? সে চারিদিকে নিরুপায় দেখিয়া মায়ের কাছে কাঁদিয়া জেদ করিয়া বলিল—মা, তুমি বাড়ী চল, আমি এখানে থাকব না।

তাহার মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তুই এমন হুড়কো হচ্ছিস্ কেন বল্ ত রাজু? কত জন্ম তপিস্তে করে লোকে তবে রাজরাণী হতে পায়! লক্ষ্মী এসে তোকে সাধছেন, তুই ছেলেমানুষী করে হেলায় হারাতে বসেছিস! এমন করলে জামাইএর টান কদিন থাকবে?

রাজবালা ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল—মা, আমি ওকে বিয়ে করতে পারব না, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ো না।

তাহার মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—ফের এমন কথা মুখে আনবি ত তোকে এইখানে একলা ফেলে রেখে আমি বাড়ী চলে যাব; না হয় হলই এ কাত্তিক মাস, কালই তোর বিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তি হব।

এমন সময় আবার গুণময় প্রলয়কালের জলধরের ন্যায় দূরে উদিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রাজবালা সেখান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিল। তাহাকে পলাইতে দেখিয়া গুণময়ও দ্রুত চলিবার চেষ্টায় হাতীর মতন থপথপ করিতে-করিতে তাহার পিছনে-পিছনে এ-ঘর সে-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন আর হাঁপাইতে-হাঁপাইতে ডাকিতে লাগিলেন—রাজু ও রাজু! একবার ধরা দাও প্রাণেশ্বরী!

রাজবালা পরিত্রাণের কোনো উপায় না দেখিয়া দয়াদেবীর ঘরে গিয়া ঢুকিল; বীরেন পলায়ন করিল; গুণময়ও আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন; দয়াদেবী একবার স্বামীর শ্রমকাতর গলদ্‌ঘর্ম্ম মূর্ত্তির দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রাজবালা তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহার দুই পা কোলে করিয়া বসিল; গুণময়ও খাটের একধারে রাজবালার একেবারে গা ঘেঁসিয়া বসিয়া হাপরের মতন হাঁপাইতে লাগিলেন।

একটু দম লইয়া গুণময় রাজবালার পিঠে থাবা রাখিয়া চাপা গলায় খুব আস্তে আদর করিয়া ডাকিলেন—এখান থেকে চলে এস রাজু!

রাজবালা পিঠ মুড়িয়া সরিয়া বসিয়া পিঠ হইতে গুণময়ের হাত সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; গুণময় মরণাপন্ন স্ত্রীর পায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রাজবালাকে ক্রমাগত টানিতে লাগিলেন।

মাত্র গতকল্য এই পদসেবার উপলক্ষে রাজবালা বীরেন্দ্রের সহিত যে

প্রীতির খেলা খেলিয়াছে তাহা টের পাইয়া দয়াদেবী দুঃখিত হইয়াছিলেন, বিরক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল যে বীরেন্দ্রের সহিত মায়ার বিবাহ দিবেন; স্বামী অমত করিয়া মায়ার পাত্র খুঁজিতে ঘটক লাগাইয়াছেন বটে, কিন্তু মুমূর্ষু স্ত্রীর এই শেষ অনুরোধ তিনি ঠেলিতে পারিবেন না বলিয়া দয়াদেবীর বিশ্বাস ছিল; মায়া একটু জেদী হিংসুটে হইলেও সে বীরেন্দ্রকে ভালো যে বাসিত তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল; বীরেন্দ্রও মায়াকে স্নেহ করে, কিন্তু তাহার প্রণয়ে ব্যাকুলতার পরিচয় সে দ্যায় নাই, মায়ার সে বয়স হয় নাই বলিয়াই; সুতরাং ইহাদের বিবাহ উভয়েরই সুখের হইবারই সম্ভাবনা ছিল। তাই যখন তিনি অনুভব করিলেন যে রাজবালাকে দেখিয়াই বীরেন্দ্রের মন রাজবালার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে কলিকাতা যাওয়া স্থগিত রাখিবার জন্য তাঁহার কাছে মিথ্যা ছলনা পর্য্যন্ত করিয়াছে, তখন তিনি বীরেন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত হইবে না মনে স্থির করিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ আবার সেই রাজবালা তাঁহার স্বামীকে প্রলুব্ধ করিতেছে অনুমান করিয়া তিনি রাজবালার উপর ত বিরক্ত হইলেনই, স্বামীর আচরণ দেখিয়াও আশ্চর্য্য ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন—ইহারা এমন বেহায়া নির্লজ্জ যে মরণকেও সম্মান করিতে ইহারা জানে না!

দয়াদেবী অশুচি স্পর্শের ন্যায় রাজবালার স্পর্শ পরিহার করিয়া আপনার পা সরাইয়া লইলেন। রাজবালা অমনি আরো সরিয়া দয়াদেবীর কোলের কাছে গিয়া বসিল। গুণময় স্ত্রীর গায়ের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া রাজবালাকে ধরিতে যাইতেছিলেন, রাজবালা হঠাৎ সরিয়া যাওয়াতে হুমড়ি খাইয়া দয়াদেবীর গায়ের উপর পড়িয়া গেলেন। দয়াদেবী অমনি মুখ ফিরাইয়া স্বামীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন; সে

দৃষ্টির কাছে গুণময় সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া আসিলেন। এমন সময় সেই ঘরে মায়া ও মোহিনী আসিয়া গুণময়কে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। গুণময় রাগে গসগস করিতে-করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

(১৪)

গুণময় চলিয়া গেলে রাজবালা সরিয়া আসিয়া আবার দয়াদেবীর পায়ের দিকে বসিল; তথাপি দয়াদেবী পা ছড়াইলেন না। রাজবালা তাঁহার পায়ে হাত দিতেই তিনি পা আরো সরাইয়া লইলেন। রাজবালা বলিল—"দিদি, পা ছড়াও।" দয়াদেবী তবু পা ছড়াইলেন না, কোনো কথাও বলিলেন না।

মোহিনী বলিল—মাসিমা, মায়ের ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, ওষুধটা ঢেলে দাও না। আর একটু বেদানার রস দাও।

দয়াদেবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—থাক্ মোহিনী, যাকে-তাকে আমার ওষুধ কি খাবার জিনিস ছুঁতে দিসনে বলছি! আমাকে কি তোরা বাঁচতে দিবিনে মনে করেছিস! তোরা দিতে না পারিস আমার ওষুধ পত্তির দরকার নেই!

মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া রাজবালার দিকে চাহিল। রাজবালা লজ্জায় দুঃখে লাল হইয়া উঠিয়া ভাবিতেছিল—দিদি নিশ্চয় সমস্ত টের পেয়েছেন—বীরেন বলে দিয়েছে। সে ত জানে, এ বিয়ে করতে তার ইচ্ছে নেই, তবে সে-কথাটুকু সে দিদিকে বলেনি কেন? দিদি কি সে-কথা জেনেও আমার ওপর রাগ করছেন?

রাজবালার ইচ্ছা হইতেছিল দিদির পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলে, কিন্তু তাহার লজ্জায় বাধিতেছিল। সে এমন অবস্থায়

অপরাধিনীর মতো কুণ্ঠিত হইয়া সেখানে বসিয়াও থাকিতে পারিতেছিল না, আবার ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাবার ও গুণময়ের কবলে পড়িবার ভয়ে উঠিয়াও যাইতে পারিতেছিল না।

বীরেন্দ্র পাশের ঘরে লুকাইয়া থাকিয়া সমস্ত দেখিয়াছিল শুনিয়াছিল। সে দয়াদেবীর কথা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি ঘরে আসিল এবং মা যেমন করিয়া শিশুকে যত্ন করে তেমনি ভাবে দয়াদেবীকে ঔষধ ও পথ্য দিল। দয়াদেবী স্নেহের অনুযোগ করিয়া বলিলেন—তুই কোথায় থাকিস বীরু, যে-সে আসে আমায় ওষুধ পত্তি দিতে!

বীরেনের মনে হইল বলে—ও ত তোমারই বোন্ মা।—কিন্তু সে দেখিল রাজবালার চোখ ছলছল করিতেছে; তাহার কথা বলিলে পাছে দয়াদেবী বিরক্ত হইয়া আরো কিছু বলিয়া নিরপরাধ রাজবালার মনে ব্যথা দ্যান সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বলিল—ঐ পাশের ঘরেই ছিলাম মা, এই এলাম তোমায় ওষুধ দিতে।......মায়া আয় মার কাছে বোস।

বীরেন-দা আজ মাসিমার সঙ্গে কথা কহিতেছে না, মাসিমাকে মা বকিয়াছে, বীরেন-দা তাহাকে ডাকিল, ইহাতে খুব খুসী হইয়া মায়া তাড়াতাড়ি বীরেনের গা ঘেঁসিয়া মায়ের কাছে বসিয়া আড়ে আড়ে রাজবালাকে দেখিতে লাগিল।

বীরেন মায়াকে দয়াদেবীর কাছে বসাইয়া রাজবালাকে তাহার সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একটু ইতস্তত করিয়া রাজবালা একবার মায়ার দিকে চাহিল, দেখিল মায়া কট্‌মট্‌ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে; একবার দয়াদেবীর দিকে চাহিল, দয়াদেবী চোখ বুজিয়া আছেন। উঠিতে ইচ্ছা হইলেও সে উঠিতে পারিতেছিল না।

ক্ষণেক পরে দয়াদেবী বলিয়া উঠিলেন—মায়া, আমি পা ছড়াব, ওকে সরে যেতে বল্।

মায়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার দায় পড়েছে!

অপমানের আঘাতে ব্যথিত ও লজ্জায় লাল হইয়া রাজবালা আস্তে আস্তে পায়ের মল উঁচুতে গুঁজিয়া খাট হইতে নামিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(১৫)

বাহিরে বীরেন্দ্র অপেক্ষা করিতেছিল। রাজবালা বাহিরে আসিতেই বীরেন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তেতালার ছাদে সিঁড়ির ঘরে গেল। বীরেন মনে করিয়াছিল সেখানে গুণময় কিছুতেই তাহাদের সন্ধান পাইবে না।

বীরেন রাজবালার হাত ধরিয়া মিনতির সহিত বলিল—আজ ভোরে আমি চলে যাব। আর বোধহয় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। যাবার আগে তোমার কাছে আমার কিছু প্রার্থনা জানাবার আছে।......

রাজবালার শুভ্র রঙে লজ্জার আভা লাগিয়া দুধে-আলতার রং হইল, গোলাপের পাপড়ির মতন পাতলা ঠোঁট দুখানিতে রক্তের ছোপ গভীর হইল, শুক্তির কৌটার ন্যায় মসৃণ ও উজ্জ্বল গাল দুটিতে নীল নীল শিরাগুলিতে রক্তের নদী চঞ্চল হইয়া উঠিতে দেখা গেল।

বীরেন্দ্র বলিতে লাগিল—আমি চলে যাচ্ছি; মাকে দেখবার কেউ থাকল না, মায়ের সেবার ভার তোমাকে নিতে হবে; মা তোমাকে

বুঝতে না পেরে যে কটু কথা বলছেন, রূঢ় ব্যবহার করছেন তা তোমাকে সহ্য করে থাকতে হবে।······আর একটা কথা বলব ?

রাজবালা টানা-টানা সুন্দর চোখ দুটি তুলিয়া বীরেনের দিকে চাহিল। বীরেন আবার জিজ্ঞাসা করিল—বলব ?

রাজবালা লজ্জিত দৃষ্টি করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—বলো।

বীরেন বলিতে লাগিল—এখনও তোমার অমত আছে জেনেই বল্‌তে সাহস কর্‌ছি, নইলে বল্‌তে পারতাম না হয়ত। হাতীকান্দার রায়-বাবুর স্ত্রী হওয়ার প্রলোভন বড় বেশী; এমন গুণময় লোকটিকে তোমার খারাপ লাগছে বলে তুমি তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছ না, কিন্তু এই অগাধ ঐশ্বর্য্যের আর বিপুল সম্মানের লোভ লোকটার ওপর বিরাগ একেবারে চাপা দিয়ে ফেলতে পারে। আমার অনুরোধ, তুমি আমার মায়ের, তোমার দিদির, দয়াদেবীর সতিন হয়ো না; তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না, তাঁর মৃত্যুর পর তোমার ইচ্ছা হয় তুমি গুণময়কে বিয়ে করো। ঐ গুণময় তোমার দিদিকে বধ করেছে—যেদিন ওঁকে বিয়ে করে নিয়ে বাড়ীতে ঢুকল সেই দিনই বড়রাণী গলায় ক্ষুর দিয়ে মরলেন, সেই দেখে তাঁর যে বুকে ব্যথা লাগল আর সারল না; তার পর আমার মাকে গলায় দড়ি দিয়ে গুণময় যখন মারলে তখন তাঁকে দেখে দয়াদেবী যে শয্যা নিয়েছেন এ থেকে আর উঠবেন না; তাঁর মরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে গুণময় এখন চেষ্টা করছে তোমাকে বিয়ে করে মুমূর্ষু স্ত্রীকে চট্‌ করে মেরে ফেলতে!······

রাজবালা অবাক হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বীরেনের কথা শুনিতেছিল এবং সমস্ত ঘটনা বুঝিতে না পারিলেও গুণময়ের নিষ্ঠুরতার জন্যে তাহার উপর ঘৃণা ও ভয় তাহার অন্তর ভরিয়া তুলিতেছিল। রাজবালা জিজ্ঞাসা করিল—তোমার মা কেন গলায় দড়ি দিয়েছিলেন ?

—সে ঐ গুণময়ের জন্য।—বলিয়া বীরেন আপনাদের দুঃখের কাহিনী ও দয়াদেবীর মহত্ত্ব বর্ণনা করিতে লাগিল। বলিতে বলিতে বীরেনের চোখ দিয়ে প্রবল ধারায় জল পড়িতে লাগিল, রাজবালাও সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া বীরেনের চেয়েও ফুলিয়া-ফুলিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতেছিল। বীরেন মায়ের মৃত্যুর পর একদিনও কাঁদিতে পায় নাই; সে কাঁদিলেই দয়াদেবীর পীড়া বৃদ্ধি হইবে বলিয়া সে দয়াদেবীর সামনে কাঁদিতে পারে নাই, দয়াদেবী সর্ব্বদা তাহাকে কাছে-কাছে রাখিতেন বলিয়া সে নির্জ্জনে কাঁদিবার অবকাশ পাইত না; আজ সে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া বাঁচিতেছে, আর-একজন তাহার জন্য মমতায় তাহার সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদিতেছে এই আনন্দে এই সান্ত্বনায় আজ আর তাহার অশ্রুধারা নিরোধ মানিতে চাহিতেছিল না।

রাজবালা যখন দয়াদেবীর ঘর হইতে বীরেনের আহ্বানে উঠিয়া আসে তখন হিংসায় জ্বলিতে-জ্বলিতে মায়াও উঠিয়া আসিয়া লুকাইয়া থাকিয়া দেখিল উহারা কোথায় গেল। তারপর আস্তে আস্তে পা টিপিয়া-টিপিয়া সিঁড়ি বাহিয়া ছাদে উঠিয়া আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া বীরেন ও রাজবালকে দেখিতে লাগিল। বীরেন ও রাজবালা কাঁদিতেছে দেখিয়া মায়া আবার পা টিপিয়া-টিপিয়া নামিয়া গেল।

গুণময় দয়াদেবীর ঘর হইতে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াও রাগ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, আবার রাজবালার সঙ্গলাভের লোভে দয়াদেবীর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। দয়াদেবী একবার উৎসুক নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিলেন। গুণময় তাঁহার দিকে না তাকাইয়াই মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মোহিনী, এরা······রাজুরা কোথায়?

দয়াদেবী ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। মোহিনী থতমত খাইয়া বলিতে যাইতেছিল—দাদা······

দয়াদেবী পা দিয়া মোহিনীর গা টিপিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিলে
মোহিনী সামলাইয়া লইয়া বলিল—দিদিমণি আর মাসিমা ত ঐদিকে গে

গুণময় রাজবালার সন্ধানে বাহির হইয়া রাজবালার মায়ের কা
গেলেন।

রাজবালার মা তখন আঁচল পাতিয়া একটু গড়াইতেছিলেন—এখা
আসিয়া অবধি তাঁহার কাজ হইয়াছে খাওয়া গড়ানো আর রাজবালাকে
জপানো। জামাইএর জুতার শব্দ পাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসি
মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলেন।

গুণময় জিজ্ঞাসা করিলেন—মাসিমা, রাজু কৈ?

—তোমার সঙ্গে-সঙ্গেই ত দয়ার ঘরের দিকে গেল বাবা।

—সেখান থেকে চলে এসেছে।

—ভালো এক হুড়কো পালানে মেয়ে হয়েছে! তুমি বাবা নবদ্বীপে
পণ্ডিতদের কিছু বেশী করে দক্ষিণে দিয়ে কার্ত্তিকমাসে বিয়ের বিধেন নি
শিগ্‌গির দুহাত এক করে ফেলো।......

এমন সময়ে ছাদের সিঁড়ি হইতে নামিয়া মায়া বাবাকে দেখিয়া
থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া গুণময় জিজ্ঞাসা করিলেন—মায়া,
রাজু কোথায় রে?

মায়া ঢোক গিলিয়া বলিল—মা মাসীকে বকেছে, তাই বীরেন-দার
কাছে কাঁদছে।

গুণময় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—বীরেন!

মায়া চোখ পাকাইয়া একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—হ্যাঁ বাবা, তুমি
বীরেন-দাকে কলকাতা যেতে বলেছিলে, ও যায়নি, লুকিয়ে আছে।

গুণময় ক্রুদ্ধ হইয়া গণ্ডারের ন্যায় চোখ দুটা ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—
যায়নি! কোথায় সে হতভাগা!

মায়া একবার পিছনের সিঁড়ির দিকে তাকাইয়া চুপিচুপি বলিল—ওপরে চিলের ঘরে!

রাজবালার মা অমনি বলিয়া উঠিলেন—তাইতো পোড়াকপালী এমন করে ফরকে ফরকে মরছে! আমি তাইত ভাবি, আমার অমন সোনার রাজু মন্দ লোকের কুপরামর্শ না পেলে কি অমনি বিগড়োয়!

গুণময় ক্রোধে অধীর হইয়া চটিজুতার চটপটানিতে বাড়ী কাঁপাইয়া বীরেনকে শাস্তি দিতে ছুটিতেছিলেন। মায়া তাড়াতাড়ি বলিল—চুপিচুপি চল বাবা, সাড়া পেলে বার-বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে নেবে পালাবে!

গুণময় চটিজুতা খুলিয়া খালি পায়ে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন; সেই মোটা মোটা থামের মতন পায়ের দাপে মেদিনী কম্পমান। বীরেন ও রাজবালা কাঁদিতেছিল বলিয়া সে পায়ের শব্দ লক্ষ্য করিল না।

গুণময় পা টিপিয়া-টিপিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া একেবারে বীরেনের কান বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—পাজি হতভাগা, যার খাবি তারই সর্ব্বনাশ করবি! বেরো আমার বাড়ী থেকে।

বীরেন অকস্মাৎ-আক্রমণে বিমূঢ় হইয়া চোখ হইতে হাত সরাইয়া যেমন মুখ তুলিল অমনি গুণময় তাহার গালে বিরাশি সিক্কার ওজনের এক চড় মারিয়া কান ধরিয়া ক্রমাগত নাড়া দিতে দিতে দুপাটি বাঁধানো দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ঠকঠক শব্দ করিতে করিতে গর্জ্জিতে লাগিলেন—ঠাকুরের ভোগে কুকুরের দৃষ্টি! ঠাকুরের ভোগে কুকুরের দৃষ্টি!

মায়া বীরেনকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছিল; সেই বীরেন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া অপরকে বেশী ভালবাসিতেছে বলিয়া মায়া হিংসার তাড়নায় বাপের কাছে গিয়া বীরেনের নামে নালিশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারই চোখের সামনে বীরেনকে লাঞ্ছিত পীড়িত অপমানিত দেখিয়া মায়া কাঁদিতে-কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার বাবার হাত ধরিয়া টানিতে-

টানিতে বলিতে লাগিল—ও বাবা বীরেন-দাকে মেরো না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি বীরেন-দাকে মেরো না।

বীরেন মাথার এক ঝটকায় গুণময়ের হাত হইতে কান ছাড়াইয়া লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার গায়ে হাত তোলাতে, এই মেয়ে-দুটির সামনে তাকে অভদ্র অপমান করাতে, তাহার মাতৃবধের সন্থ-বর্ণনায় উদ্দীপ্ত শোক দারুণ প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিল; তাহার উন্মত্ত রক্তধারায় খুনের গাজন নাচিয়া উঠিল। তাহার সুন্দর কমনীয় কৃশতনু ঋজু হইয়া উঠিল, গৌর বর্ণ আরক্ত হইল, নিটোল ললাটে ও মসৃণ কণ্ঠে শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, তাহার ভাসা-ভাসা উজ্জ্বল চোখ দুটি ধারালো ছুরীর ধারের মতন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে শান্ত হইয়া দৃষ্টি নত করিল—তাহার মনে পড়িয়া গেল গুণময় তাহার মাতা দয়াদেবীর স্বামী, তাঁহার গায়ে হাত তুলিলে দয়াদেবীর মনে বাজিবে। বীরেন সেখান হইতে একছুটে দয়াদেবীর ঘরে গিয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে যাইবার সময় শুনিতে পাইল রাজবালার মা চেঁচাইতেছেন—বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সাধ! আগে সাত জন্ম তপিস্তে কর, তবে ত রাজুর মতন বৌ ভাগ্যে জুটবে।

এই দুদিন আগে রাজবালার মায়ের কাছে বীরেন দিব্যি সুপাত্র ছেলেটি ছিল, আজ খুনী ডাকাত গুণময়ের তুলনায় সে অপাত্র হইয়া পড়িয়াছে।

বীরেন চলিয়া গেলে গুণময় আদর করিয়া রাজবালাকে বলিলেন—রাজু, তুমি আজ বাদে কাল রাজরাণী হবে, ঐসব ছোটলোকদের সঙ্গে এত মাথামাথি কি তোমার সাজে! এস তুমি আমার সঙ্গে। চল, চার-ঘোড়ার গাড়ী করে বেড়াতে যাবে?

গুণময়ের প্রতি বিরাগ রাজবালার চরমে উঠিয়াছিল। বীরেনের

উপর কি নৃশংস অত্যাচার এই গুণময় করিয়া আসিতেছে তাহা সে এইমাত্র বীরেনের মুখ হইতে শুনিয়াছে; এখন তাহার চোখের সামনে বীরেন যে লাঞ্ছনা ভোগ করিল তাহা তাহারই জন্য—ভয়ের কারণ সত্ত্বেও বীরেন যে কলিকাতা না গিয়া এই বাড়ীতে লুকাইয়া ছিল সে ত তাহাকেই দেখিবার লোভে। অতবড় ছেলে বীরেনকে যে-লোক মারিতে দ্বিধা বোধ করিল না সেই অমানুষ আসিয়াছে তাহাকে প্রণয় দেখাইতে! সেই প্রণয়-পাগল ভয়ানক লোকটা তাহার স্ত্রীকে যে কত ভালবাসে কেমন যত্ন করে তাহাও ত সে বীরেনের কাছে এই মাত্র শুনিল, স্বচক্ষেও ত দেখিতেছে। তাহাকে স্বামী বলিয়া বরণ করিবে কিসের লোভে? ঐশ্বর্য্য? ধিক্! এই অট্টালিকায় বিলাস-আড়ম্বরের ভিতর নিষ্ঠুর জমিদারের শত বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে একটা হইয়া থাকার চেয়ে নিরাশ্রয় বীরেন্দ্রের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়ানো ঢের গৌরবের ঢের আনন্দের ঢের কল্যাণের।

রাজবালা লঘুক্ষিপ্র পদে গুণময়কে এড়াইয়া নীচে নামিয়া গিয়া একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া দরজায় খিল লাগাইয়া মেঝেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল—সে ভাবিয়া পাইতেছিল না, তাহার পরিত্রাণের উপায় কি, তাহার গতিই বা কি হইবে?

(১৬)

চিলের ছাদের ঘর হইতে সবাই চলিয়া আসিল; মায়া কিন্তু নড়িতে পারিতেছিল না। একলাটি সেই প্রকাণ্ড ছাদে ভূতের ঘরে থাকিতে মায়ার অত্যন্ত ভয় হইতেছিল, কিন্তু সে নীচে নামিতেও পারিতেছিল না—সে যে অন্যায় অপকর্ম্ম করিয়াছে, ইহার পর সে

মায়া কান্নার মধ্যে বলিয়া উঠিল—আমি আর কক্‌খনো এমন কাজ করব না বীরেন-দা, তুমি আমাকে বিয়ে কোরো।

মায়ার এই কথায় দয়াদেবী ও বীরেনের কান্না যেন উথলিয়া উঠিল। বীরেন দুইহাতে মায়াকে জড়াইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

দয়াদেবী অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া একটু শান্ত হইয়া বলিলেন —বীরেন, আমার লোহার সিন্দুকে একবাক্স গহনা আছে, সে তোর বৌকে দেবো বলে মানত করে তুলে রেখেছি ; তুই সেই বাক্সটা নিয়ে আয়, কলকাতার ব্যাঙ্কে সেফ-ডিপজিট করে রেখে দিস……

—মা, আমি বিয়ে করব না। বিয়ের আশা আমার ঘুচে গেছে। ও গহনা আমি মায়াকে দিলাম।

মায়া উৎফুল্ল হইয়া বীরেনের গলা ধরিয়া বলিল—আমি তোমার বৌ বীরেন-দা, তাইতে আমাকে দিলে ?

বীরেন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—না ভাই, তুমি আমার বোন বলে তোমাকে দিলাম।

দয়াদেবী জেদ করিয়া বলিলেন—না বাবা, সে কি কথা ! ওকালতি পাশ করে তুই রোজগার করবি, সংসারী হবি। তোর যে-সংসার আমরা ভেঙেছি সেই সংসারের লক্ষ্মীকে আমার গায়ের গয়না দিয়ে সাজাব এই যে আমার মানত ছিল !

বীরেনও জোরের সঙ্গে বলিল—ওকালতি এবার পাশ করবই মা, কিন্তু রোজগার করে সংসারী হবার জন্যে নয়। নিজে ভুগে দেখেছি, গরিব দুঃখী—যার ওপর প্রবলের অত্যাচার হচ্ছে—তার হয়ে লড়বার লোক উকিলদের মধ্যে নেই, তারা সবাই শুধু চেনে টাকা। আমি যেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ব্রত নিতে পারি—এই আশীর্বাদ আমায় করো মা, আমায় স্বার্থপর হতে বলো না।

বীরেন দয়াদেবীর পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। দয়াদেবী হাত বাড়াইলেন, বীরেন নিকটে সরিয়া গেল, দয়াদেবী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তারপর বলিলেন—তবে আর-একটা কথা তোকে রাখতে হবে বাবা। আমি কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছি, তা তোকে নিতে হবে।

বীরেন একটু ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা দাও মা, আমার চেয়েও গরিবদের সেবায় লাগবে।

(১৭)

রাত থাকিতে উঠিয়া বীরেন দয়াদেবীর কাছে বিদায় লইয়া চোখের জল মুছিতে-মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল অন্ধকারে রাজবালা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া বীরেন জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এখানে কি করছ?

রাজবালা অতি মৃদু স্বরে বলিল—তুমি যে যাচ্ছ।

বীরেনের সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে আর কোনো কথা বলিতে পারিল না।

রাজবালা আবার বলিল—কবে ফিরবে?

রাজবালার স্বর বড় কম্পিত, বড় আর্দ্র।

বীরেন আবেগ সম্বরণ করিয়া কঠিন হইয়া বলিল—এই আমার অগস্ত্যযাত্রা, তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না।

রাজবালা ইতস্তত করিতে-করিতে বলিল—আমায় বলে যাও আমি কি করব?

—আমার মা রইলেন, তাঁর সেবা কোরো; আর পারো ত তাঁর সতীন হয়ো না। আমার কথা ভুলে যেয়ো।

বীরেন তাহাকে ভুলিতে অনুরোধ করিয়াই ভুলিতে বারণ করিল। রাজবালা আঁচল দিয়া চোখ ঢাকিল। বীরেনও চোখের জল মুছিতে-মুছিতে চলিয়া গেল।

রাজবালা সেই ভোরে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া তীর্থ-স্নাতা তপস্বিনী যে ভাবে দেবতার মন্দিরে যায় সেই ভাবে দয়াদেবীর ঘরে গেল। দয়াদেবী তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—এ যেন মূর্ত্তিমতী ব্যথা।

রাজবালা জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, এখন কি মুখ ধোবে?

আজ আর দয়াদেবী বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন—মোহিনী আসুক।

—মোহিনী এখনো ঘুমুচ্ছে।—বলিয়া রাজবালা উঁচু টুল আনিয়া খাটের পাশে রাখিল এবং তাহার উপর রুপার একখানি ছোট রেকাবিতে করিয়া মাজন রুপার জিভ-ছোলা, রুপার ডাবর ও এক ঘটি জল সাজাইয়া রাখিল; তারপর দয়াদেবীকে ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিয়া বসাইয়া তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল।

দয়াদেবীকে মুখ ধোয়াইয়া ঔষধ খাওয়াইল। তারপর ষ্টোভ জ্বালিয়া মেলিন্স ফুড তৈরি করিবার জন্য জল গরম করিতে দিয়া মোহিনীকে দুধ জ্বাল দিয়া আনিতে বলিতে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই রাজবালা ফিরিয়া আসিল, তাহার পিছনে-পিছনে আসিলেন গুণময়। গুণময় বলিলেন—তুমি এখানে কি করবে রাজু, তুমি আমার সঙ্গে ছাতে একটু বেড়াবে এস।

রাজবালা ভয়ে অভিভূত হইয়া খাটের ওপারে দয়াদেবীর কোল ঘেঁসিয়া গিয়া বসিল। গুণময় দমিবার পাত্র নন, তিনিও খাটের উপর

উঠিয়া বসিয়া ঝুঁকিয়া রাজবালার হাত ধরিয়া বলিলেন—রাজু, তোমার হাতখানি কি নরম !

রাজবালা হাত ছাড়াইয়া লইয়া পিছন ফিরিয়া বসিল। গুণময় তাহার দীর্ঘ ঘন চুলের গোছা হাতে তুলিয়া বলিলেন—এই সকাল বেলা তুমি চান করেছ রাজু ! কী সুন্দর চুল তোমার ! তোমার সব ভালো রাজু !

রাজবালা উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গুণময়ও পিছু-পিছু চলিলেন। রাজবালা ক্ষিপ্র পদে এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া গুণময়কে সাত পাক খাওয়াইয়া নাকাল করিয়া দিয়া লুকাইয়া আবার দয়াদেবীর ঘরে চলিয়া আসিল। তাহার মুখ কৌতুকের হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রাজবালার সেই হাসি প্রণয়লীলার দীপ্তি বলিয়া ভুল বুঝিয়া দয়াদেবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—বাড়ীতে ঘরের ত অভাব নেই রাজু, তুমি আমার এই ঘরটিতে এসো না ; আমি তোমার হাতে ধরে ভিক্ষে চাচ্ছি, আমায় একটু নিরুপদ্রবে মরতে দাও। এ ঘরও খালি হতে আর বেশী দেরী হবে না।

রাজবালা বিস্ময়ে ভয়ে দুঃখে অভিভূত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে দেখিয়া দয়াদেবীর কোমল মন ভিজিয়া উঠিল, তিনি নরম স্বরে বলিয়া উঠিলেন—রাজু, তুই কাঁদছিস কেন ?

এই মমতার স্পর্শ পাইয়া রাজবালার চোখ দিয়া অশ্রুধারা বেগে বহিতে লাগিল, সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—দিদি, তুমি আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও……

—তোর অঘ্রাণ মাসে বিয়ে হবে শুনছি, এখন বাড়ী যাবি কি ?

—তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদি, তুমি আমাকে বাঁচাও, আমি জামাই-দাদাকে বিয়ে করতে কিছুতেই পারব না।

দয়াদেবী অতিমাত্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—জামাই-দাদাকে বিয়ে করবি কে বলছে ?

রাজবালা আবেগের ঝোঁকে তাহার মা ও ভগ্নীপতির গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁশ করিয়া ফেলিয়া কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

দয়াদেবী উৎসুক হইয়া বলিলেন—বল্ রাজু, ও কথা কে বললে ?

রাজবালা মাকে বাঁচাইবার জন্য ঘুরাইয়া বলিল—জামাই-দাদা মাকে বলছিলেন।

—মাসিমারও মত হয়েছে ?

রাজবালা চুপ করিয়া রহিল।

দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমার মরারও সবুর সইছে না !······রাজু, আমার কাছে আয়।

রাজবালা কাছে গিয়া দাঁড়াইলে দয়াদেবী তাহার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন—রাজু, তুই আমার ছোট বোন, তোর হাতে ধরে ভিক্ষা চাইছি, আমি যে ক'টা দিন আছি আমার সোয়ামীকে আমারই থাকতে দিস।

রাজবালা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আমি ওকে কক্‌খনো বিয়ে করব না, কক্‌খনো বিয়ে করব না।

হাঁপাইতে-হাঁপাইতে গুণময় আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। রাজবালার দিকে চাহিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন—রাজু, এই ত খুঁজে বার করেছি ! এইবার তুমি আঁধি—তুমি খুঁজবে, আমি লুকোবো, এসো······

দয়াদেবী দৃষ্টি নত করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন—তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষে আছে।

চমকিয়া উঠিয়া গুণময় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—অ্যাঁ ! আমায় বলছ ?

—হ্যাঁ। আমার মরতে আর বিলম্ব নেই—আমার কোনো কথা কখনো তুমি শোনোনি; এই শেষ অনুরোধটি তোমায় রাখতে হবে।

—কি ?

—আমি মরার আগে তুমি বিয়ে কোরো না।

গুণময় ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—আমি বিয়ে করব তোমায় কে বললে ? রাজু বুঝি ? বলেছে ভালোই করেছে। তুমি ত মরতে বসেছ, বিয়ে না করলে আমার সংসার-ধর্ম্ম বজায় থাকে কেমন করে ?

দয়াদেবী ব্যথিত হইয়া বলিলেন—বিয়ে কোরো। কিন্তু আমি যে কটা দিন বেঁচে আছি……

গুণময় বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—তোমার মরবার ত কোনো গা দেখছিনে। তুমি যদি এখন কিছুকাল না মরো !

দয়াদেবীর চোখে জল আসিতেছিল, তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া কঠিন হইয়া রহিলেন।

স্ত্রীর কাছে গোপনতার যেটুকু সঙ্কোচ ছিল সেটুকুও ঘুচিয়া যাওয়াতে গুণময় স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন—রাজু, এসো আমরা খেলা করিগে, রুগী আগলে বসে থাকা কি তোমার সাজে !

রাজবালার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল, এ লোকটা মানব না দানব !

মোহিনী দুধ জ্বাল দিয়া আনিল। রাজবালা দয়াদেবীর খাবার তৈরি করিতে বসিল, গুণময়ের দিকে লক্ষ্যও করিল না।

চতুর খানসামা আসিয়া খবর দিল বিলাসপুরের জমিদার রসময় বাবু বিবাহের জন্য স্বয়ং মায়াকে দেখিতে আসিয়াছেন।

গুণময় বলিলেন—মোহিনী, মায়াকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে বৈঠক-খানায় নিয়ে আয়।

গুণময় চলিয়া গেলেন।

মায়া ঘুম হইতে জাগিয়া বাবার ভয়ে চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া

ছিল, গুণময় বাহির হইয়া যাইতেই মায়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—মা, আমি বীরেন-দাদাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মুছিলেন।

(১৮)

বিলাসপুরের জমিদার রসময় রায়ের দুই সংসার বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় এবং পত্নীদিগের বয়স পঞ্চাশের কোটায় পৌঁছাতে তাঁহাদিগের আর পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা না থাকায় তিনি বংশ রক্ষার ও পিতৃ-পুরুষের পিণ্ড প্রাপ্তির জন্য বাধ্য হইয়া তৃতীয় বিবাহ করিবেন। দশ বৎসরের মায়াকে দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইয়াছে, এবং গুণময়ও তাঁহাকে কন্যাদানে স্বীকৃত হইয়াছেন। বিলাসপুরের জমিদারের সঙ্গে সীমানা লইয়া গুণময়ের প্রায়ই দাঙ্গা খুন জখম হইয়া থাকে, দুই পক্ষেরই ইচ্ছা তাহা এইরূপে আপোষে মিটিয়া যায়। রসময় রায় শ্বশুরের সমস্ত বিষয়ই একদিন পাইবেন এই আশায় গুণময় তাঁহার সীমানা যতখানি চাপিয়া দখল করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকেই ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন, এবং গুণময় বিনা দাঙ্গাহাঙ্গামা বা মামলা-মোকদ্দমায় অনেকখানি জমি পাইয়া যাইবেন বলিয়া তেজবরে বুড়োকে শিশু কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। অঘ্রাণ মাসে অকাল; পৌষ মাসে বিবাহ হইবার নয়; মাঘ মাসে মলমাস; অতএব স্থির হইল এই ফাল্গুন মাসে তাঁহার নিজের ও কন্যার উভয়েরই শুভবিবাহ হইবে!

গুণময়ের মুখে হাসি আর ধরে না, তাঁহার দুপাটি বাঁধানো দাঁত ক্ষণে ক্ষণে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। যদিও অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ না

হওয়াতে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া ছিলেন, তথাপি সেই দুঃখের মধ্যেও তাঁহার সুখের আশা বর্ত্তমান ছিল—ইতিমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় দয়াদেবীর মৃত্যু হইয়া তাঁহার লজ্জার কারণ ঘুচিয়া যাইতে পারে, এবং নিষ্কণ্টক হওয়াতে রাজবালাকে পোষ মানাইয়া তুলিবারও যথেষ্ট সময় ও সুযোগ মিলিতে পারিবে। তিনি পঞ্চাননকে বলিলেন—দেখ পাঁচুদা, দু-দুটো বিয়ে, খরচ ত হবে মবলগ! কি করে' খরচের টাকাটা জোগাড় করা যায়, বল দেখি!

পঞ্চানন বলিল—সে জন্যে তুমি কিছু ভেবো না ভায়া! প্রজাপতির হুকুম যখন হয়ে গেছে তখন প্রজাদের তার উপকরণ জোগাতেই হবে। নবান্নের পরই আমাদের পুণ্যাহ হবে, সেই দিন বাকি খাজনা কারো বাকি থাকবে না; আর স্বয়ং রাজার বিয়ে, একমাত্র রাজকন্যার বিয়ে, এ ত প্রজাদের আনন্দের দিন, তারা সবাই মিলে বিয়ের খরচটা তুলে দেবে, এতে ত তাদেরই গৌরব। একটা মাথট আদায় করতে হবে—খাজনার নিরিখে ধর টাকায় দু আনা! যখন তিন মাস সময় পাওয়া গেছে তখন আমি আর কিছু ভাবিনে। একটি পয়সাও তোমার ঘর থেকে খরচ হতে দেবো না।

পঞ্চাননের কথায় গুণময় খুসী হইয়া উঠিলেন। গুণময় যখন বিবাহ-উৎসবের বাহিরকার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পঞ্চাননের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিলেন, তখন অন্দরে তাঁহার ভাবী শাশুড়ী রাজবালার মা ব্যস্ত হইয়া অন্যদিকের জোগাড়ে লাগিয়া গিয়াছিলেন—বড়ি দেওয়া, সুপারি কাটা, ছিরি গড়া, বরণডালা সাজানো, আনন্দনাড়ুর জন্য চাল কোটা, তিল ঘসা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হইয়া তিনি আর বসিবার অবসর পাইতেছিলেন না। তিনি আসিয়া সেই প্রথম দিন যে দয়াদেবীর ঘরে গিয়াছিলেন, তার পর আর তিনি যান নাই—তিনি রাজবালাকে

দয়াদেবীর সতীন করিয়া দিতে সম্মত হইয়া অবধি দয়াদেবীর সম্মুখে যাইতে লজ্জা ও ভয় পাইতেছিলেন।

দুটি বৃদ্ধ জমিদারের শুভবিবাহের এই আনন্দ-আয়োজনের মধ্যে নিরানন্দ হইয়া উঠিয়াছিল অনেকেই—দয়াদেবী, রাজবালা, মায়া, এমন কি মোহিনী পর্য্যন্ত, এবং বেশী করিয়া নিরানন্দ হইয়াছিল দরিদ্র ভীত প্রজারা। দয়াদেবীর চোখের জল আর শুকাইতেছিল না; দুধের মেয়ে মায়া এক অতিবৃদ্ধের হাতে পড়িতে যাইতেছে, বাপ যে কশাইএর কাজ করিতে যাইতেছেন মা হইয়াও তাঁহার তাহাতে প্রতিবাদ করিবার অধিকার নাই, প্রতিবাদ করিলেও তাহা নিশ্চয়ই টিকিবে না। তবু তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন একবার স্বামীর পায়ে ধরিয়া কন্যার কল্যাণ ভিক্ষা করিবেন, মেয়ের প্রতি বাপের মমতা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যেদিন হইতে রাজবালাকে বিবাহ করিবার কথা তিনি জানিতে পারিয়াছেন সেদিন হইতে আবার তাঁহার স্বামীর দর্শন দুর্লভ হইয়াছে; তিনি রাজবালার লোভে ঘরের বাহিরে ঘুরঘুর করিতেন, কিন্তু আর ঘরে ঢুকিতেন না।

রাজবালা এই ঋষ্যমূক-পর্ব্বতের ন্যায় নিরাপদ ঘরে আশ্রয় লইয়া এখন নিরুপদ্রবে প্রাণপণ যত্নে দয়াদেবীর সেবা করিতেছিল এবং দয়াদেবীর অবিরাম অশ্রুধারার সঙ্গে অশ্রু ঢালিয়া নীরবে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল। রাজবালা ঔষধ ঢালিয়া দয়াদেবীর মুখের কাছে ধরিয়া বলিল—দিদি, ওষুধটুকু খেয়ে ফ্যালো।

দয়াদেবীর চোখ দিয়া জল উথলিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন—আর আমি ওষুধ খাব না, মরণেই আমার সকল জ্বালা জুড়োবে, ওষুধ খেয়ে মরণকে বাধা আর দেবো না।

এই কথা রাজবালার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। তাহার এমন নম্রপ্রকৃতির

দিদির এই যেটুকু দুঃখের বিলাপ মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে তাহা যে কত-খানি দুঃখে তাহা রাজবালা অনুভব করিল, এবং সেই দুঃখের কারণ সে-ই বলিয়া তাহার মন পীড়িত হইয়া উঠিল। রাজবালা উচ্ছ্বসিত অশ্রু আঁচলে মুছিয়া বলিল—দিদি, আমার জন্যে তুমি মরবে! তার চেয়ে আমি……

দয়াদেবী তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—বালাই ষাট! আমি ত মরতে বসেছি ভাই, আর তোর এই কচি বয়েস! অমন কথা মনেও আনিসনে। তোর ওপর আমার একটু রাগ নেই। বীরেন ছাড়া আমার এমন সেবা আর কেউ করতে পারত না……

রাজবালা দুই হাতে আঁচল ধরিয়া চোখ ঢাকিয়া মৃদু স্বরে বলিল—আমি ত তার দেখেই শিখেছি; সে আমায় বলে গেছে তোমার সেবা করতে; তাই করছি; নইলে আমি কোন্ মুখে তোমার কাছে আসতাম দিদি!

দয়াদেবী মমতায় দ্রব স্বরে বলিলেন—আমি তা বুঝতে পেরেছি রাজু। তাই, তুই আমার সতীন হলেও তোকে আর ভয় নেই। আমার এখন দুঃখ শুধু মায়ার জন্যে! মনে করেছিলাম মায়াকে বীরেনের হাতে দিয়ে আমাদের কতক ঋণ শোধ করব, সকল অপরাধ মার্জ্জনা চেয়ে নেব; তারপর দেখলাম প্রথম দেখাতেই তোদের দুজনের মন কী আনন্দে সাড়া দিয়ে উঠেছে! তখন মনে করলাম আমার দুঃখী ছেলেকে তোকে দিয়ে সুখী করব! সে সাধেও প্রবল অন্তরায় ঘটল—যে তাকে ভিটেছাড়া মাতৃহীন করেছিল সেই তার এই সুখটুকুও সইতে পারলে না। আমি কি বুঝতে পারিনি রাজু, কী দুঃখে বাছা আমার বলে গেল 'মা, আমি বিয়ে করব না, বিয়ের আশা আমার ঘুচে গেছে!' আমি কি বুঝতে পারছিনে রাজু, কেন তুই রাজার রাণী হতেও চাচ্ছিসনে, কী দুঃখে তোর চোখের জল শুকোচ্ছে না!

রাজবালা দয়াদেবীর কোলের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া মুখ ঢাকি ফুলিয়া-ফুলিয়া বড় কান্নাটাই কাঁদিতে লাগিল; এতদিন যাহা তাহা একলার মনে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, সেই গোপন দুঃখের দরদী অংশী পাই তাহার কান্না যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার মনে হইতে লাগি রুক্মিণী বা সুভদ্রার মতন তাহাকে হরণ করিয়া বীরেন্দ্র কি তাহাকে এ অনিচ্ছার বিবাহ হইতে বাঁচাইতে পারে না! তা যদি না পারে ত কি সে কৃষ্ণকুমারীর মতন মরিয়া এই বাড়ীর সকল অমঙ্গল মুছিয়া দিয় যাইতে পারে না। রাজবালা কাঁদিতে-কাঁদিতে মুখ না তুলিয়াই অতি মৃ স্বরে বলিল—ও যে দিদি আমাকে বারণ করে গেছে তোমার সতী হতে! আমাকে দিদি তুমি বাঁচাও।

তাঁহার প্রতি বীরেনের মমতা দেখিয়া দয়াদেবীর মন স্নেহে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল; তিনি রাজবালার মাথায় শান্তিজল বর্ষণের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে-করিতে নীরবে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এমন সময় চেলির কাপড়ে জড়িত ও আপাদমস্তক রূপা সোনা জহরতে নিপীড়িত মায়া মায়ের গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—মা, আমি ও-বুড়োকে বিয়ে করব না, বীরেন-দাকেই বিয়ে করব!

(১৯)

পঞ্চানন জমিদারীর সকল ডিহির তহশীলদারদের উপর পরোয়ানা জারি করিল যে 'যেহেতু সরকার মালিক মহোদয়ের ও রাজকন্যার শুভ বিবাহ আগামী মাহায় হইবেক, সেহেতু অত্র মাহার মধ্যে সমস্ত বাকি বকেয়া ও মাথট টাকায় মাত্র দু-আনা হিসাবে জরুর আদায় করিয়া সদর

খাজনা-খানায় বে-ওজর দাখিল করিবা—হাজা শুখা ফৌত মৌত নাগা হাজত কোন ওজর শুনিবা না ; যে তহশীলদার ইহাতে গাফিলি করিবেক তাহাকে বরতরফ করা হইবেক ও যে ব্যক্তি মালিকের কার্য্য ষোল আনা হাসিল করিতে পারিবেক তাহাকে হজুরের নজরানা মকুফ করা যাইবেক।' রাজকন্যার বিবাহের জন্য ঘটক নিযুক্ত হইয়াছে শুনিয়াই সমস্ত প্রজার বুকের রক্ত হিম হইয়া উঠিয়াছিল, না জানি তাহাদের নিকট হইতে কত নিরিখে মাথট আদায় করা হইবে! তারপর যখন তাহারা শুনিল যে স্বয়ং মালিকেরও শুভবিবাহ তখন নিদারুণ অশুভের আশঙ্কায় বেচারারা প্রমাদ গণিতে লাগিল। তাহারা কখনো জমিদারের সাক্ষাৎ পায় না, পঞ্চাননের কাছে রোদন অরণ্যে রোদনের চেয়েও নিষ্ফল, পঞ্চানন যাহা করিতে চায় তাহা সম্পন্ন করিতে সে কত কঠোর হইয়া কি-রকম অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে, তাহা ত সকল প্রজাই জানে, এই ত সেদিন বীরেন রায়ের কি দুর্দ্দশা হইল তাহা ত তাহাদের সকলের জানা আছে, সুতরাং ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সকলের প্রাণে আতঙ্ক ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল।

সে বৎসর দেশে ভালো বৃষ্টি না হওয়ায় ধান ভালো হয় নাই ; জমিদারের খাজনা ও মহাজনের সুদ গণিয়া কাচ্চাবাচ্চার খাইবার সংস্থান তাহাদের থাকিবে না, তাহারা টাকায় দুআনা নিরিখে মাথট দিবে কোথা হইতে! কিন্তু না দিলেও নয়, না দিলে হাল গোরু ক্রোক হইবে, বেটি জোরু বে-ইজ্জত হইবে, বীচন ধান বাজেআপ্ত হইবে, মাল লুঠ হইবে, ঘরে আগুন লাগাইবে, মিথ্যা মকদ্দমায় জেরবার করিয়া জেল খাটাইবে। ক্ষেতে খামারে চাষায় মজুরে ঐ কথা, বারোয়ারি-তলায় সন্ধ্যার জটল্লায় সকলের ঐ ভাবনা, পুকুর-ঘাটে ও ঢেঁকিশালে মেয়েদের মধ্যেও সেই একই আলোচনা।

সেই অঞ্চলের গরিব প্রজাদের সকল-রকম সুখে দুঃখে ভয়ে ভাবনা
বন্ধু ও সহায় হইয়া দাঁড়াইত সাঁড়াশিয়া মৌজার পতিত মণ্ডল। সে
জাতে হাড়ি। তার বয়সও বেশী নয়, বড় জোর পঁচিশ বৎসর হইবে
সে হাতীকান্দার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া দিনকতক কলিকাতা
কলেজেও পড়িয়াছিল। তারপর তাহার বাবা তারণ মণ্ডলের মৃত্যু
হওয়াতে তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিতে হইয়াছে
সে নানা-রকম বই পড়িয়া ও নিজের পরীক্ষা ও পরিশ্রমের দ্বারা অ
দিনের মধ্যেই তাহার চাষবাস ক্ষেতখামার খুব উন্নত ও ফলাও করি
ফেলিয়াছে; তাহার গ্রামে জঙ্গল নাই, পচা ডোবা পানাপুকুর নাই
পথে কোথাও জল জমে না, কাদা হয় না—সে নিজে গ্রামের সক
লোককে সঙ্গে লইয়া সমস্ত পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করে, কূয়ো ঝালায়, রা
ঘাট মেরামত করে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা জমিদারের মুখ চাহিয়া বসিয়া দুঃ
ও রোগ ভোগ করে না; গ্রামে একটা পাঠশালা করিয়াছে, তাহা
দিনে একবার ও সন্ধ্যার পর একবার ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শেখা
হয়, যাহারা বাড়ীঘরের কাজের জন্য দিনে পাঠশালায় আসিতে পা
না তাহারা রাত্রে পড়ে; পতিতের অনুরোধে বুড়ো বু চাষার
সেই পাঠশালায় পড়িতে আসে, পতিত নানাবিধ কৃষি ক ও কৃ
পত্রিকা পড়িয়া শুনাইয়া তাহাদিগকে নব নব কৃষিতত্ত্ব বুঝাইয়া দ্যা
পতিতের বাড়ীতে একবাক্স হোমিওপ্যাথি ঔষধ, কুইনাইন, ক্যাষ্টর অ
প্রভৃতি মোটামুটি এলোপ্যাথি ঔষধ ও খানকতক চিকিৎসার ব
আছে; সে গ্রামের ডাক্তারও বটে। গ্রামের বারোয়ারি পতি
উদ্যোগেই হয়। গ্রামের কুস্তি আর কসরতের আখড়ায় পতিতই নিয়
পাকা খেলোয়াড়—সে সকলকে কুস্তি লড়ায়, লাঠি হাডুডুডু দাণ্ডাগু

তাহাতে পতিত বাপ-খুড়ার কাছে তালিম হইয়া পাকা হইয়া উঠিয়াছে, তারপর স্কুলে কলেজে পড়িবার সময় ফুটবল খেলাতেও দক্ষ বলিয়া তাহার নামডাক হইয়াছিল। এইসবের জন্য পতিতের চেহারাটিও বেশ বলিষ্ঠ, মজবুত, আর তাহার মনটিও বেশ সাহসে ভরা। পতিতের এইসব গুণের জন্য সে সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিল, সকল লোকই তাহাকে ভালো বাসিত, সে যে হাড়ির ছেলে তাহা সেইসব চাষা-গাঁয়ের ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত কতকটা ভুলিয়া বসিয়াছিল।

জমিদারের বিবাহের খরচ তুলিবার জন্য সকল ডিহির তহশীলদারদের উপর মাথট আদায়ের পরোয়ানা জারি হইয়াছে শুনিয়া পতিত সকল গাঁয়ের ঘরে ঘরে গিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিল। একদিন পঞ্চানন তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁরে পতে, কি মতলবে তুই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস রে!

পতিত খুব নীচু হইয়া প্রাতঃপ্রণাম করিয়া নায়েব মহাশয়কে জানাইল—আজ্ঞে, মালিকের বিয়ে, তার সব খরচ ত আমাদেরই দেওয়া উচিত; এবার অজন্মা হয়েছে, সবাই হয়ত মাথট দিতে পারবে না; যারা পারবে না, তাদের টাকাটাও আমরাই চাঁদা করে তুলে দেবো; তারই পরামর্শ আমি করে বেড়াচ্ছি নায়েব মশায়!

পঞ্চানন খুসী হইয়া বলিল—তুই তারণের উপযুক্ত ছেলে হয়েছিস! হাজার হোক একটু লেখাপড়া শিখেছিস কিনা! একেই ত বলে রাজ-ভক্তি! তোর যেমন মতিগতি, দেব-দ্বিজে ভক্তি, তোর ভালো হবে!

পতিত আবার নত হইয়া প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—সে আপনার আশীর্ব্বাদের জোরেই নায়েব মশায়।

পঞ্চাননের দিকে পিঠ ফিরাইয়াই পতিতের মুখে ঈষৎ একটু ক্রুদ্ধ কঠোর ভাব ফুটিয়া উঠিল।

পতিত ফিরিয়া যাইতে-যাইতে লছমন দুলের বাড়ীর মধ্য জমিদারের পাইকের তর্জ্জন শুনিতে পাইল। পতিত থমকিয়া দাঁ শুনিল পাইক বলিতেছে—নায়েব মশায় সকল প্রজার জমা হিসেব মাথটের ফর্দ্দ করেছেন; তোমাদের বাকি খাজনা আর হাল খাজনা মিলে ১০৶৴০, আর টাকায় দু আনা হিসাবে মাথট পৌনে আনা; মোট ১১৷৷১৫ তোমাকে আজ দিতেই হবে। এই নেও দ চেক আর এই নেও মাথটের চিঠ,...

লছমন কাতর হইয়া বলিতেছে—এই সেদিন আমার ঘর গেছে, এখনো চালে খড় দিতে পারিনি, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এই কা হিম বুকে হাঁটু দিয়ে কাটাচ্ছি; এবার ক্ষেতখামারে একদানা মিলবে না; পেটের ভাতই জোটাতে পারব না, তা খাজনাই বা শু কোত্থেকে আর মাথটই বা জোগাব কেমন করে......

পাইক বলিয়া উঠিল—গায়ে ময়লা মাখলে কি যমে ছাড়ে! না মশায়ের হুকুম, টাকা না দিলে গলায় গামছা দিয়ে জুতো মারতে মা কাছারীতে নিয়ে যাব......

পতিত তাড়াতাড়ি লছমনের চালশূন্য মাটির দেয়াল ঘেরা পে বাড়ীর উঠানে গিয়া পাইককে বলিল—এই যে রামধন, মাথট আ করতে এসেছ বুঝি? আমি নায়েব মশায়কে বলেছি, যে প্রজা ম দিতে পারবে না, তার হিস্সা আমরা চাঁদা করে তুলে দেবো; লছমনকে আজ কিছু বোলো না, ওর হিস্সা আমি তুলে দেবো।

রামধন বলিয়া উঠিল—"তুমি ত বললে মোড়লের পো; কিন্তু" রামধন একবার এদিক-ওদিক সন্তর্পণে তাকাইয়া গলার স্বর নামা বলিল—"কিন্তু নায়েব মশায়টি ত সোজা লোক নয়! লছমনকে

থেকে জুতোর দাম আর লছমনের হিস্‌সার মাথট কেটে আদায় করে নেবে !”

পতিত বলিল—চল, আমি তোমার সঙ্গে নায়েব মশায়ের কাছে যাচ্ছি।

রামধন আর আপত্তি করিল না। পতিত মণ্ডল সাঁড়াশিয়া মৌজার প্রধান মাতব্বর প্রজা ; জোত জমা ক্ষেত খামার গুড়ের বাইন প্রভৃতিতে তাহার ফলাও কারবার। সে জামিন হইলে আর ভাবনা কি ?

পতিত কাছারিতে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল—কিরে পতে, আবার কি মনে করে ?

পতিত হাত জোড় করিয়া বলিল—আপনি গরিবের মা-বাপ ! অভয় দান ত একটি কথা হুজুরের কাছে নিবেদন করি ?

পঞ্চানন গম্ভীর হইয়া বলিল—কি বল্ ?

—মাথট কি বাকি-বকেয়ার জন্যে কারো ওপর আপনি জুলুম করবেন না ; যে যে দিতে পারবে না তার হিস্‌সা আমি যেমন করে পারি সরকারে দাখিল করে দেবো ; আমি সকলকার জামিন হচ্ছি।

পঞ্চানন ভ্রূ নাচাইয়া বলিল—তোর বড্ড টাকা হয়েছে যে দেখছি !

পতিত হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমরা সবাই গরিব ; কিন্তু আমরা তঞ্চকতা জানিনে, আমাদের ন্যায্য দেনা আমরা শোধ করবই, আজ নয় কাল ; যারা এখন দিতে পারছে না, নাপার্গামানেই পারছে না ; সময় হলে দিয়ে দেবে ; সরকারের কাজ এখন আমরা চাঁদা তুলে চালিয়ে দি, পরে ক্রমে ক্রমে সকলের কাছ থেকে আদায় করে-নেবো।

পঞ্চানন বলিয়া উঠিল—তুই এ বেশ বুদ্ধি ঠাউরেছিস, এমনি করেই ত তেজারতি ফলাও করতে হয়। তা হাজার হোক সবাই গরিব, সুদটা একটু কম নিরিখে ধরিস, দেখিস দরিদ্রপীড়ন যেন না হয়।

পতিত ফিরিয়া যাইতে-যাইতে লছমন দুলের বাড়ীর মধ্য হইতে জমিদারের পাইকের তর্জ্জন শুনিতে পাইল। পতিত থমকিয়া দাঁড়াইয়া শুনিল পাইক বলিতেছে—নায়েব মশায় সকল প্রজার জমা হিসেব করে মাথটের ফর্দ্দ করেছেন; তোমাদের বাকি খাজনা আর হাল সনের খাজনা মিলে ১০৮/০, আর টাকায় দু আনা হিসাবে মাথট পৌনে বারো আনা; মোট ১১॥১৫ তোমাকে আজ দিতেই হবে। এই নেও দাখিলা চেক আর এই নেও মাথটের চিঠ,···

লছমন কাতর হইয়া বলিতেছে—এই সেদিন আমার ঘর পুড়ে গেছে, এখনো চালে খড় দিতে পারিনি, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এই কার্ত্তিকে হিম বুকে হাঁটু দিয়ে কাটাচ্ছি; এবার ক্ষেতখামারে একদানা ফসল মিলবে না; পেটের ভাতই জোটাতে পারব না, তা খাজনাই বা শুধবো কোত্থেকে আর মাথটই বা জোগাব কেমন করে······

পাইক বলিয়া উঠিল—গায়ে ময়লা মাখলে কি যমে ছাড়ে! নায়েব-মশায়ের হুকুম, টাকা না দিলে গলায় গামছা দিয়ে জুতো মারতে মারতে কাঁছারীতে নিয়ে যাব······

পতিত তাড়াতাড়ি লছমনের চালশূন্য মাটির দেয়াল-ঘেরা পোড়া বাড়ীর উঠানে গিয়া পাইককে বলিল—এই যে রামধন-দা, মাথট আদায় করতে এসেছ বুঝি? আমি নায়েব মশায়কে বলেছি, যে প্রজা মাথট দিতে পারবে না, তার হিস্‌সা আমরা চাঁদা করে তুলে দেবো; তুমি লছমনকে আজ কিছু বোলো না, ওর হিস্‌সা আমি তুলে দেবো।

রামধন বলিয়া উঠিল—"তুমি ত বললে মোড়লের পো; কিন্তু"—রামধন একবার এদিক-ওদিক সন্তর্পণে তাকাইয়া গলার স্বর নামাইয়া বলিল—"কিন্তু নায়েব মশায়টি ত সোজা লোক নয়! লছমনকে না পেলে আমার পিঠেই জুতো জোড়া ছিঁড়বে আর আমার মাইনে

থেকে জুতোর দাম আর লছমনের হিস্‌সার মাথট কেটে আদায় করে নেবে!"

পতিত বলিল—চল, আমি তোমার সঙ্গে নায়েব মশায়ের কাছে যাচ্ছি।

রামধন আর আপত্তি করিল না। পতিত মণ্ডল সাঁড়াশিয়া মৌজার প্রধান মাতব্বর প্রজা; জোত জমা ক্ষেত খামার গুড়ের বাইন প্রভৃতিতে তাহার ফলাও কারবার। সে জামিন হইলে আর ভাবনা কি?

পতিত কাছারিতে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল—কিরে পতে, আবার কি মনে করে?

পতিত হাত জোড় করিয়া বলিল—আপনি গরিবের মা-বাপ! অভয় দ্যান ত একটা কথা হুজুরের কাছে নিবেদন করি?

পঞ্চানন গম্ভীর হইয়া বলিল—কি বল্‌?

—মাথট কি বাকি-বকেয়ার জন্যে কারো ওপর আপনি জুলুম করবেন না; যে যে দিতে পারবে না তার হিস্‌সা আমি যেমন করে পারি সরকারে দাখিল করে দেবো; আমি সকলকার জামিন হচ্ছি।

পঞ্চানন ভ্রূ নাচাইয়া বলিল—তোর বড্ড টাকা হয়েছে যে দেখছি!

পতিত হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমরা সবাই গরিব; কিন্তু আমরা তঞ্চকতা জানিনে, আমাদের ন্যায্য দেনা আমরা শোধ করবই, আজ নয় কাল; যারা এখন দিতে পারছে না, নাপার্গ্যমানেই পারছে না; সময় হলে দিয়ে দেবে; সরকারের কাজ এখন আমরা চাঁদা তুলে চালিয়ে দি, পরে ক্রমে ক্রমে সকলের কাছ থেকে আদায় করে নেবো।

পঞ্চানন বলিয়া উঠিল—তুই এ বেশ বুদ্ধি ঠাউরেছিস, এমনি করেই ত তেজারতি ফলাও করতে হয়। তা হাজার হোক সবাই গরিব, সুদটা একটু কম নিরিখে ধরিস, দেখিস দরিদ্রপীড়ন যেন না হয়।

পতিত তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া খুব কাশিতে লাগিল। কোনো কথাই বলিতে পারিল না।

পঞ্চানন বলিল—আচ্ছা, ঐ কথাই রইল, যা [illegible] থাকবে তা তুই অঘ্রাণ মাসের সাত তারিখের মধ্যে সদরে কড়ায় [illegible] জমা করে দিয়ে যাবি। যা বাকি পড়বে তোর জমি ক্রোক করে আ[illegible] হবে জেনে রাখিস্।

পতিত প্রণাম করিয়া বলিল—যে-আজ্ঞে!

কাছারী হইতে বাহির হইয়া দাঁতে দাঁত রাখিয়া পতিত বলিয়া উঠিল—শালা!

(২০)

ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত গুণময়ের আর তর সহিতেছিল না; পণ্ডিতের কাছে পাঁতি লইয়া স্থির হইয়াছে, যে-মাসে অকাল তাহার তেরো দিন বাদ দিয়া শুভকার্য্য করা যাইতে পারে। তাই অগ্রহায়ণ মাসের পনরই মায়ার ও সতেরই গুণময়ের বিবাহ স্থির হইয়াছে। আর ত [illegible] দেরী নাই। বাহিরে পঞ্চানন, অন্দরে রাজবালার মা, ও সদর-[illegible]র গুণময় ব্যস্ত হইয়া সমস্ত আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছে।

ওদিকে মায়াও মায়ের ঘরে পুতুলের বিয়ের জোগাড়ে লাগিয়া গিয়াছে, তাহার ছেলের সঙ্গে রাজু-মাসীর মেয়ের কাল বিয়ে হইবে ঠিক হইয়াছে। দয়াদেবী কাল সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই, বুকের বেদনা বড় বাড়িয়াছিল, ভোর বেলায় একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, তাই আজ তাঁহার ঘুম ভাঙিতে এত বেলা হইয়া পড়িয়াছে। রাজবালা তাঁহার পায়ের বালাপোষ-খানি নিজের কোল পর্য্যন্ত টানিয়া তাঁহার পা-দুখানি

কোলে তুলিয়া আস্তে-আস্তে হাত বুলাইতেছে। খাটের পাশেই একটি ছোট টেবিলের উপর ঔষধের শিশি, মাপের গেলাস, জলের রূপার ঘটী আছে; তাহারই এক-পাশে একটা স্পিরিট ষ্টোভের উপর জল গরম হইতেছে, দয়াদেবীর ঘুম ভাঙিলে মুখ ধুইবেন, মেলিন্স ফুড খাইবেন; একখানা টুলের উপর রূপার ছোট রেকাবিতে দাঁতের মাজন ও রূপার জিবছোলা ও ধোয়া তোয়ালে ভাঁজকরা রহিয়াছে। ঘরের কোণে একটা তাকের উপর একটা ঘড়ীতে আটটা বাজিয়া গেল। রাজবালা সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া একবার ঘড়ীর দিকে ও একবার মায়ার দিকে তাকাইয়া ক্লান্তভাবে একবার পিঠটাকে সোজা করিয়া হাই তুলিল। ঘড়ীর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া মায়াও মুখ ফিরাইয়া ঘড়ীর দিকে চাহিল এবং তাহাতে রাজবালার সঙ্গে চোখোচোখি হইল। মায়া অমনি বলিয়া উঠিল—মাসী, ছেলের গায়ে হলুদ দেবে এস, আটটা বেজে গেল, এর পর বারবেলা পড়বে যে!......

রাজবালা নীরবে হাত নাড়িয়া মায়াকে কথা থামাইতে ইঙ্গিত করিল।

ঘড়ীর শব্দে ও মায়ার কথায় দয়াদেবীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি চট করিয়া চোখ মেলিয়াই দেখিলেন রাজবালা তাঁহার পা কোলে করিয়া বসিয়া আছে। তিনি দেখিলেন, যে-রাজবালা প্রথম এই বাড়ীতে আসিয়াছিল এ যেন সেই রাজবালা নয়। তাহার সেই তপ্তকাঞ্চনের বর্ণ মলিন হইয়া পড়িয়াছে, চোখের কোল বসিয়া গিয়াছে, নিটোল গাল দুটি ভাঙিয়া পড়িয়াছে; তাহার সে প্রফুল্ল চঞ্চলতা নাই, বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্য তাহাকে প্রৌঢ়া করিয়া তুলিয়াছে। দয়াদেবী তাহার দিকে দেখিতে-দেখিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—রাজু, তোর এখনও নাওয়া হয়নি?

—না, দিদি।

—তুইও এই উঠলি বুঝি ?

রাজবালা সমস্ত রাত জাগিয়া বসিয়াই কাটাইয়াছে ; সুতরাং সে দয়াদেবীর প্রশ্নের কি উত্তর দিবে সহসা ঠিক করিতে না পারিয়া একটু থতমত খাইয়া শুধু বলিল—না।

—তবে তুই একেবারে নেয়ে এলেই ত পারতিস। এতখানি বেলা হল, খাবি কখন ? মড়ার হাওয়া লেগে তুইও যে শুকিয়ে উঠছিস রাজু !

রাজবালা দয়াদেবীর স্নেহের স্পর্শে লজ্জিত হইয়া বলিল—তোমায় ওষুধ পথ্যি দিয়ে আমি যাব দিদি।

—আমি ত এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলাম, ততক্ষণে তুই ত নেয়ে খেয়ে আসতে পারতিস।

রাজবালা একটু হাসিয়া বলিল—তোমার পা কোলে ছিল, নামাতে গেলে তোমার ঘুম ভেঙে যাবে বলে আমি নড়তে পারিনি।

দয়াদেবী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—তুই কি তবে সমস্ত রাত আমার পা কোলে করে ঠায় বসে আছিস রাজু ?

রাজবালা মাথা নত করিয়া একটু শুধু হাসিল।

দয়াদেবী রাজবালার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ডাকিলেন—রাজু, তুই আমার কোলের কাছে সরে আয়।

রাজবালা তাঁহার কাছে সরিয়া যাইতেই দয়াদেবী দুই হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া নিজের মুখের কাছে সরাইয়া আনিয়া তাহার কপালে চুম্বন করিলেন। তারপর ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া মায়াকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—মায়া, যা ত মা, তোর দিদিমাকে একটু ডেকে আন্ ত।

মায়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

দয়াদেবী রাজবালার মুখে মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন—বীরু ছাড়া এমন যত্ন আমি আর কারো কাছে পাইনি !

বীরেন্দ্রের নামে দয়াদেবীর মমতা অশ্রুতে গলিয়া পড়িতে লাগিল; রাজবালা দয়াদেবীর কান্না দেখিয়া নিজের বেদনা আর গোপন করিতে পারিল না, তাহারও চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

মায়ার পিছনে পিছনে রাজবালার মা হাতময় কলায়ের দালবাটা মাখিয়া সেই ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াই দয়াদেবী ও রাজবালাকে কাঁদিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মায়াও অবাক হইয়া দাঁড়াইল; সে এই দেখিয়া গেল মা ও মাসী কথা বলিতেছে, এখনি আবার কাঁদিবার কি কারণ ঘটিল? বেচারা এই কয়দিন হইতে দেখিতেছে থাকিয়া থাকিয়া তাহার মা কাঁদেন, তাহার মাসী লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে, মোহিনী ঝিও বাদ যায় না; তাহার বীরেন-দাদাও কাঁদিতে-কাঁদিতেই কলিকাতা গিয়াছে; ইহার কারণ সে কিছুই ধরিতে পারে না। সকলের কান্না দেখিয়া-দেখিয়া তাহারও কেমন কান্না পায়, কিসের একটা ভয়ে তাহার মনের মধ্যে ছমছম করিতে থাকে; সেই ভয়টা আকার ধরিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে যখন তাহার মনে হয় সেই পাকা-গোঁপ-ওয়ালা মোটা বুড়োটার সঙ্গে তাহার বিয়ে হইবে! রাজবালার মা মনে করিলেন তাঁহার বোনঝি আর মেয়ের এই যে কান্না ইহা গুণময়ের সহিত রাজবালার বিবাহে আপত্তি ছাড়া আর কিছু না; দয়াদেবী ডাকিয়াছেন তাঁহাকেও দলে টানিবার জন্য। কিন্তু রাজবালার মা মনে মনে বলিয়া উঠিলেন—"আমি তেমন কাঁচা মেয়ে নইগো বাছা, যে, চোখের জলে গলে গিয়ে আমার মেয়ের সুখ ভাসিয়ে দেবো।" রাজবালার মা এ বাড়ীতে পা দিয়াই বুঝিয়া লইয়াছেন যে জামাইএর কথার বিরুদ্ধে তাঁহার বোনঝির একটা কথাও চলে না; সুতরাং জামাইকে পৃষ্ঠবল পাইয়া বোনঝিটিকে আর ভয় ছিল না; ছিল একটু চক্ষুলজ্জা, তাও দয়াদেবী শয্যাগত হইয়া থাকতে সে লেঠাও চুকিয়া গিয়াছিল, তিনি নিজে দিনান্তেও একটিবার দয়াদেবীর ঘরের চৌকাঠ

ডিঙাইতেন না। আজ ডাকিয়া পাঠানোতে আসিতে হইয়াছে, এবং আসিয়াই দেখিলেন কান্নার পালা। তিনি ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—শুভকর্মে এ কি অলক্ষণ বাছা! রাতদিন চোখের জল ফেলা! এ ত আর কেউ পরের বিয়ে নয়—এক নিজের সোয়ামী আর এক নিজের মাসতুতো বোন—তাতে এত তোর খোট কেন দয়া! এত আপ্তগরজে হওয়া ভাল নয় বাছা!

দয়াদেবী চোখের জল মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সেইজন্যেই তোমায় ডেকেছি মাসিমা, আমার স্বামীর হাতে আমার বোনটিকে আমিই সম্প্রদান করব—তুমি দয়া করে আমায় এই অনুমতিটি দাও।

দয়াদেবীর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া রাজবালার মা খুসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন—তা আর অনুমতির অপিক্ষে কি মা, তুমি সতী লক্ষ্মী ভাগ্যিমানী, তুমি তোমার বোনকে সম্প্রদান করবে এ ত রাজুর ভাগ্যির কথা! আশীর্ব্বাদ কর, ও-ও যেন তোমার মতন শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে সোয়ামী-পুত্তুর রেখে যেতে পারে!

এই কথায় মর্ম্মাহত হইয়া রাজবালা অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া রূঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল—মা, তুমি এ ঘর থেকে যাও।

—আমি ত যাচ্ছিই বাছা, দু-দুটো বিয়ের করণা একলা করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে! ভট্‌চাযিদের বৌকে পিঁড়িতে আলপনা দিতে বসিয়ে আমি দুটি বড়ি দিতে বসেছিলাম, মায়া গিয়ে ডাকলে বলেই ত এলাম। আমার কি মাথা চুলকোবার সময় আছে যে এই ঘরে দাঁড়িয়ে থাকব!—বলিয়া রাজবালার মা ঘর হইতে হাসিমুখে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজবালা দয়াদেবীর কোলের কাছে মাথা লুকাইয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, আমি জামাই-দাদাকে কিছুতেই বিয়ে করব না, তুমি বললেও না, আমি যে ওর কাছে দিব্যি করেছি!

মায়াও আস্তে আস্তে আগাইয়া আসিয়া মায়ের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—মা, আমিও সেই মোটা বুড়োটাকে বিয়ে করব না, আমি বীরেন-দা'কেই বিয়ে করব!

দয়াদেবী দুই হাত দুজনের গায়ে রাখিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

মোহিনী দাসী ঘরে আসিয়া বলিয়া উঠিল—মাসিমা, মায়ের যে এখনো ওষুধ-পথ্যি খাওয়া হল না, এতখানি বেলা হয়ে গেল।

রাজবালা তৎক্ষণাৎ আপনার সকল দুঃখ মুছিয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। মায়ের মতন যত্ন, দাসীর মতন সেবা, দিদির মতন শুশ্রূষা লইয়া রাজবালা আপনাকে দয়াদেবীর কাজে নিযুক্ত করিয়া দিল।

(২১)

পঞ্চানন পতিত হাড়িকে ডাকিয়া আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁরে পতে, আজকে ত দোসরা অঘ্রাণ হয়ে গেল; যার কাছে মাথট চাওয়া যাচ্ছে সেই বলছে আমরা পতিত মণ্ডলকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো; তোর মতলব কি বল্ দেখি?

পতিত হাত জোড় করিয়া বিনীত ভাবে বলিল—আজ্ঞে, সবাই ত পূরো দিতে পারছে না, বাকিটা আমাদের চাঁদা করে পূরিয়ে দিতে হবে, তাই এক জায়গায় জড়ো করছি; সাতই তারিখের মধ্যে আপনাকে হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে যাব।

পঞ্চানন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় চতুর খানসামা ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কর্ত্তা-মা মারা গেছেন, বাবু আপনাকে ডাকছেন।

পঞ্চানন আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিল—এঁ! বলিস কিরে? রাণী-বৌ মারা গেলেন? কখন্?

চতুর বলিল—না না, রাণী-মা নন, কত্তা-মা। কাশী থেকে তার এসেছে।

পঞ্চানন বলিল—ওঃ! বাবুর মা মারা গেছেন? তা বয়েস হয়েছিল, কাশী পেলেন, ভালোই। কিন্তু বাবুর বিয়েতে বিলম্ব পড়ে গেল।

এই কথা শুনিয়া পতিতের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি দমন করিয়া বলিল—তা হলে এমাসে ত বিয়ে হবে না, আমাদের যদি দয়া করে আর কিছুদিন সময় দ্যান।

পঞ্চানন অন্যমনস্ক ভাবে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—অঘ্রাণ পোষ দুটো মাস পেয়ে গেলি।

পতিত কাছারী হইতে বাহির হইয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—জয় বাবা বিশ্বেশ্বর! তোমার দয়াতে দুটো মাস সময় পাওয়া গেল!

বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া পঞ্চানন দেখিল গুণময় খালিগায়ে একখানা শাল জড়াইয়া খালিপায়ে পায়চারি করিতেছেন। পঞ্চাননকে আসিতে দেখিয়াই গুণময় বলিয়া উঠিলেন—বুড়ি আর একটা মাস সবুর করে মরতে পারলে না! অঘ্রাণ মাস অশুচে কাটিবে, পোষ মাসে বিয়ে হবে না, মাঘ মাস মলবাস, বিয়ে হতে সেই ফাগুনে! আমি আর কালাশৌচ মানছিনে!

পঞ্চানন কি বলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

গুণময় পায়চারি করিতে-করিতে হঠাৎ থামিয়া বলিয়া উঠিলেন—দু-দুটো বিয়ের খরচের ওপর আবার শ্রাদ্ধের খরচ এসে চাপল! কোত্থেকে হবে?

পঞ্চানন বলিল—তাই ত সমিস্থে! আজকালকার যে আইন তাতে প্রজাদের কাছে বাজে আদায় করবার জো নেই। যে মাথট ধরা হয়েছে, অজন্মার জন্যে তাই আদায় হয়ে উঠছে না। যা মাথট আদায় হবে তাইতে বিয়ের খরচ চলে যাবে; শ্রাদ্ধর খরচটা এখন ঘর থেকে চালিয়ে পরের বছর আদায় করে নিতে হবে।

—তাই হবে, শ্রাদ্ধের একটা ফর্দ্দ তৈরি কর। আর বিলাসপুরে রসময়কে একখানা চিঠি লিখে দাও, ফাগুনের এদিকে বিয়ে হবার আর জো নেই।

পঞ্চানন চলিয়া যাইতেছিল, গুণময় নিজের মনে বলিয়া উঠিলেন—পচ্! সব পণ্ড! সব মাটি! মা এতকাল বেঁচে থাকলেন আর পনেরটা দিন বাঁচতে পারলেন না! এমন হঠাৎ মরাই বা কেন? ছেলের হাতের আগুন পর্য্যন্ত পেলেন না, ছেলের কপালে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেলেন।..... দেখ পাঁচু-দা, বীরে ছোঁড়ার একজামিন হয়ে গেছে, সে এসে পড়লে রাজুকে সামলে রাখা ভার হবে। তাকেও একখানা চিঠি লিখে দাওগে এবাড়ীতে তার আর জায়গা হবে না। চিঠি দুখানা লিখে নিয়ে এস, আমি দস্তখত করে দেবো।

পঞ্চানন চলিয়া গেল। গুণময়ও বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

ঠাকুর-ঘরের সামনে রাজবালার মা বসিয়া দুখানি কুলোতে বরণডালার মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সাজাইতেছিলেন, এবং ভটচায্যি-বৌ বড় বড় চারখানা নূতন কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়ির উপর খড়কে করিয়া বিবিধ রং দিয়া অতি সূক্ষ্ম আলপনা চিত্র করিতেছিল। ঠাকুরঘরের মধ্যে রাজবালা গলায় কাপড় দিয়া ঠাকুরের চরণতলে মাথা খুঁড়িতে-খুঁড়িতে প্রার্থনা করিতেছিল—হেই ঠাকুর, জামাই-দাদার সঙ্গে আমার যেন বিয়ে না হয়! আত্মহত্যা করা মহাপাপ, মরতে চাওয়াও পাপ—আমি মরতে চাই না; আমার

বসন্ত হোক, আমাকে তুমি কুৎসিত করে ঐ দিয়ে লোভীর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও!

এমন সময় গলায় কাচা দিয়া খালিপায়ে গুণময় সেই দালানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুণময় খালিপায়ে আসাতে কেহ তাঁহার আসা আগে হইতে টের পায় নাই, তিনি একেবারে সম্মুখে আসিয়া পড়াতে রাজবালার মা ও ভটচায্যি-বৌ তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া বসিলেন।

গুণময় হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—কার শ্রাদ্ধ কে করে, খোলা কেটে বামুন মরে! আর ওসব পণ্ডশ্রম কেন মাসিমা!

রাজবালার মা মুখ তুলিয়া গুণময়ের গুরুদশা দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ওকি বাবা! কি হল! বেয়ান কি কাশী পেয়েছেন নাকি?

গুণময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মা ত মরলেন না, আমায় মেরে গেলেন! একমাস অশুচ, তার পরে পোষ মাস, মাঘমাস মলমাস—বিয়ে হতে সেই ফাগুন মাসে! এর মধ্যে আবার কি হবে না-হবে কে জানে?

রাজবালার মা কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ সব আমারই পোড়াকপালের লিখন বাবা, আমারই বরাতের ফের! দয়া [illegible]ন্ত খুসী হয়ে রাজুকে সম্প্রদান করতে চাইলে, আর কোথা থেকে এ এক শুকনো বিপদ্ এল বল দেখি? যমের কি একটু কাল অকাল জ্ঞান নেই! দয়ার শিয়রে ত যম বসে ধন্না দিচ্ছে, আবার কবে কি হয় কে বলবে! সুভালাভালি তোমাদের দুহাত এক হয়ে গেলে যে আমি নিশ্চিন্দি হই! কিন্তু বাবা, তুমি একটা কাজ কোরো, সেই বোকা ছেলেটি যেন বিয়ের আগে এখানে না আসে, সে এলে আবার রাজুর মন বিগড়ে দেবে!

গুণময় বলিলেন—সে ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি, এ বাড়ীতে তাকে আর কখনো আসতে দেবো না!

রাজবালার মা নিশ্চিন্ত আরামের নিশ্বাস ছাড়িলেন।

ঠাকুরঘরের ভিতর হইতে রাজবালা তাহার মাতা ও ভগ্নীপতির সব কথা শুনিতে পাইতেছিল। যখন সে ঠাকুরের কাছে বিবাহ হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা করিতেছিল সেই মুহূর্ত্তে তিন মাস বিবাহ স্থগিত হইয়া যাওয়ার সংবাদ যেন ঠাকুরেরই বরদান বলিয়া মনে হইল; সেই সংবাদে আনন্দ-ভক্তি-কৃতজ্ঞতায় ভরা মনে, বীরেন্দ্রকে এ বাড়ীতে আসিতে না দেওয়ার সম্বন্ধে তাহার মায়ের প্রস্তাব ও গুণময়ের সমর্থন, যে দুঃখ বিরক্তি ও ঘৃণার প্রতিঘাত তুলিল তাহাতে অভিভূত হইয়া রাজবালা ঠাকুরের সামনে মাথা লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সেই কান্নার শব্দ শুনিয়া গুণময় রাজবালার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুরঘরে কাঁদে কে?

রাজবালার মা কান পাতিয়া শব্দ শুনিয়া বলিলেন—রাজু বোধ হয়।

গুণময় ঠাকুরঘরে ঢুকিলেন; রাজবালার মা চোখের ইসারায় ভটচায্যি-বৌকে ডাকিয়া লইয়া সে তল্লাট ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

গুণময় রাজবালার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—রাজু, বিয়েতে দুমাস দেরি পড়ে গেল, তার জন্যে কান্না কেন ভাই? বিয়ে আমাদের হয়েই গেছে মনে কর। তোমার কান্নায় আমার বুক ফেটে যায়—তুমি চুপ কর।

অশুচি কিছু গায়ে ঠেকিলে যেমন গা ঘিন্‌-ঘিন করে, গুণময়ের স্পর্শে রাজবালার তেমনি মনে হইল। সে গা মোড়া দিয়া গুণময়ের হাত ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। যখন আঁচল দিয়া রাজবালা চোখ মুছিতেছিল সেই অবসরে গুণময় রাজবালাকে

দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে হঠাৎ চুম্বন করিলেন। রাজবালা দুই হাতের প্রাণপণ জোর দিয়া গুণময়ের বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া এক ছুটে সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যেদিন মাতার মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছে সেই দিন গলায় কাচা পরিয়া ঠাকুরঘরে ঠাকুরের সামনে যে লোক এমন ব্যবহার করিতে পারে তাহার প্রতি ঘৃণায় রাজবালার সমস্ত দেহমন ভরিয়া উঠিয়াছিল ; সে ছুটিয়া গিয়া দয়াদেবীর পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দয়াদেবী পা সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হল রাজু, তুই কাঁদছিস কেন ? রাজবালা অনেকক্ষণ কাঁদিয়া দয়াদেবীর বারম্বার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—জামাই-দাদার মা মারা গেছেন, তিন মাস আমি বেঁচে গেছি দিদি !

দয়াদেবী আরাম ও দুঃখে মিশানো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মা এতদিনে বিশ্বেশ্বরের চরণে ঠাঁই পেলেন ! আঃ জুড়োলেন ! মা, আমায় তোমার কাছে ডেকে নাও !

দয়াদেবীর চোখ দিয়া টসটস করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

(২২)

গুণময় বৈঠকখানায় মাটিতে একখানা বিলাতী কম্বল পাতিয়া একখানা শাল গায়ে জড়াইয়া বসিয়া আছেন, পঞ্চানন নিকটে ফরাশের উপর বসিয়া গুণময়ের মাতৃশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদির ও কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে তাহার ফর্দ্দ করিতেছে।

ডাকের চিঠি আসিল। গুণময় বুড়া বলিয়া সনাক্ত হইবার ভয়ে চশমা লইতেন না। চিঠিগুলিকে হাতে করিয়া খুব দূরে ধরিয়া চোখ বিবিধ প্রকারে সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত করিয়াও যখন পড়িতে পারিলেন

না, তখন চিঠিগুলি পঞ্চাননের দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—আলোচালের হবিষ্যি কোরে আর রুক্ষু নেয়ে চোখ একদম খোরে গেছে ঘোড়ার ডিম !

পঞ্চানন চিঠিগুলি তুলিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—হবে না ? এই মানসিক ক্লেশের উপর দৈহিক কষ্ট !......পিরোজপুরের তহশীলদার লিখছে—হুজুরের কাছে অধীনের নিবেদন এই—

গুণময় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—অত ধানাইপানাই শুনতে পারিনে, তা'হলে ত আমিই পড়তাম, তোমাকে দিলাম কেন ? তুমি পড়ে পড়ে মোদ্দা-কথাটা আমায় বলো।

পঞ্চানন চিঠি পড়িয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল—পিরোজপুরে খুব দুর্ভিক্ষ হয়েছে, খাজনা আর মাথট আদায় হচ্ছে না।

গুণময় বলিলেন—তহশীলদারকে লিখে দাও আস্তে আস্তে আদায় করুক ; কিন্তু ফাল্গুন নাগাদ সমস্ত আদায় হওয়া চাই।

পঞ্চানন আর-একখানি চিঠি তুলিয়া লইয়া বলিল—বীরে রাণীবৌকে চিঠি লিখেছে।

গুণময় বলিলেন—আসতে বারণ করা হয়েছে তাই নালিশ করেছে। খুলে দেখ।

পঞ্চানন বিনা দ্বিধা-সঙ্কোচে দয়াদেবীর নামের চিঠি খুলিয়া পড়িয়া বলিল—না, সেসব কিছু লেখেনি, পাশ হয়েছে তাই খবর দিয়েছে, এখানে আর কখনো আসবে না তাও লিখেছে।

গুণময় বলিয়া উঠিলেন—আঃ ! আপদ বিদেয় হলো, বাঁচা গেল ! চিঠিখানা চতুরকে দাও, গিন্নিকে দিয়ে আসুক।

চতুর খানসামা চিঠি লইয়া অন্দরে দিতে গেল।

পঞ্চানন আর-একখানা চিঠি খুলিয়া পড়িয়া বলিল—রসময়বাবু চিঠি লিখেছেন ; আপনার মাতৃবিয়োগে দুঃখ করেছেন ; বিয়ে স্থগিত হওয়ায়

জন্যে আরো দুঃখ করেছেন; আর আমাদের জমিদারীর পাঁচশো ঘর প্রজা তাঁর জমিদারীতে উঠে যাবে বোলে এক দরখাস্ত করেছিল, সেই দরখাস্তখানা আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।

গুণময় কাত হইয়া কম্বলে শুইয়া-পড়িয়াছিলেন, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিলেন—অ্যাঁঃ। দরখাস্তে কি লিখেছে?

পঞ্চানন বলিল—মস্ত বড় দরখাস্ত। একটু একটু পড়ে শোনাই—'আমাদের জমিদার অত্যাচারী জুলুমবাজ!......একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর জুটিয়াছে পেঁচো—সে বেটা পাজির পা-ঝাড়া বেহদ্দ বদমায়েস!......আমরা রাতারাতি আপনার জমিদারীতে পলাইয়া যাইব ও জঙ্গল কাটিয়া গঞ্জ বসাইব, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা! ......জমিদার এই অজন্মার বৎসরে পূরা খাজানা ও মাথটের জন্য পীড়ন করিতেছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের পৃষ্ঠবল হইলে আমরা জমিদারের অতিলোভের উত্তম শিক্ষা দিতে পারি!......'

গুণময় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—পাজি বেটারা আমাকে শিক্ষা দেবে! এইবার কে কাকে শিক্ষা দ্যায় দেখিয়ে দেবো! কার কার নাম সই আছে দেখ ত।

পঞ্চানন দরখাস্তের পাতা উল্টাইয়া বলিল—প্রথমেই সই আছে পতে হাড়ির। দরখাস্তখানাও সেই বেটারই হাতে লেখা! ও! হয়েছে! তাই ও লোকের বাড়ী-বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল! জিজ্ঞাসা করাতে বললে মাথট আদায়ের বন্দোবস্ত করছি! মাথটের বদলে এইবার ওর মাথাটা নেবো তবে আমার নাম পঞ্চানন ভটচায!......এই চাপরাশী, কাছারীতে পতিত মণ্ডল এসেছিল, যদি থাকে, ডেকে নিয়ে এস।

চাপরাশী চলিয়া গেল। গুণময় ও পঞ্চানন রাগে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

পতিত চাপরাশীর সঙ্গে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই গুণময় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—চাপরাশী, শালাকে পাঁচশো জুতো গুনে লাগাও!

পতিত আশ্চর্য্য হইয়া একবার গুণময় ও একবার পঞ্চাননের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—হুজুর, আমার কি অপরাধ!

গুণময় বলিয়া উঠিলেন—এখন নেকা সাজছিস পাজি! বিনাসপুরের এলাকায় উঠে গিয়ে যে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছিলি! কেমন শিক্ষা আমি তোকে দিয়ে দি ছাখ! মারো জুতো!

পতিত চকিতে একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিল দরজার পাশে পঞ্চাননের একগাছা বাঁশের লাঠি ঠেসানো রহিয়াছে। চট করিয়া সেই লাঠিগাছা ধরিয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তারপর বলিল—খবরদার বাবু, আমরা মরীয়া হয়ে উঠেছি, মরীয়ার মাথায় খুন চাপাবেন না; আমার গায়ে কেউ হাত দিতে এলে আপনাদের ত্বজনকে আমি আস্ত রাখবো না। আমি হাড়ির ছেলে, হাতে লাঠি পেয়েছি, খবরদার!

মহরমের সময় পতিত হাড়ির লাঠি খেলা গুণময় বহুবার দেখিয়া তারিফ করিয়াছেন; পতিতের কথা শুনিয়া গুণময় বা পঞ্চানন কাহারো আর বাক্য সরিল না। পতিত সেই অবসরে বৈঠকখানা হইতে জমিদার-বাড়ীর হাতা ছাড়াইয়া নিজের গ্রামের পথ ধরিল; পথে যাহাকে দেখিতে পাইল খবর দিয়া গেল বাবু তাহাদের দরখাস্তের খবর পাইয়াছেন, এখন নিজেরা খবরদার!

পতিত চলিয়া গেলে গুণময় গর্জ্জিয়া বলিলেন—একশো লেঠেল লাগিয়ে সব কজনকে ধরিয়ে আনাও, ওদের জরুবেটিকে বে-ইজ্জত করো, ঘরে আগুন লাগাও! যে নাকে খৎ দিয়ে একশো টাকা জরিমানা দেবে সেই কেবল রেহাই পাবে!

সে এইবার উহা পড়িতে পাইবে! দয়াদেবীর সমস্ত চিঠি পড়া ও লেখার কাজ ত রাজবালাই করে। আগ্রহে রাজবালার সমস্ত দেহমন উৎসুক হইয়া উঠিল। কিন্তু দয়াদেবী এ চিঠিখানি নিজেই চোখ বুলাইয়া মনে মনে পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তারপর একে একে ভাঁজে ভাঁজে পাট করিয়া খামে ভরিয়া চিঠিখানি মাথার বালিশের তলায় রাখিয়া দিলেন।

রাজবালা আর সেখানে থাকিতে পারিল না, উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিল।

দয়াদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় যাচ্ছিস্?

রাজবালা মুখ না ফিরাইয়াই "আসছি" বলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মায়ার পড়িবার ও খেলিবার ঘরে গিয়া রাজবালা, কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল; আর টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই ঘরে একটা বড় দেরাজের পিছনে বসিয়া মায়া আপনার পুতুলের সংসার গোছাইতেছিল। ঘরে কান্নার শব্দ শুনিয়া ঝুঁকিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল; তারপর আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিয়া রাজবালার পিঠে হাত দিল। রাজবালা চমকিয়া মাথা তুলিয়া দেখিল মায়া! মায়া গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া আছে। রাজবালা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মায়া রাজবালার হাত ধরিয়া মুখ তুলিয়া করুণা-ভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ ভাই মাসী, তুমি বীরেনদার জন্যে কাঁদছিলে?

রাজবালা আবার বসিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। মায়া আস্তে আস্তে গিয়া ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া বলিল—বাবার পায়ে আজকাল আবার জুতো নেই, কখন এসে

পড়বে !—বীরেন-দাদাকে ও দুটি চক্ষে দেখতে পারে না। বীরেন-দাদার জন্যে আমারও ভাই বড্ড মন-কেমন করে। বীরেন-দাদা কবে আসবে ভাই মাসী ?

আজ মায়াকে ব্যথার ব্যথী দেখিয়া রাজবালার কান্না যেন উথলিয়া পড়িতে লাগিল। সে অস্ফুট স্বরে বারবার বলিতে লাগিল—সে আর কখনো আসবে না রে, আর কখনো আসবে না।

মায়া মুখখানি ম্লান করিয়া তাহার কান্না দেখিতে-দেখিতে বলিয়া উঠিল—আমিই বীরেন-দাদাকে তাড়ালাম।

অতটুকু মেয়ে শোকের আওতায় প্রৌঢ়ার মতন ভারিক্কি হইয়া উঠিয়াছে ; শিশুর মুখে দুঃখের কথা বড় বেশী-রকম করুণ সুরে বাজে। রাজবালা মায়ার কথায় ব্যথিত হইল ; তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া মায়াকে কোলের কাছে টানিয়া তাহাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না, তুমি তাকে তাড়াবে কেন ?—তুমি যে তাকে ভালোবাস। তোমার বিয়ের সময় সে নিশ্চয় আসবে, তখন দেখা হবে।···তুমি খেলা করো, আমি দিদির কাছে যাই, দিদি একলা আছেন।

মায়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—তাহার মাসী ত বেশ, তবে কেন সে মাসীর হিংসা করিয়া এমন অনর্থ ঘটাইল।

বীরেন্দ্রের ব্যবধান সরিয়া যাওয়াতে মায়া দেখিতেছিল যে তাহার মাসীর মনটি তাহার প্রতি মমতায় ভরা, দুজনেরই দুঃখ একজনের অভাবে, তাই তাহারও মন ক্রমশঃ মাসীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

রাজবালা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল দয়াদেবী চোখ মুদিয়া শুইয়া আছেন। রাজবালা থমকিয়া দাঁড়াইল ; সে বুঝিতে চাহিল তিনি ঘুমাইয়াছেন কি না ; রাজবালা আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া গিয়া

খাটের কাছে দাঁড়াইল, তবু দয়াদেবী চোখ মেলিলেন না; রাজবালা খাট প্রদক্ষিণ করিয়া দয়াদেবীর মাথার বালিশের কাছে গিয়া দাঁড়াইল; তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার বুকের ভিতরকার ধড়াস ধড়াস শব্দে দয়াদেবী এখনি চমকিত হইয়া চাহিবেন; কিন্তু দয়াদেবী তখনও চোখ মেলিলেন না; তাঁহার মুখের দিকে দেখিয়া-দেখিয়া রাজবালা একবার ঠোঁট চাটিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া ধীরে ডাকিল—দিদি! তবু দয়াদেবী চোখ মেলিলেন না; তখন আবার এদিক ওদিক চাহিয়া রাজবালা অতি সন্তর্পণে দয়াদেবীর মাথার বালিশের তলা হইতে বীরেন্দ্রের চিঠিখানি টানিয়া বাহির করিল, তারপর সেখানিকে মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া একবার দয়াদেবীর দিকে একবার ঘরের দরজার দিকে তাকাইয়া খাটের পাশে বসিয়া পড়িল। তখন তাহার বুকের মধ্যে এমনি ঢিপ ঢিপ শব্দ করিতেছিল আর তাহার চোখ মুখ দিয়া এমন আগুন ছুটিতেছিল যে সে খানিকক্ষণ চিঠিখানা কোলের উপর মুঠি করিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। একটু দম লইয়া সে আস্তে-আস্তে খাম হইতে কাগজখানি বাহির করিয়া ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে লাগিল, বীরেন দয়াদেবীকে লিখিয়াছে—

মা,

আপনার আশীর্ব্বাদে আমি পাশ হব, এগজামিন ভালো দিয়েছি। আপনার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আপনার সেবা করবার সৌভাগ্য আমার আর হবে না। এই দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা পাচ্ছি এই ভেবে যে আমি না থাকলেও আপনার শুশ্রূষার ত্রুটি ও অভাব হচ্ছে না। মায়াদের আমার কথা বলবেন; তাদের আমি কখনো ভুলতে পারব না। আমি জেলায় যাচ্ছি, সেখানে ওকালতী করবার জোগাড় এখন থেকেই করব, আর সেখানে থাকলে আপনাদের খবর প্রায়ই

পেতে পারব। মায়াদের বিয়ে হলে আমাকে খবর দেবেন, মায়ার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মায়াকে দেখে আসব।

আপনার স্নেহের ছেলে বীরেন।

চিঠিখানি পড়িতে-পড়িতে রাজবালার ঠোঁট কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সে জোর করিয়া কান্না থামাইয়া বারবার সেই চিঠিখানি পড়িল। চিঠির মধ্যেও কোথাও একটি বারও তাহার নাম নাই; এই অনুল্লেখই রাজবালাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিল সে বীরেন্দ্রের মনের কোন্ জায়গাটি অধিকার করিয়া আছে;—বীরেন যে লিখিয়াছে "এই দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা পাচ্ছি এই ভেবে যে আমি না থাকলেও আপনার শুশ্রূষার ত্রুটি ও অভাব হচ্ছে না", সে কাহার কথা ভাবিয়া? "মায়াদের" "তাদের" প্রভৃতি বহুবচনে মায়ার সঙ্গে আর কাহার নাম বীরেন্দ্রের মনে জাগিয়াছিল? তাহা বুঝিতে রাজবালার বাকী থাকিল না। কিন্তু তবুও তাহার অভিমানে ঠোঁট ফুলিতেছিল এই ভাবিয়া যে সে একটিবারও তাহার নাম করিল না!

অনেক কষ্টে সে আপনাকে সামলাইয়া চিঠিখানি খামে ভরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; দেখিল দয়াদেবী তখনও চোখ মুদিয়া তেমনি শুইয়া আছেন। রাজবালা আস্তে-আস্তে চিঠিখানি বালিশের তলায় রাখিবে বলিয়া বাঁ হাতে বালিশের একটা কোণ যেই একটু উঁচু করিয়া ধরিয়াছে অমনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দয়াদেবী বলিলেন—চিঠিখানা তোর কাছেই রেখে দে, তুইই একটা জবাব লিখে দিস, আমি মোহিনীকে দিয়ে চুপিচুপি ডাকে ফেলিয়ে দেওয়াব।

দয়াদেবী কথা বলিতেই রাজবালা ভয় পাইয়া চমকাইয়া উঠিয়াছিল; তারপর যখন দেখিল যে তাহার চুরি ধরা পড়িয়া গেছে ও তাহার দিদি উহার অন্তরের পরিচয় পাইয়া তাহার দুঃখে মমতা দেখাইতেছেন,

তখন লজ্জায় দুঃখে ও সুখে অভিভূত হইয়া রাজবালা মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দয়াদেবীর মাথার বালিশের পাশে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দয়াদেবী তাহার দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

এমন সময় মায়া ঘরে আসিয়া দেখিল তাহার মাসী তখনো কাঁদিতেছে। দয়াদেবী পায়ের শব্দ শুনিয়া তাহার দিকে ফিরিতেই মায়া ছুটিয়া মায়ের কাছে আসিয়া বলিল—মা, বীরেনদাদাকে ফিরিয়ে আনো। বীরেনদাদার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে,—বলিতে-বলিতে সেও কাঁদিয়া ফেলিল। দয়াদেবীরও চোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

(২৪)

আজ সাঁড়াশিয়া গ্রামের হাটবার। হাটে তেমন লোক জমে নাই। কাহার ঘরে কি আছে যে বিক্রয় করিতে আনিবে, কাহার ঘরে কি সঙ্গতি আছে যে তাহা দিয়া দিন গুজরানের জিনিসই কিনিতে আসিবে? দেশে যে ভয়ানক অজন্মা, অভাব যে ঘরে ঘরে, দুর্ভিক্ষ যে কঙ্কাল-মূর্তিতে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতেছে। যে অল্প কয়েকজন লোক হাটে আসিয়াছে তাহাদের কেহ বা বলদ গরু হাল লাঙ্গল পর্য্যন্ত বেচিতে আসিয়াছে, কেহ বা পাট প্রভৃতি যাহা খাদ্য নয় তাহা বেচিয়া দুটি চাল সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে, আর কেহ বা কাচ্চাবাচ্চার শুকনো মুখে চোখের জল দেখিতে না পারিয়া ধারে কিছু খাবার সংগ্রহ করিতে পারে কি না দেখিবার জন্য হাটময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিড় বাড়াইতেছে।

হাটখোলার ঠিক মাঝখানে রক্ষাকালীর ছোট্ট একটি মন্দির। সেই

মন্দিরের দালানের নীচে রকে দাঁড়াইয়া পতিত হাড়ি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ভাইসব, তোমরা শোনো……

হাট হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া গেল ; পরক্ষণেই দ্বিগুণ কলরব উঠিল—চুপ্ চুপ্, পতিত মণ্ডল কি বলছে শোন্……আঃ গোলমাল করিস্ কেন……একটু থাম না……চ চ এগিয়ে চ, কি বলছে শুনি……

মিনিট পনেরো পরে কোলাহল একটু ক্ষান্ত হইলে পতিত আবার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—ভাইসব, তোমরা শোনো। দেশে অজন্মা আকাল হয়েছে, আমরা মরতে বসেছি। এখন এর ওপর জমিদার বাজে-আদায় কোরে অত্যাচার করতে চাচ্ছে ; প্রাণ যখন যেতেই বসেছে তখন এস আমরা মরদের মতন মরি, এই মা-কালীর থান ছুঁয়ে দিব্যি করি, আমরা কিছুতেই জমিদারের ন্যায্য পাওনা ছাড়া এক পয়সাও উপরি বেশী দেবো না, প্রাণ গেলেও না।……

জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠিয়া ক্রমে কলরব বাড়িতে লাগিল—পতে মোড়ল ক্ষেপেছে নাকি ?…বলা সোজা, ম্যাওধরা কি অমনি কথার কথা !…… বাবা ! জমিদারের সঙ্গে কাজিয়ে ! সর্ব্বরক্ষে ! কি বুকের পাটা রে !……

পতিত হাড়ি দুই হাত উঁচু করিয়া সকলকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া আবার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—ভাইসব, আমার কথা কটা শেষ করতে দাও। জমিদার ত জমি সৃষ্টি করেনি, জমিদার ত জমির চাষ আবাদ করে না, তবে জমির মালিক সে কিসে? আমরা মাটি চষি, মাটি মাখি, মাটি-মায়ের বুকের দুধে আমাদেরই হকের দাবী ! জমিদার আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি করে, আর আমরা হা অন্ন জো অন্ন কোরে মরি। কিন্তু রাজার আইন যখন জমিদারকেই জমির মালিক করেছে, নাচার আমরা জমিদারকে তার

ন্যায্য পাওনাটুকুই দেবো, তার বেশী এক কড়া না। তোমরা দিব্যি করতে রাজি আছ ?……

পতিত চুপ করিল। জনতার মধ্যে আবার গুঞ্জন কলরবে ও কলরব কোলাহলে পরিণত হইল।—মোড়লের পো কথাগুলো বলছে ত ঠিক, কিন্তু…আরে পেটে নেই ভাত, লড়ব কিসের জোরে ?…হ্যাঁঃ অমন গোলাভরা ধান আর সিন্দুক ভরা টাকা থাকলে আমরাই কি জমিদারকে ডরাতাম নাকি ?……

পতিত আবার ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এত লোকের মধ্যে কি একজনও নেই যে সাহস কোরে বলতে পারে 'না, অন্যায় জুলুম বরদাস্ত করবো না !'…আমি তবে একলাই দাঁড়ালাম জমিদারের বিপক্ষে—না, আমি একলা নই, আমরা চারজন,—আমার বুড়ো মা, আমার বিধবা বোন, আর আমার স্ত্রী—তারাও এসেছে, মাকালীর মন্দির ছুঁয়ে দিব্যি করছে, প্রাণ দেবে তবু দেশের লোকের ওপর অত্যাচার হতে দেবে না, জমিদারের অন্যায় হুকুম শুনবে না, মানবে না।……

সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল মন্দিরের দালানের এক পাশে তিনজন স্ত্রীলোক ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জনতার মধ্যে মহা কোলাহল উঠিল—আমরাও ত দিব্যি করতে পারি, কিন্তু আমরা জেলে গেলে কাচ্চাবাচ্চা খাবে কি, দাঁড়াবে কোথায় ? মেয়েলোকের বে-ইজ্জত করতে এলে তাদের রক্ষে করবে কে ?……

জনতা ভেদ করিয়া কালীর মন্দিরের রোয়াকের উপর হাত রাখিয়া কাৎলামারী গ্রামের শশী জেলে মোটা গলায় চীৎকার করিয়া উঠিল—মা-কালীর দিব্যি মোড়লের পো, আমি তোমার দিকে, আমার সাত ছেলে, আট ভাইপো, সবাই তারা লাঠি ধরতে পারে।

শশী জেলে তাহার প্রকাণ্ড কালো দেহটা সোজা খাড়া করিয়া

সিংহের কেশরের মতন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল যখন মাথা ঝাড়া দিয়া ফুলাইয়া তুলিল, তখন সমস্ত জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—জয় কালীমাঈকী জয় !

সেই কোলাহল থামিতে-না-থামিতে থাকো তাঁতিনী মুখের উপর একটু ঘোমটা টানিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া মন্দিরের রোয়াকে মাথা ঠেকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ মিহি স্বরে বলিল—আমার সোয়ামীকে পেঁচো বামনা বীরেন রায়ের নামে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বলেছিল ; তিনি রাজি না হওয়াতে তানার বুকে বাঁশ দিয়ে দলেছিল ; সেই থেকে মুখে রক্ত উঠে তানার পেরাণডা গেল ; সেইদিন সোয়ামীর চিতার কাছে দাঁড়িয়ে আমার ছেলে ক্যাবলার মাথায় হাত দিয়ে আমি দিব্যি করেছিলাম পেঁচো বামনার রক্তদর্শন করবই করব। মা-কালী আজ রক্ত চাইছেন, সে রক্ত আমি এনে দেবো।

জনতা আবার ক্ষিপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—জয় কালীমাঈকী জয় !......মার মার পেঁচো পাজীকে মার ! সেই শালাই ত যত নষ্টের গোড়া !......চল্ জমিদারবাড়ী লুট করি, জমিদারের মায়ের ছেরাদ্দের সঙ্গে জমিদারেরও ছেরাদ্দের জোগাড় করে দিয়ে আসি, আমাদের খালি পেটে দুটো ভালো মন্দ জিনিসও পড়বে !......

দেখিতে দেখিতে কত মেয়ে পুরুষ যে কালী-মন্দিরের রোয়াক ছুঁইয়া শপথ করিয়া পতিতকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল তাহার আর ঠিকানা থাকিল না।

পতিত আবার হাত তুলিয়া সকলকে নিরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল—দেখ ভাই, আমরা অন্যায়ের প্রতিকার করতে চাই, অন্যায় আমরা করব না। আঘাত বাঁচাব, আঘাত করব না ; রক্ত যদি পড়ে, আগে আমাদেরই পড়বে ; আমরা শুধু অত্যাচারে বাধা দেবো, অত্যাচার

প্রাণ গেলেও করব না। খালি পেট ভরাবেন মা অন্নপূর্ণার বেশে মা কালীই! অন্যায় করলে রক্ষাকালী কাউকে রক্ষা করেন না। যারা অন্যায় কাজে বাধা দেবে কিন্তু অন্যায় করবে না, তারা সব আমার ভাইবোন; আমার গোলায় যা মজুদ আছে তাতে তাদের সকলের সমান ভাগ, আমার যা পুঁজিপাটা আছে তাতেও তাদের সমান অধিকার —মা-কালী সাক্ষী, আমার যা কিছু মজুত আছে তা আমার একলার নয়, তা তোমাদের সকলকার!......

হাটখোলা ভরিয়া উচ্চরোল উঠিল—জয় কালীমাঈকী জয়! জয় পতিত মোড়লের জয়!

দেখিতে দেখিতে হাটের সকল লোকই পতিতের পক্ষ হইয়া গেল; যে শুষ্ক মুখে সমস্ত দিন হাটে ঘুরিয়াও নিজের কাচ্চাবাচ্চার মুখে দিবার মতন কিছুই জোগাড় করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারও মুখ আনন্দে আশায় উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাট ভাঙিয়া সকলে দল বাঁধিয়া পতিতের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গেল—পতিত আজ আর অস্পৃশ্য হাড়ি নয়, সে আজ অন্নদাতা পরিত্রাতা।

(২৫)

রাত পোহাইতে-না-পোহাইতে এই খবর দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল—সমস্ত দেশে উৎসাহের বিদ্রোহের আগুন ধরিয়া উঠিল; একটা সামান্য লোক অন্যায় প্রতিকারের জন্য সমস্ত স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিয়া প্রবল দুঃখ ও নির্য্যাতনের ক্লেশ সহ্য করিতে দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া দেশের সকল নরনারী ইতরভদ্র সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল; অন্যায়ে উৎপীড়িত হইয়া সকলকার অন্তরের সঞ্চিত অসন্তোষ জড়তাবশে সুপ্ত

হইয়া ছিল, একজনের চেতনার সাড়া পাইয়া সর্ব্বত্র চেত সকলকে খুব
হইয়া পড়িল। রতে যে

কথাটা শুনিয়া পঞ্চানন মুচকি হাসিল। গুণময় শঙ্কিত হ ছে,
পঞ্চাননকে ও হংসেশ্বর দারোগাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পঞ্চানন আসিতেই গুণময় শুষ্ক মুখে ভীত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—এসব কি হচ্ছে পাঁচুদা?

পঞ্চানন তাহার লম্বা নাক সিঁটকাইয়া তাচ্ছিল্য দেখাইয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে!' মরণ ঘনিয়ে এসেছে—ওদের যথাসর্ব্বস্ব আমাদের দিয়ে ওরা মরবে, তারই জোগাড় করছে।

পঞ্চাননের পরম নিশ্চিন্ত অবজ্ঞার ভাব দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া গুণময় বলিলেন—তুমিই আমার বল বুদ্ধি ভরসা দাদা, দেখো যেন কোনো ফ্যাসাদে না পড়তে হয়।

পঞ্চানন আশ্বাস দিয়া বলিল—সে তোমাকে ভাবতে হবে না ভায়া। পাঁচশো লোক আমাদের জমিদারী থেকে উঠে যাবে বোলে রসময় বাবুর কাছে দরখাস্ত করেছিল, তার মধ্যে তেইশ জনের কাছ থেকে একশো টাকা কোরে জরিমানা আদায় হয়ে গেছে; ছত্রিশ জন অর্দ্ধেক দিয়ে কিস্তিবন্দি করেছে; একশো উনচল্লিশ জন একশো টাকার তমসুক লিখে দিয়ে গেছে; বাকী কজন পতে হাড়ির পাল্লায় পোড়ে এখনো মাথা ঘোরাচ্ছে বটে, কিন্তু পালের গোদাটাকে ঘায়েল করতে পারলে সব বেটাই কাবু হয়ে পড়বে।

গুণময় পঞ্চাননের কর্ম্মকুশলতায় খুসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—পতেটাকে ঘায়েল করবার কি মতলব করেছ?

পঞ্চানন বলিল—মতলব ঠিক হয়ে আছে ভায়া, কেবল কর্ত্তামায়ের

প্রাণ গেলেও ক

কানাই ! ... গেলেই হয়। পতের দলের সঙ্গে গোটা দুই দাঙ্গা বাধাতে অন্যায় ... তাইতে ওদের দলের দুএকটা জখম হবে পাঁচসাতটাকে জেলে ভা...ঠাবো, তখন বাকীগুলো ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে সুড়সুড় করে ছুটে এসে স...আপনা থেকেই পায়ে পড়বে। কিন্তু তার আগে হংসেশ্বর দারোগাকে হাত করতে হবে।

গুণময় বলিলেন—আমি ওকেও ডাকিয়ে পাঠিয়েছি; এলে তুমিই তার একটা ব্যবস্থা করে ফেলো······

হংসেশ্বর দারোগা ঘরে ঢুকিয়া খুব নত হইয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই পঞ্চানন কুকুরের মতন লম্বা লম্বা শাদা শাদা দাঁত বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে দারোগাবাবু, নাম করতেই এসেছেন, আপনি অনেকদিন বাঁচবেন।

গুণময় তাঁহার বাঁধানো দাঁত দুপাটি বাহির করিয়া বলিলেন—আসতে আজ্ঞে হোক, আসতে আজ্ঞা হোক।···ওরে চতুর, দারোগা-বাবুকে তামাক দিয়ে যা।

হংসেশ্বরের চেহারাটি ঠিক্ উটের মতন—পা দুখানা ধড়ের তুলনায় অতিরিক্ত লম্বা, হাত দুখানি নলি-নলি, পেটটি ডাগর, মাথাটা ছোট, কান দুটো খুব লম্বা, গলাটা কাস্তের মতন বাঁকা ও মস্ত একটা কণ্ঠা ওঠা; রংটি মেটে—না কালো, না ধলো; চোখ দুটো ড্যাবা-ড্যাবা গোল-গোল, গাঁজাখোরের মতন লাল; নাকটা খাঁদা; তার নীচে প্রকাণ্ড পুরু ঠোঁটের উপর একজোড়া বিপুল গোঁপ; সম্প্রতি তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে বলিয়া ক্ষৌরী করা হয় নাই, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজাইয়াছে, বয়স তাহার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর।

হংসেশ্বর ফরাসে বসিয়া গড়গড়ার শটকা নল হাতে লইয়া বলিল—আজকাল যত সব ছোটলোকের বড় বাড় বেড়েছে। পতিত হাড়ি

বোলে আপনার একটা প্রজা কাল সাঁড়াশিয়ার হাটে নাকি সকলকে খুব ক্ষেপিয়েছে। আজ সকালেই এসেছিল থানায় এত্তেলা করতে যে জমিদারের তরফ থেকে আমাদের ওপর জুলুম হবার সম্ভাবনা আছে, পুলিশের আশ্রয় চাই। আমি বেটাকে খুব কোরে ধমকে কড়্‌কে দিয়েছি যে সে বেশী ট্যাফোঁ করলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা বোলে তাদেরই ধোরে ধোরে চালান দেবো আর আদালতে মুচলেকা লিখে দিয়ে তবে ছাড়ান পাবে।

হংসেশ্বরের কথা শুনিয়া ও অযাচিত ভাবে তাহাকে নিজেদের পক্ষে পাইয়া গুণময় ও পঞ্চানন খুসী হইয়া গেল। গুণময় চোখ টিপিয়া পঞ্চাননকে ইসারা করিলেন—এই সুযোগে তুমি কথাটা পাড়িয়া ফ্যালো। পঞ্চানন ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল না, সে গম্ভীরভাবে বলিল—আপনি ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের মতন কাজই করেছেন। বেটা ছোট-লোক হাড়ি, একটু লেখাপড়া শিখেছে, উড়তে পারে না ফুরফুর করছে। আপনারাই হচ্ছেন দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনকর্ত্তা, আপনারা শাসন কোরে দিলে ছোটলোকে মাথা তুলতেই সাহস করবে না।······আপনি চিরকাল ন্যায়ের পক্ষে, আমরা জানি। তাই মালিক আপনার সঙ্গে ঐ বিষয়েই একটা পরামর্শ করবেন বোলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।··· পতেটাকে শাসন করবার কি উপায় করা যায় বলুন দেখি?······

হংসেশ্বর ঘাড়-নাড়া পুতুলের মতন লম্বা গলা উপরে নীচে ঠকঠক করিয়া নাড়িয়া বলিল—কোনো একটা অছিলায় ওকে ফৌজদারীতে ফেলে দিতে পারলেই ও কাবু হয়ে যাবে।

পঞ্চানন দিব্য সপ্রতিভ ভাবেই হংসেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমরা কোনো ছুতোয়-নাতায় ওদের সঙ্গে একটা দাঙ্গা বাধিয়ে দেবো; সেই সময় আপনি পুলিশ নিয়ে গিয়ে ওদের গ্রেপ্তার কোরে

চালান দেবেন। এই উপকারের জন্যে সরকার থেকে আপনাকে পান খেতে একশো টাকা দেওয়া যাবে।

হংসেশ্বর অপ্রসন্ন মুখে হাসিয়া বলিল—আমি ত রায় মশায়ের নিমক ঢের খেয়েছি আরো খেতে পাব আশা রাখি। কিন্তু অত অল্পে আমাদের পেট ভরবে না ভট্‌চায্যিমশায়।

পঞ্চানন সপ্রতিভভাবে বলিল—ওটা বায়না মাত্তর, পরে আপনাকে খুসী না কোরে কি আমরা ছাড়বো।

হংসেশ্বর পাকা কাজের-লোকের মতন বলিল—সেইটে এখনই ঠিক হয়ে যাওয়া ভালো—কি বলেন আপনি রায় মশায়।

গুণময় টাকা খরচের সম্ভাবনায় কাতর হইয়া কেবল মাথা নাড়িতে লাগিলেন। পঞ্চানন বলিল—তা আপনার স্ত্রীর শ্রাদ্ধ আর আপনার বিয়ের খরচের জন্য বাবু আপনাকে পাঁচশো টাকা দিবেন।

হংসেশ্বর খুসী হইয়া বলিল—আর জমাদার, রাইটার, আর কনেষ্টবল চৌকীদারদের? তাদেরও ত কিছু দেওয়া উচিত।—সেও পাঁচশো ধোরে রাখুন।

গুণময় আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—পাঁচশো!

হংসেশ্বর বলিল—আজ্ঞে পাঁচশোর কমে হবে না, ভাগ হলে ফি-জনে কুড়ি-পঁচিশ টাকার বেশী পড়বে না।

গুণময় পঞ্চাননের মুখের দিকে চাহিলেন। পঞ্চানন হংসেশ্বরকে বলিল—আচ্ছা পাঁচশোই দেবো, কিন্তু আপনাদের খুব হুঁসিয়ার হয়ে গোড়া বেঁধে কাজ করতে হবে।

হংসেশ্বর খুসী হইয়া বলিল—সে আর বলতে হবে কেন?......তা দেখুন, জমাদারদের পাঁচশো টাকাটাও আমারই হাতেই দেবেন।...... পাঁচশো আগাম, চালান হয়ে গেলে বাকী পাঁচশো আমি হাতে চাই।

পঞ্চানন বলিল—যে আজ্ঞে, কর্ত্তামায়ের শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে আপনি কোনো দিন কাছারীতে একবার যদি অনুগ্রহ করে আসেন প্রথম কিস্তির টাকাটা দিয়ে দেবো। বলেন [illegible] আমিই দিয়ে আসবো।—

—আপনাকে আর কষ্ট কোরে যেতে হবে না, আমিই আসবো—বলিয়া হংসেশ্বর প্রসন্ন হইয়া চলিয়া গেল।

গুণময় বলিলেন—এতটা টাকা খরচ!

পঞ্চানন বলিল—ভয় কি ভায়া, ঐ পত্তে মোড়লের বাড়ী লুটেই সব টাকাটা উশুল করে নেবো।

(২৬)

চিনিবাস তাঁতি ভোরে উঠিয়া পাড়ায় বাহির হইয়াছিল যদি কাহারো কাছে কিছু খাবার জিনিস বা টাকাটা সিকেটা ধার পায়; আজ একমাস হইল তাহাদের তাঁত বন্ধ আছে, ঘরে এক খেই সূতারও সঙ্গতি নাই। তাহার উপর তাহার ছেলে ছিদাম, পতিত হাড়ির পাল্লায় পড়িয়া, রসময়-বাবুর জমিদারীতে উঠিয়া যাইবার দরখাস্তে সই করিয়াছিল; জমিদারের কোপ হইতে ছেলেকে বাচাইবার জন্য বৃদ্ধ চিনিবাস ঘটীবাটি বেচিয়া হালনাগাদ খাজনা ও মাথট শোধ করিয়াছে এবং বাপে বেটায় মিলিয়া জরিমানার একশো টাকার জন্য জমিদারকে তমসুক লিখিয়া দিয়া আসিয়াছে। বুড়ার ঘরে খাইবার লোক অনেকগুলি—নিজে, নিজের স্ত্রী, বেটা, বেটার বৌ, ছেলের ছেলে বেচারাম, দুই বিধবা মেয়ে দাখো ও থাকো, এবং থাকোর ছেলে কেবলরাম। আজ একমাস একটি পয়সা কামাই নাই, অজন্মার দিনে পেটচলা দায় হইয়াছিল, তাহার উপর কমবক্তা ছেলেটা জমিদারের সঙ্গে কাজিয়া করিতে গিয়া অবস্থা আরো সঙ্গিন করিয়া তুলিয়াছে।

বুড়া মানুষ শীতে হিহি করিতে-করিতে ছেঁড়া কাঁথাখানি দুই হাতে গায়ের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া পথে-পথে শুষ্ক কাতর মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। শেষা পৌষের শীতের ঠেলায় সবাই যে যার ঘরে জড়সড় হইয়া পড়িয়া আছে, এখনো অনেক ঘরের ঝাঁপই খোলা হয় নাই। এমন সময় জমিদার-কাছারীর সর্দ্দার-পাইক জিতু সর্দ্দার মাথায় লাল শালুর পাগড়ী বাঁধিয়া লম্বা লাঠি ঘাড়ে ফেলিয়া হনহন করিয়া সেইখানে আসিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে চিনিবাস-খুড়ো! তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

জমিদারের পাইক সকালে উঠিয়া তাহার কাছেই আসিতেছিল শুনিয়া চিনিবাসের শুষ্ক মুখ অধিকতর শুষ্ক ও কাতর হইয়া উঠিল; সে ভয়ের ব্যাকুলতা মনে যথাসাধ্য দমন করিয়া বলিল—কেন বাবা, কোনো বরাত ছিল কি?

—হ্যাঁ, বরাত নইলে এত ভোরে এই জাড়ে কে সাধে সুখে বেরোয় বলো? ভাগ্যিস পথে দেখা হয়ে গেল, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

জমিদারের বাঁধা-বেতনে নিশ্চিন্ত, গরিব প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া খোরাকী ও ঘুষ আদায় করিয়া পুষ্ট পাইককে চিনিবাস বলিতে পারিল না যে বাড়ীতে তাহার আহারের সংস্থান নাই তাই লোকের দ্বারে-দ্বারে দয়ার প্রত্যাশী হইয়া ঘুরিতেছিল; সে শুধু বলিল—কোথাও যাইনি বড়, গোরুটোর জন্যে দু আঁটি বিচুলির তল্লাসে বেরিয়েছিলাম।

জিতু সর্দ্দার বলিল—নায়েব-মশায় তোমাদের বাপ-বেটাকে তলব করেছেন, জরুরী তলব, এখনি যেতে হবে।

চিনিবাসের বুক কাঁপিয়া উঠিল—আবার নায়েব-মশায়ের তলব? শুষ্ক মুখে কাতর দৃষ্টিতে জিতুর মুখের দিকে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কিসের জন্যে জানো কি বাবা?

জিতু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল—সে গেলেই টের পাবে। নাও, ছিদামকে ডেকে নেবে আর আমার খোরাকীটা দিয়ে দেবে চলো।

হায় রে দারুণ অদৃষ্ট! নিজের খোরাকীর জোগাড় করিবার জন্ম যে পরের কাছে হাত পাতিতে বাহির হইয়াছিল সে জমিদারের সর্দ্দার-পাইককে খোরাকী জোগাইবে কোথা হইতে? চিনিবাসের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল, তাহার বুড়া শরীরের অল্প রক্তটুকুও হিম হইয়া দ্বিগুণ শীতে হাড়ের মধ্যে কম্প ধরাইয়া দিল। চিনিবাস জিতুর কাছে হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবা, কাল থেকে ঘরে হাঁড়ি চড়েনি, বেচা ক্যাবলা দুধের ছেলে দুটো পর্য্যন্ত উপোষ কোরে রয়েছে, তাই সকালে তাড়াতাড়ি কোথাও থেকে কিছু খাবার জোগাড়ে বেরিয়েছিলাম। তোমার খোরাকী দিতে কোথায় পাবো বাবা?

জিতু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল—এই বললে গোরুর খড় জোগাড় করতে যাচ্ছ, আবার বলছ খাবার জোগাড়ে বেরিয়েছ! বুড়ো হয়ে মরতে চললে খুড়ো, এখনো বিহান পহরে মিথ্যে কথাটা মুখে বাধছে না?

চিনিবাস দুই হাতে জিতুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তোমার দিব্যি বলছি,……

জিতু বাধা দিয়া বলিল—থাক আর দিব্যি গালতে হবে না। নগদ না দাও গোরুটা আমি নিয়ে যাবো। চলো, বেলা বেড়ে যাচ্ছে, ছিদামকে ডেকে নাও আর আমার গোরুটা……

চিনিবাসের চোখ দিয়া জল পড়িল; সে থরথর-কম্পিত শীর্ণ শুষ্ক অস্থিচর্ম্মসার বড় বড় দুখানি হাত জোড় করিয়া বলিল—দোহাই তোমার সর্দ্দার, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মেরো না। মেয়ে বৌএর গয়নাগাঁটি, ঘর-সংসারের ঘটীবাটি সব গেছে, আছে সম্বল ঐ গোরুটি;

সেও খেতে না পেয়ে ধুঁকছে, তবু দুবেলায় দুপোয়া দুধ ছায়, তাই খাইয়ে বেচা আর ক্যাবলাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। ছিদামকে আজকের দিনটি ছেড়ে দাও, সে হাসিমপুরে সাধু মোড়লের বাড়ী ধান আছড়াতে যাচ্ছে, সেখানে যে ধানকটি পাবে তাই······

এমন সময় ছিদামও একখানা ছেঁড়া, ময়ূরকণ্ঠী রং হইতে ধূসর বর্ণে পরিণত রেপার গায়ে দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই জিতু বলিল—এই যে ছিদাম এসেছে। তা তোমরা এগিয়ে চলো, আমি গোরুটা নিয়ে আসি······

চিনিবাস আবার মিনতি করিয়া বলিল—গোরুটো তুমি নিয়ো না বাবা, তোমার খোরাকীর পয়সা ধার রইল, আমি দুদিন পরে শুধে দেবো। আর ছিদামকে ছেড়ে দাও বাবা, আমায় নিয়ে চল······

ছিদাম শুষ্ক মুখে জমিদারের যমদূতের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল, ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল।

জিতু বলিয়া উঠিল—বাপরে! তাও কি হয়! নায়েব-মশায় তোমাদের দু-জনকেই নিয়ে-যেতে বলেছেন।

চিনিবাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—মধুসূদন!

ছিদাম একটি কথাও বলিতে পারিল না, সে পাইক ও পিতার পিছনে-পিছনে কলের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল—সে ভাবিতেছিল, কি কুক্ষণেই আহাম্মকি করিয়া দরখাস্তে সই করিয়াছিল, যে, এখনো তাহার জের মিটিল না, অথচ তাহারা জেরবার হইয়া উঠিল।

চিনিবাস ও ছিদাম বলির পশুর মতন ভয়ে-ভাবনায় অনিশ্চিত ও অজ্ঞাত বিপদের প্রতীক্ষায় কাঁপিতে-কাঁপিতে জমিদারের সদর কাছারীতে গিয়া নায়েব পঞ্চাননকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন বাঁ-হাতে হুঁকা ধরিয়া মুখ লাগাইয়া টানিতে-টানিতে কি লিখিতেছিল; একবার

আড় চোখে আগন্তুকদের দেখিয়া লইয়া লিখিতেই লাগিল। চিনিবাস ও ছিদাম হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তবু নায়েব-মশায়ের নেক-নজর গরিবদের উপর পড়িল না। ঝাড়া আধ-ঘণ্টা পরে লেখা শেষ করিয়া পঞ্চানন হুঁকাতে খুব জোরে কষিয়া গোটা-দুই টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া হুঁকাটা বৈঠকে রাখিয়া দিল। চিনিবাস ও ছিদাম নায়েব-মশায়ের হুকুম শুনিবার জন্য তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন তাহাদের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া বড় বড় খেরুয়া-বাঁধানো খাতা লিখিতে ব্যাপৃত কর্ম্মচারীদের দিকে চাহিয়া বলিল—তামাক সেজে আনলি ? দে হুঁকোটা এনে, একটা টান দিয়ে যাই।

খেদাই হুঁকায় কল্কে চড়াইয়া নায়েব-মশায়ের সম্মুখে বাঁ হাত ডাহিন হাতের কনুইএর কাছে ঠেকাইয়া ডাহিন হাতে হুঁকা বাড়াইয়া ধরিল। পঞ্চানন হুঁকা লইয়া খুব ঘন-ঘন কয়েকটা টান দিয়া খুব জোরে-জোরে দুটা টান দিল এবং খেদাইএর হাতে হুঁকা ফিরাইয়া দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাবুর বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল। চিনিবাস ও ছিদাম হতাশ হইয়া দালানের একপাশে বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পিতা বা পুত্র কাহারো মুখ দিয়া একটা কথাও সরিল না। যত বেলা বাড়িতেছিল বেচারাদের ভাবনাও তত প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে চিনিবাস চুপি-চুপি বলিল—ওরে ছিদাম, বেলা যে মবলগ হয়ে উঠল! বাড়ীতে কচি ছেলে দুটো যে খিদেয় ভূকচানি খাচ্ছেরে! কি হবে, অঁ্যা ?

ছিদাম ছল-ছল চোখে মুখ উঁচু করিয়া শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বুড়াও স্তব্ধ হইয়া বসিল।

বসিয়া-বসিয়া তাহারা দেখিতে লাগিল দারোগা-বাবু আসিল, বাবুর বৈঠকখানায় গেল; দারোগা-বাবু ফিরিয়া থানায় গেল; কাছারীর ঘড়ীতে এগারটা বাজিল, সেরেস্তার বাবুরা দপ্তর গুটাইয়া স্নানাহার করিতে বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু তখনো নায়েব-মশায়ের দেখা নাই, কি যে তাহাদের অপরাধ তাহা তাহারা এখনো জানিতে পারিল না এবং জুতার ঘায়ে শোধ করিয়া ছুটিও পাইল না।

বারোটা বাজিয়া গেল; কাছারীর পাহারা বদল হইল, তবু নায়েব-মশায়ের দেখা নাই। চিনিবাস পাহারাদারকে জিজ্ঞাসা করিল—নায়েব-মশায় কোথায় বলতে পারো?

উত্তর পাইল, নায়েব-মশায় বাড়ী গিয়াছেন, স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া তিনটার সময় কাছারীতে আসিবেন।

চিনিবাস ছিদামকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল—দুঃখু কি বাবা, বাড়ীতে থাকলেও উপোষ করতে হত এখানেও উপোষ করছি। এ বরং ভালো বলতে হবে যে কাচ্চা-বাচ্চাগুলো না খেতে পেয়ে ধড়ফড়িয়ে মরছে চোখের সামনে দেখতে হচ্ছে না।

ছিদাম কোনোই জবাব দিল না, ছাদের দিকে মুখ তুলিয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে-থাকিতে বৃদ্ধের ঢুলুনি আসিতেছিল; দালানের যে জায়গাটিতে রোদ আসিতেছিল সেইখানটিতে ক্ষুধায় কাতর বৃদ্ধ জড়সড় হইয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ছিদামও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিল। এক-এক ঘণ্টা অন্তর ঘড়ীতে ঘা পড়ে আর তাহারা চমকিয়া জাগিয়া উঠে, নায়েব-মশায় তখনো আসেন নাই দেখিয়া আবার ঝিমায়।

তিনটার পর পান চিবাইতে-চিবাইতে পঞ্চানন দশ-বারো জন কর্ম্মচারীতে পরিবৃত হইয়া কাছারীবাড়ীর সিঁড়িতে উঠিতে-উঠিতে

বলিতেছিল—জামাই বাড়ীতে এলে খাবার সুখটা খুব হয় হে! ওঃ, গণ্ডেপিণ্ডে গিলে এখন হাঁসফাঁস করছি—একটু ঘুমোনোও হলো না……

বারো জোড়া জুতোর ঠকঠক মশরমশর শব্দেও ক্লান্ত চিনিবাস ও ছিদামের ঘুম ভাঙে নাই, গুরু আহারের গল্পের কলরবও ক্ষুধায় অবসন্ন নিদ্রিতদের কানে পৌঁছে নাই। পঞ্চানন দালানে উঠিয়াই দুই লাথিতে দুজনকে চেতন করিয়া বলিয়া উঠিল—এটা তোদের আরাম কোরে ঘুম দেবার জায়গা, না?

ছিদাম বসিয়া-বসিয়া ঘুমাইতেছিল, লাথির ধাক্কায় তাহার মাথা দেয়ালে ঠুকিয়া গেল, চিনিবাস উঃ করিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; চোখ মেলিয়াই যমের চেয়েও নিষ্ঠুর নায়েব-মশায়কে সম্মুখে দেখিয়াই তাহারা থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চানন শ্লেষের স্বরে বলিল—কিরে, আমাকে মা-কালীর কাছে নাকি বলি দিবি? এখন কে কাকে বলি ছায় ছাখ্। এই দারোয়ান, বেটাদের পঞ্চাশ পঞ্চাশ জুতো লাগা—ডাক তোদের পতে বাবাকে, এসে রক্ষে করুক।

চিনিবাস ও ছিদাম নিজেদের অপরাধ কি বুঝিতে না পারিয়া ভয়-চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিয়া দুজনেই পঞ্চাননের পায়ের উপর গিয়া পড়িল—পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে অপমান ও বেদনা হইতে বাঁচাইবার জন্য, এ মনে করিতেছিল ও বোধ হয় অপরাধী, আর ও মনে করিতেছিল এ বোধ হয় কোনো অপরাধ করিয়াছে যাহা সে জানে না, নিজে যে কিছু অন্যায় করে নাই সে প্রত্যয় ত প্রত্যেকেরই আছে। চিনিবাস কাতর স্বরে বলিল—নায়েব-মশায় মিনি দোষে শাস্তি করবেন না; আপনার হুকুমে একশো টাকার খত লিখে দিয়ে গেছি; আর ত আমরা কোনো অপরাধ করিনি……

পঞ্চানন দুই লাথিতে দুজনকে ফেলিয়া দিয়া বানরের মতন মুখ খিঁচাইয়া বলিল—ন্যাকা চৈতন! কিছু জানো না? মেয়ে যে কাল সাঁড়াশিয়ার হাটে রক্ষাকালীর কাছে মানত কোরো এসেছে মা-কালীকে আমার রক্ত দেবে!…

চিনিবাস দুই হাতে কান চাপিয়া জিব কাটিয়া বলিল—রাম রাম! আপনি হলেন দেবতা বেরাম্ভন, আপনার রক্ত গোরক্ত তুল্য! এ কথা কি সে মুখে আনতে পারে?

পঞ্চানন বলিল—এক হাট লোক সাক্ষী আছে। তুই না বল্লেই হবে?

চিনিবাস ছিদামের দিকে ফিরিয়া বলিল—কাল কে হাটে গিছল রে?—দাখী, না থাকী?

পঞ্চানন বলিয়া উঠিল—তোমার থাকী গো থাকী, আমি ইচ্ছে করলে তোদের সব্বাইকে পুলিশে দিতে পারি, কিন্তু আমি মেয়েলোককে বে-ইজ্জত করতে চাইনে। তোরা এর একটা যদি বিহিত বন্দেজ করিস ভালো, নয়ত শেষে আমাকে পুলিশে খবর দিতেই হবে।

পুলিশের নামে চিনিবাসের বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে হাত জোড় করিয়া বলিল—আপনি গরিবের মা-বাপ, তাকে যা শাস্তি করতে হয় আপনি বলো. পুলিশে দিয়েন না……

পঞ্চানন বলিল—ও নিজের ছেলে ক্যাবলার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করবে যে সে আমার রক্তদর্শন করবে না, তবেই ছাড়বো; নইলে তোদের সব্বাইকে পুলিশে দেবো। একটা মেয়েমানুষের কথায় কিবে আসে যায়, আমি কিছুই বলতাম না, কিন্তু তোদের বড্ড বাড় বেড়ে চলেছে, দমন করা দরকার।

চিনিবাস বলিল—কাল সক্কালেই থাকী আর ক্যাবলাকে নিয়ে আমরা

কাছারীতে আসবো, সে আপনার সামনে দিব্যি কোরে আপনার পায়ে ধোরে ঘাট মেনে যাবে।

—আচ্ছা তবে আজ যা; কাল আসিস কিন্তু—বলিয়া পঞ্চানন সেরেস্তায় ঢুকিল।

(২৭)

সকাল হইলে কেবলরাম ও বেচারাম নিজের নিজের মাকে বলিল—মা খিদে পেয়েছে, কি খাবো ?

ছিদামের স্ত্রী চন্দনার মেজাজটা কিছু রুক্ষ, তাহাতে আবার মাসাবধি পেট ভরিয়া খাবার জুটিতেছে না, তাহার উপর দুই বিধবা ননদ ছেলে লইয়া আসিয়া জুটিয়া স্বল্প খাবারেও ভাগ বসাইয়াছে, বুড়া শ্বশুর ও বাতে-পঙ্গু শাশুড়ীকে পোড়া যমের এখনো মনে পড়িল না বলিয়া চন্দনা মনে মনে গুমরাইতেছিল ; কাল রাত্রিটা নিছক উপবাসে গিয়াছে, পেটের জ্বালার অনুপাতে মেজাজও জ্বলিতেছিল। ছেলের প্রশ্নের উত্তরে চন্দনা কোনো সাড়াই দিল না। বেচারাম আবার মায়ের গা ঠেলিয়া বলিল—ওমা, মা, খিদে পেয়েছে, কি খাবো ?

চন্দনা গায়ের ছেঁড়া কাঁথাখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ঝাঁজিয়া বলিয়া উঠিল—হতচ্ছাড়া ছেলে, খাবি কি ? উনুনে ছাইও নেই যে খাবি, চিতেও যে কবে জ্বালবো তাও জানিনে। এই কিল খা, এই চড় খা, আর এই তোরা সব্বাই মিলে আমার মাথাটা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খা......

বেচারা বেচারামের চীৎকারে ঘর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

থাকো তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—ওকি বৌদি, বেহান পহরে

ছেলেটাকে গাল পাড়তে নেগেছ, খামকা চিপুচ্ছ। ঝাট ঝাট। চ বেচা, গাই দুয়ে দি গিয়ে, তুই আর ক্যাবলা খাবি......

চন্দনা রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিল—নিজেদের ঘরসংসার উজাড় করে আমার কন্ধে এসে ভর করেছেন যবে থেকে তবে থেকে সংসারে শনির দিষ্টি লেগেছে। তোমরা গোরুর বাঁটে হাত দিয়ো না, যেটুকু দুধ দিচ্ছে তাও চম্‌কে যাবে।

থাকো আর কিছু না বলিয়া বেচাকে কোলে তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; দাখোও বেগতিক দেখিয়া কেবলরামকে কোলে তুলিয়া ঘর হইতে পলাইল; অথর্ব্ব বুড়ী তাঁতি-গিন্নি [illegible]মার চোপার ভয়ে আড়ষ্ট আকাট হইয়া পড়িয়া রহিল, বেচারীর পলাই[illegible]ক্তি ছিল না।

বাহিরে গিয়া দাখো থাকোকে জিজ্ঞাসা করিল[illegible]লেগুলো কি খাবে লো?

থাকো বলিল—ভগমান যা মাপাবেন। বাবা ত [illegible]য়েছে, কিছু জোগাড় করে নিয়ে এল বোলে। দাদাও কাজে গেছে এবেলাটা যেমন-তেমন কোরে চালিয়ে সন্ধ্যেবেলা দুটো ভাত জুটবে [illegible]।

কেবলরাম মায়ের আঁচল ধরিয়া টানিয়া কাঁদুনে [illegible] বলিল—মা খিদে পেয়েছে যে, কি খাবো?

থাকো বলিল—যা বাবা, ততক্ষণ দুটো কুল পেড়ে খেগে যা, দুধ দোয়া হলে মামী খেতে দেবে।

দাখো বলিল—সক্কাল বেলা বাসি পেটে কোষো কুল খাবে কি লো? দাঁড়া, রোস্, গাছে একটা পেঁপে পাকটো হয়েছিল, পেকেছে কি না দেখি।

তাঁতঘরের পিছনেই একটা পেঁপে-গাছ ছিল; তাহাতে একটা পেঁপে পাকিয়া ছিল। দাখো একটা আঁকষি দিয়া সেই পেঁপেটা

পাড়িল। ধপ করিয়া পেঁপে পড়ার শব্দে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দনা ঘর হইতে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে পেঁপে পাড়ছে রে ?

দাখো বলিল—আমি বৌদি।

চন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—সক্কাল বেলাই পেটে আগুন জ্বললো, পেঁপেটি গিলতে হবে।

দাখো বলিল—আমরা গিলবো না বৌদি, ছেলেদের দেবো আর মাকে একটু দেবো।

থাকো বলিয়া উঠিল—আমরাই বা গিলবো না কেন ? বাপ-ভাইএর জিনিস, বেশ করবো গিলবো। কাগে হনুমানে খেয়ে যেতে পারে, আর আমরা মনিষ্যি আমরা খেলেই বুক ফেটে যায় !

চন্দনার স্বর সপ্তমে চড়িল—যারা মিনি-দোষে সকাল বেলায় আমায় গালাগাল-মন্দ করছে, হে হরি, তাদের যেন বুক ফাটে, বেটার মাথা যেন কড়মড়িয়ে খায়, আপনার ভালো খেয়ে যেন রাক্কুসে খিদে নিবিত্তি করে······

থাকো ব্যথিত হইয়া বলিল—আপনার ভালো ত খেয়ে বোসে আছি বৌদি, এখন আমাদের ভালো তোমরাই, নিজেকে নিজে গালাগাল দিয়ে অকল্যেণ ডেকে এনো না।

চন্দনা পরাজিত হইয়া গর্জিয়া উঠিল—ভালো রে ভালো ! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদেরই গাল দেওয়া, যার খাবে তারি সব্বনাশের আহিঙ্গে—এযে বুকে বসে দাড়ি ওবড়ানো। আচ্ছা, আসুক আজ বাড়ী, বোনেদের নিয়ে থাকবে, না আমায় নিয়ে থাকবে, তার একটা বোঝাপড়া হবে।

দাখো বলিয়া ফেলিল—এখনো দাদা ত কর্ত্তা হয়নি, মাথার ওপর বাপ-মা বসে রয়েছে······

—আচ্ছা গো আচ্ছা, তবে তোমরা আপদ বালাই আমাকেই দূর

করে দিয়ে বাপভাই নিয়ে ঘর করো—বলি চন্দনা রায়বাঘিনীর মতন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বেচারামকে থাকোর কোল হইতে ছিনাইয়া লইল এবং তাহার পিঠে দুই চড় কষাইয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে লইয়া চলিয়া গেল ; বেচারা বেচারামের কান্নার রোল আকাশ চিরিয়া ফেলিতেছিল।

থাকো খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া দাখোকে বলিল—দিয়ে দিগে দিদি ওর পেঁপে ওকে, ঐ দিষ্টি-দেওয়া পেঁপে খেলে ক্যাবলার পেট ফুলবে।

পেঁপে খাইবার আশায় উৎফুল্ল কেবলরাম মামীর রণমূর্ত্তি ও বেচারামকে প্রহার দেখিয়া কাঁদো-কাঁদো হইয়া ছিল, এখন পেঁপেও খাইতে পাইবে না শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—আমি পেঁপে খাবো।

দাখো তাহাকে কোলে তুলিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল—খাবে বৈকি বাবা, চল কেটে দিগে।

চন্দনা গোহাল-ঘরে দুধ দুইয়া সেই কাঁচা দুধের ঘটী বেচারামের মুখের সামনে ধরিয়া বলিল—খা।

বেচারাম এক চুমুকে খানিকটা দুধ খাইয়া ঘটী মায়ের হাতে ফিরাইয়া দিল। ঘটীতে দুধ আছে দেখিয়া চন্দনা ছেলেকে বলিল—সবটা খেয়ে ফ্যাল।

বেচা বলিল—ক্যাবলা-দাদা খাবে যে।

চন্দনা বলিল—না, সে পেঁপে খেয়েছে, আর দুধ খাবে না।

বেচা বলিল—পিসিমা ত বলেছে পেঁপে আমাকেও দেবে......

চন্দনা আর কিছু না বলিয়া ঘটীর দুধটুকু নিজের গলায় ঢালিয়া দিল।

চন্দনা খালি ঘটী লইয়া গিয়া ধুইয়া দাওয়ার উপরে উপুড় করিয়া রাখিল। দাখো আধখানা পেঁপে আনিয়া চন্দনার সামনে রাখিয়া ও কয়েক টুকরা বেচারামের হাতে দিয়া বলিল—আধখানা পেঁপে কেটে ক্যাবলা ব্যাচা আর মাকে দিয়েছি ; এ আধখানা রেখে দাও বাবা দাদা

খাবে। দুধ কোথায় রাখলে, দুধ একটু দাও ক্যাবলাকে আর মাকে গরম কোরে দি।

চন্দনা পেঁপের আধখানা তুলিয়া লইয়া গম্ভীর মুখে বলিল—দুধ আজ আর বেশী হয়নি, যেটুকু হয়েছিল ব্যাচা খেয়েছে……

বেচারামের নামে মিথ্যা দোষারোপ শুনিয়া সে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—হ্যাঁ, সবটা আমি খেয়েছি বুঝি? অর্দ্ধেকটা ত আমি ক্যাবলা-দাদার জন্যে রেখেছিলাম, তুমি খেয়ে নিলে……

বেচারামের মুখে কথা শেষ হইবার আগেই চন্দনার প্রচণ্ড চড় বেচারামের পিঠে আসিয়া পড়িল। দাখো অমনি টপ করিয়া বেচাকে কোলে তুলিয়া সেখান হইতে দৌড় দিল। চন্দনা রাগে ও লজ্জায় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—বেশ করেছি খেয়েছি! আমার জিনিস আমি খেয়েছি, তাতে কার কি! শতেকখোয়ারি ভালো-থাকীরা আমার সংসারে থাকে কেন!……

খাকো দাখোকে চুপি-চুপি বলিল—আজ সকাল থেকেই ও অমন কোরে মরছে কেন?

বেচারাম তখনো কাঁদিতেছিল। দাখো বেচারামকে বুকে চাপিয়া পিঠে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ব্যথিত হাসি হাসিয়া বলিল—একে চটামেজাজ, তায় কাল থেকে খাওয়া হয়নি, পেট জলছে; আমরা যদি না এসে জুটতাম তা হলে এখনকার একদিনের খরচে ওর দুদিন চলতো, ওর রাগ ত হবারই কথা বোন।

—তা দিদি, আমরা ভেন্ন হই চল্।

—কি নিয়ে ভেন্ন হবি।

—এমনেও উপোষ অমনেও উপোষ। দুজনে গতর খাটালে ক্যাবলাটার পেট ভরাতে পারবো না?

—বাপভাই রাজি হবে কেন ?

—রোজ রোজ এমন হেওড়াহেওড়ি-ক্যাওড়াকেওড়ি অশান্তির চেয়ে আমাদের ভেন্ন কোরে দেওয়াই ভালো, আজ একবার বোলে দেখবো। একখানা চালা……

দাখো বলিয়া উঠিল—মা ডাকছে।

দুই বোনে বেচারাম ও কেবলরামকে খেলা করিতে যাইতে বলিয়া মায়ের কাছে গেল।

তাঁতি-গিন্নি মেয়েদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও কোথায় ?

—বাবা সক্কাল বেলাই বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি।

বুড়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পেটের ধান্দায় ঘুরছে। এই বাড়ীতে একদিন পাঁচখানা তাঁত খেটেছে, এখন তাঁতে মাকড়সায় জাল বুনছে !……আমায় একটু রোদে নিয়ে চ।

দুই বোনে ধরাধরি করিয়া মাকে দাওয়ায় আনিয়া রোদে বসাইয়া দিল। থাকো বলিল—একটু তেল মালিশ কোরে দিতে পারলে হোতো পা-টায়।

বুড়ী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—আর তেল ! গায়ে সব খড়ি উঠছে, ভাতে পোড়া মাখতে একটু পাওয়া যায় না, তা পায়ে মালিশ ! আমাদের এখন মরণ হইলেই বাঁচি !

চন্দনা ঘরের মধ্যে বিড়বিড় করিয়া বলিল—আমরাও বাঁচি, হাড়ে বাতাস লাগে।

থাকো বলিল—মা, তুমি বোসো, আমরা ডুব দিয়ে আসি।

থাকো ও দাখো স্নান করিয়া আসিল। চন্দনাও স্নান করিয়া ফিরিল। তখনো চিনিবাসের দেখা নাই।

থাকো বলিল—বেলা যে মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল, বাবার যে এখনো দেখা নেই, গেল কোথায় ?

চন্দনা বলিয়া উঠিল—খেতে দেবার ভয়ে কোথায় লুকিয়ে বোসে তামাক ফুঁকছে। জানে, বেটা রোজগার করতে গেছে, সন্ধ্যেবেলা বাড়ী এসে ভাতে ভাগ বসাবে।

থাকো বলিয়া উঠিল—দ্যাখো বৌদি...

বুড়ী বাধা দিয়া বলিল--থাকো তুই থাম, আমার মাথা খাস, এই দুঃখের ওপর আর কথা কাটাকাটি করিসনে। আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে—বুড়ো আত্মহত্যা করলে না ত?

দাথোর ও থাকোর বুকে কথাটা ঝাঁত করিয়া বাজিল; তাহাদের মুখ শুকাইয়া উঠিল। তাহারা বলিল—আমরা একবার পাড়ায় জিজ্ঞেস কোরে দেখে আসি।

তাহারা পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিল, কেহই চিনিবাসকে আজ সকাল থেকে দ্যাখে নাই। অবশেষে একজন বলিল চিনিবাস ও ছিদামকে জিতু সর্দ্দারের সঙ্গে হাতীকাঁদার দিকে যাইতে দেখিয়াছে। তখন আরেক-রকম ভয়ে তাহাদের মন দমিয়া গেল।

খবরটা পাইয়া বুড়ী একদিকে নিশ্চিন্ত হইয়া অন্য ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিল। আপন মনে বলিল—মধুসূদন, এখনো শাস্তির শেষ হয়নি?

চন্দনারও বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। কথা ফুটিল—খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হলো তাঁতির এঁড়ে গোরু কিনে। জমিদারের সঙ্গে যেমন লড়াই করতে যাওয়া হয়েছিল তার ফল ভোগ করতে হবে না? কুমীরের সঙ্গে বাদ কোরে জলে বাস করবার ইচ্ছে?

কেবলরাম ও বেচারাম ক্ষুধায় কাঁদিয়া-কাঁদিয়া নেতাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীলোক কজন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। পৌষ মাসের বেলা, সন্ধ্যা হয়-হয়।

এমন সময় শুষ্ক মুখে ধুলা-মাখা পায়ে আগে আগে চিনিবাস ও পিছনে

পিছনে ছিদাম বাড়ী ঢুকিল। চিনিবাস পথের ক্ষেত হইতে একটা শাঁক-আলু ও একটা বেগুন ও চারটি মটরশুটি চাহিয়া নিয়াছে—গামছা-সুদ্ধ সেগুলি ধপাস করিয়া দাওয়ায় ফেলিয়া নিজেও বসিয়া পড়িল; ছিদামও দাওয়ায় উঠিয়া বসিল। একদণ্ড কাহারো মুখে কোনো কথা নাই, কেহ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিতেছেনা। চন্দনা ছটফট করিতেছিল, কিন্তু শ্বশুরের সাক্ষাতে তাহার খর রসনাও রুদ্ধ হইয়া ছিল। অনেকক্ষণ পরে থাকো জিজ্ঞাসা করিল—বাবা, জমিদার আবার তলব করেছিল কেন?

চিনিবাস ক্রোধ-দুঃখ-অভিমান-বেদনায় ভরা স্বরে বলিল—এই তোমার মতন গুণের মেয়ের জন্যে।

থাকো আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমার জন্যে?

—কাল সাঁড়াশিয়ার হাটে গিয়ে কি কীর্ত্তি কোরে এসেছ?

থাকো বুঝিতে পারিল ব্যাপার কি। কাল রাগের মাথায় সে যাহা করিয়াছে তাহাতে যে তাহার বাপ ভাই জড়াইয়া বিপন্ন হইবে তাহা সে মোটেই ভাবে নাই। বাপের কথায় তাহার হুঁশ হইল। সে চিন্তিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

চিনিবাস বলিল—তুই নাকি বামুনকে খুন করবি বলেছিস একহাট লোকের সামনে!

থাকো উষ্ণ হইয়া বলিল—পেঁচো আবার বামুন? ও চামারেরও অধম!

—এ সমস্তই ঐ পতে ছোঁড়ার সলা! মেয়েমানুষকে নাচিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখা! আমরা জমিদারের কাছে ঘাট মেনেছি, সেই রাগে আমাদের হাতে দড়ি দেবার চেষ্টা!

বিনা দোষে পতিতকে অপরাধী করা হইতেছে দেখিয়া থাকো ব্যস্ত

হইয়া বলিয়া উঠিল—না না, মোড়লের পোর এতে কোনো দোষ নেই। আমি আপনা হতেই বলেছিলাম; তখন জানতাম না তোমাদের এতে বিপদে পড়তে হবে। আমি তোমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তা হলেই আর তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না।

ছিদাম বলিয়া উঠিল—না না, তোকে সে-সব কিছু করতে হবে না। কাল সকালে নায়েব-মশায়ের কাছে গিয়ে ক্যাবলার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কোরে বলবি নায়েব-মশায়ের তুই কিছু অনিষ্ট করবিনে, তা হলেই নায়েব-মশায় মাপ করবে বলেছে—নায়েব-মশায় কি মেয়েলোকের ওপর অত্যাচার করবে।

থাকো রুষ্ট স্বরে বলিল—না, নায়েব-মশায় তোমাদের ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! গয়লাদের সৈরবীকে জেলে দিয়েছিল কি কোরে? বীরেন রায়ের মাকে কে মেরেছিল? তোমরা পেঁচোকে ভয় করতে পারো, আমি ডরাইনে—মরার বাড়া গাল নেই, সেই মরণ হলেই ত আমি বাঁচি।

থাকো ঘুমন্ত পুত্রকে বুকে তুলিয়া দাওয়া হইতে নামিল। থাকোর মা বলিল—এমন ভর সন্ধ্যাবেলা ছেলে নিয়ে কোথায় চল্লি লো, ছেলেটাকে না হয় রেখে যা……

থাকো কোনো কথায় জবাব না দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল; দাখোও পিছনে পিছনে নীরবে বাহির হইল।

এমন অনায়াসে পাপ বিদায় হইল দেখিয়া চন্দনার মন খুসীতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া চৌকাঠে জল দিয়া দু ভাঁড় জল আনিয়া শ্বশুর ও স্বামীকে পা ধুইতে দিল; পেঁপে ও শাঁক-আলু ছাড়াইয়া দুই চিল্‌তে কলাপাতায় করিয়া আনিয়া রাখিল এবং ঘর খুঁজিয়া চারটি চালের খুদ ও বেগুন মটরশুটীগুলি একত্র করিয়া সিদ্ধ করিবার জোগাড় করিতে লাগিল। অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া বুড়া-বুড়ী

চোখের জল ফেলিতেছিল। ছিদামের একবার করিয়া পতিতের উপর রাগ হইতেছিল, একবার করিয়া পতিতের দলে ভিড়িয়া পঞ্চাননের মুণ্ডপাত করিবার ইচ্ছা হইতেছিল, সে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

(২৮)

চিনিবাস-তাঁতির বাড়ীর নিকটেই পতিতের বেশ বড় একটা আম-বাগান। থাকো ও দাখো কেবলরামকে লইয়া সেই বাগানে গিয়া গাছতলায় আশ্রয় লইল।

খোলা জায়গায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া কেবলরামের ঘুম ভাঙিয়া গেল; সে বলিয়া উঠিল—মা, আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিস কেন?

থাকো বিষণ্নস্বরে বলিল—এই গাছতলাতেই থাকতে হবে বাবা, তোর মামার বাড়ীতে ওরা আর থাকতে দেবে না।

অবুঝ দুঃখে ও ভয়ে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কেবলরাম বলিল—বড্ড জাড় লাগছে যে মা।

দাখো বলিল—দাঁড়া, আমি আগুন করছি।

থাকো নিজের আঁচলে ছেলেকে জড়াইয়া কোলের মধ্যে চাপিয়া বসিল। দাখো ঝরিয়া-পড়া শুকনো পাতা জড়ো করিতে লাগিল।

পাতা জড়ো করিয়া রাখিয়া একটু আগুনের জন্য দাখো নিজেদের বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। গিয়া দেখিল চন্দনা রান্না চড়াইয়াছে। দাখো দুখানা ঘুঁটে পাতিয়া বলিল—বৌদিদি, একটু আগুন দাও ত।

চন্দনা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—ভর-সন্ধ্যেবেলা আগুন দিলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে।

দাখো আর কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিকটেই পতিত হাড়ির বেগুন ও আখের ক্ষেত; ক্ষেতের আগলদারেরা কুঁড়ে ও টং বাঁধিয়া সেই ক্ষেতে আছে। দাখো তাহাদের কাছে চাহিয়া একটু আগুন লইয়া আসিল।

আগুনের তাতে কাঁপুনি একটু থামিলে কেবলরাম বলিল—মা বড় খিদে পেয়েছে যে।

ক্ষুধা যে কি পরিমাণ পাইয়াছে তাহা মা-মাসীরাও বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিল। দাখোর মনে হইল তাহার বৌদিদি রান্না চড়াইয়াছে—কিন্তু তখনি মনে পড়িল তাহারা আর সে সংসারের কেউ নয়।

পতিত মণ্ডল সমস্ত দিন গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া কাহার আহার জুটে নাই জানিয়া তাহাদের অল্পস্বল্প চালদাল জোগাড় করিয়া নিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল; আমবাগানে আগুন দেখিয়া মনে করিল বেদেরা বোধ হয় টোল ফেলিয়াছে। পাছে তাহারা কোনো গাছ আগুন-আঁচে জখম করে এই ভয়ে সে দেখিতে চলিল কেমন জায়গায় তাহারা আগুন করিয়াছে। একটু গিয়াই সে শুনিতে পাইল শিশু-কণ্ঠের কাতরতা—মা বড় খিদে পেয়েছে যে।

তাহার মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উপায় আবিষ্কারের ক্ষীণ আনন্দ-মিশ্রিত কাতর সান্ত্বনার স্বরে বলিল—একটু মাই খাবি বাবা?

শিশু বলিল—সমস্ত দিন কিছু খাইনি, মাই খেয়ে পেট ভরবে কিনা! মাইএ ত তোর দুধ নেই।

নিঃসম্বল মাতার একমাত্র সম্বল আপনাকে দিয়াই সে পুত্রের ক্ষুধা মিটাইতে চাহিতেছিল। কিন্তু তাহা যে কতখানি দুরাশা ও কতবড় প্রবঞ্চনা তাহা পুত্রের কথায় বড় দারুণ রকমে মনে পড়িল। তবুও আপনাকে দমন করিয়া রাখিয়া মাতা ক্ষুধাতুর পুত্রকে ভুলাইবার জন্য আবার বলিল—খা না একটু, তবু গলাটা ত ভিজবে।

আগুনের আলোতে তাহাদের চিনিতে পারিয়া পতিত ডাকিল—থাকো দিদি।

অন্ধকারে হঠাৎ মানুষের ডাকে চমকিয়া উঠিয়া থাকো জিজ্ঞাসা করিল—কে?

—আমি পতিত। তোমরা এখানে?

—আমার জন্যে পেঁচো বামনা আমার বাপ-ভাইকে শাস্তি করছে; তাই আমি তাদের বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছি।

—তবে দিদি, তুমি আমার বাড়ী চল।

—না, আমার জন্যে কাউকে আমি বিব্রত করব না।

—ক্যাবলার সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি; এই শীতে আড়ষ্ট হয়ে ছেলেটা যে মারা যাবে। আর আমি ত বিব্রত হয়েই আছি; আমায় আর বেশী কি বিব্রত করবে তুমি?

ছেলের বিপদের আশঙ্কায় মাতার মন আর আপত্তি করিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

দাখো বলিল—তাই যা থাকো, মোড়লের বাড়ীই আজ যা; বাপ ভাই মান ইজ্জতের চেয়ে নিজেদের আরামটাই যখন বড় কোরে দেখছে, তখন তাদের দিকে আর তাকাসনে।

থাকো জিজ্ঞাসা করিল—তুমি?

দাখো বলিল—তুই বলিস যদি ত আমিও তোর সঙ্গেই যাবো।

থাকো একটু ভাবিয়া বলিল—না দিদি, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। নিন্দে কলঙ্ক অখ্যাতি সে আমার একলারই থাক।

ঐ কথা শুনিয়া দাখো দৃঢ়স্বরে বলিল—তোকে একলা ফেলে আমি ফিরব না থাকো—চ আমিও যাবো।

—তুমি যদি সঙ্গে থাকো, তবে আর কারো বাড়ী যাবার দরকার

কি ?···আমরা একখানা কুঁড়ে বেঁধে এইখানেই থাকবো মোড়লের পো।

পতিত আর অনুরোধ করিল না ; সে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সে কিছু চিঁড়ে গুড়, দুগাছা আক, কতকগুলো বেগুন ও শাঁকআলু, কলাপাতা ও নূতন একটা ভাঁড় আনিয়া সেইখানে রাখিল। তারপর বলিল—ক্ষেতের আগলদারদের কাছ থেকে এই পেলাম। কাল সক্কালেই আমি চাল দাল নিয়ে আসবো।

পতিত চলিয়া গেলে থাকো বলিল—দিদি, বাড়ীতে সমস্ত দিন কারও আজ খাওয়া জোটেনি ; ক্যাবলার মতন চারটি চারটি রেখে বাকী সব বাড়ীতে দিয়ে আয়।

(২৯)

আজ জমিদারের মাতৃশ্রাদ্ধ। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের পীড়ন করিয়া সংগৃহীত অর্থে সমারোহের আয়োজন বেশ রীতিমতই হইয়াছে। আশে-পাশের সমস্ত জমিদার সদলবলে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, সমস্ত পণ্ডিতসমাজ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, কেবল নিমন্ত্রিত হয় নাই যাহারা এই সমারোহ করিবার অর্থ জোগাইয়াছে তাহারা, যাহাদের মুখের গ্রাস জমিদারকে দিয়া নিজের ঘরে অন্নাভাব ঘটিয়াছে তাহারা। রূপার ষোড়শ দিয়া পণ্ডিত বিদায়, জমিদারদের মর্য্যাদারক্ষা বিধিমত রকমেই হইয়াছে ; পরের ধনে পোদ্দারী করিয়া সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জ্জন যদি হয় তবে সে কাজ কে না করে ? কলিকাতা হইতে পান্না কীর্ত্তনওয়ালীকে অনেক টাকা দিয়া আনা হইয়াছে—মাতার শ্রাদ্ধের সৌষ্ঠব বজায় রাখিবার জন্য !

পান্না মোটা শরীর লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চেরা গলায় নাকী সুরে মাথুর গাহিয়া করুণরসের উত্তেজনায় শ্রোতাদের মনে কৃত্রিম শোক সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

গুণময়ের ভাবী জামাতা রসময়-বাবু আসরে বসিয়া গান শুনিতেছে, কিন্তু তাহার মনে যে শোকের ছাপ একটুও পড়িতেছিল তাহা মনে হয় না; কারণ সে তাহার রেশমী রুমালে টাকা বাঁধিয়া বাঁধিয়া কীর্ত্তনওয়ালীকে ছুড়িয়া ছুড়িয়া পেলা দিতেছিল, আর নিজের পাশে ভাবী পত্নী মায়াকে বসাইয়া তাহার সহিত নানা ছেলেমানুষী রঙ্গ করিয়া তাহার সহিত ভাব করিবার ও তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টা করিতেছিল; মায়া মুখ টিপিয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া ছিল, রসময়ের রসিকতায় না হাসিতেছিল, না কোনো কথার জবাব দিতেছিল, আর রসময় তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে যতবার কোলের কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেছিল ততবারই মায়া পিঠমোড়া দিয়া রসময়ের হাত সরাইয়া ফেলিতেছিল।

গুণময়ও ঘন ঘন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন চিকের পর্দ্দার দিকে। কিন্তু বাড়ীতে যত মেয়ে ছিল সবাই কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছিল, আসেন নাই শয্যাগত দয়াদেবী ও তাঁহাকে একলা ফেলিয়া রাজবালা।

আজ সমস্ত দিন কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত থাকাতে গুণময় একবারও রাজবালার সাক্ষাৎ পান নাই। সন্ধ্যার পর তিনি রাজবালার সন্ধানে অন্দরে গিয়া এঘরে সে-ঘরে উঁকি মারিয়া মারিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া রাজবালার মা বলিলেন—তুমি একবার ছাতে যাও বাবা।

ছাতে মেয়েদের খাওয়ানো হইয়াছে—সিঁড়ির ঘরে ভাঁড়ার হইয়াছিল। সেখানে কি কি খাবার জিনিস উদ্বৃত্ত হইয়া পড়িয়া

আছে তাহাই দেখিয়া গুছাইয়া নামাইয়া আনিবার জন্য রাজবালা ছাতে গিয়াছিল। গুণময় পা টিপিয়া-টিপিয়া ছাতে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন রাজবালা দরজার গোড়ায় পিছন ফিরিয়া বসিয়া থালায় পরাতে বারকোষে ছড়ানো সন্দেশগুলি একত্র করিয়া সাজাইতেছে। গুণময় সন্তর্পণে ঝুঁকিয়া দুই হাতে রাজবালার চোখ টিপিয়া ধরিলেন। হাতের স্পর্শেই রাজবালা বুঝিতে পারিল সে কে। সে টপ করিয়া মাথা নীচু করিয়া গুণময়ের হাত ছাড়াইয়া চকিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সিঁড়ি দিয়া তরতর করিয়া নীচে নামিয়া গেল। গুণময়ও তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিলেন। মেয়েদের পরিবেষণ করিবার সময় সিঁড়িতে ডাল তরকারী পড়িয়াছিল; অন্ধকারে তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া তাহার উপর পা দিতেই গুণময়ের পা পিছলাইয়া গেল এবং মোটা শরীরের টাল সামলাইতে না পারিয়া তিনি পড়িয়া গেলেন ও ধাপে ধাপে গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া রাজবালা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া যখন গুণময়কে ধরিল তখন তিনি সিঁড়ির নীচে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ও অজ্ঞান হইয়া গোঁ-গোঁ করিতেছেন। রাজবালা তাঁহাকে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না; তখন সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—মোহিনী মোহিনী, শিগগির চতুরকে ডাক, জামাইদাদা পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন!

এই কথা শুনিয়া সকলের আগে রাজবালার মা কপালে চড় মারিতে-মারিতে সেখানে দৌড়াইয়া আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন —ওলো সর্ব্বনাশী, নিজের হাতে পতিহত্যে করলি! ওগো বাবাগো! কী সর্ব্বনাশ হলো গো! ওরে কে কোথায় আছিস ছুটে আয়! ওরে একজন ছুটে ডাক্তারকে ডেকে আন! কেউ পাঁচুকে খবর দে! দয়া মরেও যখন মরছে না তখনি জানি একটা কিছু সর্ব্বনাশ হবে!……

রাজবালা বলিল—মা, তোমার চেঁচানি থামিয়ে একঘটী জল আনো দেখি চট করে।

চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়াও গুণময়ের চৈতন্য হইল না; ঘাড় ভাঙিয়া পড়িতেছে, মুখে গাঁজলা ভাঙিতেছে। চাকরেরা ধরাধরি করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া গুণময়কে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল যে মাথায় ও পিঠের শিরদাঁড়ায় চোট লাগিয়াছে, পা মচকাইয়া গিয়াছে, পায়ে পিঠে সেক ও মালিশ করিতে হইবে, মাথায় ঔষধের পটি বসাইতে হইবে, কিছুদিন খুব সাবধানে অন্ধকার ঘরে শোয়াইয়া সেবা করিতে হইবে, দেহ ও মন যেন শান্ত নিরুপদ্রবে থাকে, ইত্যাদি।

রাজবালার কাজ বাড়িয়া গেল। এক রোগীর জায়গায় দুই রোগী হইল, এবং দুই পৃথক ঘরে। রাজবালার মা সমস্ত দিন কেবল বকিয়া বকিয়া বেড়ান, কোনো একটা কাজে যদি লাগেন। রাজবালা একাকী স্বেচ্ছায় দয়াদেবী ও গুণময়ের সেবার ভার লইয়াছে। তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই; রোগীদের ঔষধ পথ্য সেবা শুশ্রূষা কিছুরই অনিয়ম ঘটিতে সে দেয় না।

গুণময়ের এখনো চেতনা হয় নাই; প্রবল জ্বর হইয়াছে, তিনি প্রলাপ বকিতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া বিছানা হাতড়াইয়া কেবল বলিতেছেন—রাজু কৈ? রাজু কৈ? রাজু, তুমি পালিয়ে যেয়ো না!

রাজবালা এখন গুণময়ের হাত এড়াইয়া আর পালায় না, সে গুণময়ের অন্বেষণব্যগ্র হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলে—জামাইদাদা, এই যে আমি তোমার কাছেই বসে আছি।

ইহা দেখিয়া রাজবালার মা খুসী হইয়া মনে মনে বলেন—ভগবান

যা করেন সব মঙ্গলের জন্যেই। এই কাণ্ডটি হলো বলেই না জামাইএর ওপর রাজুর মায়া পড়ল! এখন অল্পে অল্পে জামাই সেরে উঠে দুহাত এক হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্দি হই!

রাজবালার মা রাজবালাকে গুণময়ের সেবা যত্ন করিতে দেখিলেই তাহাকে বলেন—আ মর আবাগী, সেই যত্ন আত্তি করছিস, জানিসও সব, তবে অমন হুড়কোপনা কোরে জামাইকে এই কষ্টটা দিলি কেন?

রাজবালা এসব কথার কোনো জবাবই দিত না।

রাজবালা একদিন গুণময়ের ঘর হইতে দয়াদেবীর নিকটে আসিলে দয়াদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজু, উনি আজ কেমন আছেন?

রাজবালা আনন্দিত স্বরে বলিল—আজকে জামাইদাদা একটু ভালো আছেন দিদি। আজকে আর প্রলাপ বক্‌ছেন না, ঘুমুচ্ছেন, ডাক্তার বলছে আজ জ্ঞান হবে।

—তাঁকে তুই একলা রেখে এলি কেন? জ্ঞান হলেই ত তোকে খুঁজবেন।

রাজবালার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

দয়াদেবী তাহা দেখিয়া বলিলেন—আমার কাছে তুই লজ্জা করিসনে রাজু! আমি তোকে যত জানছি ততই বুঝছি তোকে আমার অদেয় কিছুই নেই; তুই ত আমার স্বামীকে কেড়ে নিচ্ছিসনে; আমি যে খুশী মনে তোকে দিচ্ছি—তুই আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়ে আমার এয়োত রক্ষা করেছিস।

রাজবালা লজ্জিত নত মুখে বলিল—ও কি কথা দিদি! ভুলে গেলে, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি তোমার সতীন আমি কিছুতেই হব না!

দয়াদেবীর মনে পড়িল বীরেন্দ্রকে। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাজবালার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া বলিলেন—রাজু, তোর

মন যে কত বড় তা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি! আমি বারবার তোকে ভুল বুঝছি।

(৩০)

চার-পাঁচ দিন পরে গুণময়ের যখন চেতনা হইল তখন রসময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল—আমি আপনার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের একটা পাকা কথা ঠিক করে যাবার জন্যে এখনো রয়েছি। আপনি ত হঠাৎ অসুখ কোরে বসলেন; তারপর আপনার কালাশৌচ; আপনার বিয়ে কবে হবে তার ত ঠিক নেই। আপনার মেয়ের বিয়ের দিন এই মাসেই একটা ঠিক্ করে ফেলুন; নইলে বলুন আমি অন্যত্র চেষ্টা দেখি।......

এমন সুপাত্র হাতছাড়া হইয়া যায় দেখিয়া অগত্যা গুণময় এই মাসেই মায়ার বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিলেন। তিনি এখন রাঁজবালাকে সর্ব্বদা কাছে পাইতেছেন; তাহার সেবায় যত্নে পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন; এখন তিনি যা-খুসী প্রণয়-বচন বা রসিকতা যখন-তখন রাজবালাকে শোনান, রাজবালা সেসব কথা শুনিতে পাইল বা শুনিয়া খুসী হইল এমন একটুও পরিচয় মুখের ভাবে না দিলেও সে যে বিরক্ত হইয়া তাঁহার কাছে হইতে পলাইয়া যায় না এই স্ফুর্ত্তিতেই তিনি মশগুল ছিলেন; সুতরাং রাজবালাকে বিবাহ করিবার বিশেষ ত্বরা এখন তাঁহার মনের মধ্যে ছিল না।

মায়ার বিবাহের সমস্ত আয়োজনের ভার পঞ্চাননের উপরই পড়িল।

পঞ্চানন এতদিন শ্রাদ্ধের ও গুণময়ের পীড়ার গোলমালে প্রজাদের বিদ্রোহের দিকে মন দিতে পারে নাই, এইবার তাহার অবসর হইল।

চিনিবাস ও ছিদাম আসিয়া জানাইয়া গিয়াছে যে থাকো ঘাট মানিতে কিছুতেই স্বীকার না করাতে তাহাকে তাহারা বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইহাতে খুসী হইয়া পঞ্চানন তাহাদের একশ টাকা জরিমানার বাবত মিথ্যা দেনার খতে পঞ্চাশ টাকা উসুল দিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখন সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না,—থাকোকে পুলিশে দিবে, না জমিদারী কাছারীর পাইক পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনাইয়া নিজেই শাস্তি দিবে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, পাইক পাঠাইয়া তাহাকে ধরিতে গেলে পতিত ও তাহার দলের সবাই বাধা দিবে নিশ্চয়, এবং সেই সূত্রে তাহাদের সকলকে ফৌজদারীতে জড়াইয়া ফেলিবার একটা বেশ ভালো-রকমের সুযোগ মিলিবে। পঞ্চানন ছুটাছুটি গুণময়কে মতলব জানাইয়া তাঁহার একটা মামুলি অনুমতি লইতে গেল।

পঞ্চানন গিয়া গুণময়ের বিছানার ধারে সবে বসিয়াছে, চতুর খানসামা আসিয়া খবর দিল—দারোগাবাবু বাবু-মশায় ও নায়েব-মশায়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাচ্ছেন।

গুণময় বলিলেন—বাড়ীর দিককার ঐ দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দারোগাকে এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

দারোগা হংসেশ্বর আসিয়া গুণময়ের খাটের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া ঘরের আসবাব ও দেয়ালের ছবির উপর চোখ বুলাইতে বুলাইতে গুণময়ের দিকে না চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছেন?

গুণময় ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—অনেকটা ভালো আছি, কোমরে আর পায়ে একটু বেদনা আছে আর মাথাটা তুফানের নৌকোর মতন টলটল করছে। বড় দুর্ব্বল করেছে!

হংসেশ্বর গুণময়ের দিকে ফিরিয়া একটু হাসিয়া বলিল—হুঁ! তা আর করবে না। কম ফাঁড়াটা গেল!……হাঁ আমি একটা খবর

দিতে এসেছিলাম আপনাদের। পতিতমণ্ডল প্রভৃতি প্রায় পাঁচশ প্রজা ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছে যে জমিদার তাদের ওপর খুব উৎপীড়ন করছে, এতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, জমিদার পুলিশকে হাত করবার চেষ্টা করছে, ইত্যাদি। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব আমাকে, কাৎলামারী থানার মুন্সী জহিরুদ্দীন দারোগাকে আর বাঁশজোড়া থানার গিরিশ খাস্তগীরকে রিপোর্ট পাঠাবার আর প্রজাদের ওপর যাতে জমিদারের লোক কোনো অত্যাচার উৎপীড়ন না করতে পারে তার দিকে নজর রাখতে হুকুম দিয়েছেন। আর কৈফিয়ৎ তলব করেছেন যে, শুনছি তোমাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষে লোকের কষ্ট হচ্ছে, তোমরা কেন রিপোর্ট করনি। এইসব সম্বন্ধে আমি কি রিপোর্ট দেবো তারই একটা পরামর্শ করতে আপনাদের কাছে আমি এসেছি।

গুণময় নিতান্ত হাঁদারাম, তাহার উপর মাথায় চোট লাগিয়া বুদ্ধি একেবারে ঘোলাইয়া গিয়াছে। তাঁহার বুদ্ধির ঘট পঞ্চানন। গুণময় পঞ্চাননের মুখের দিকে চাহিলেন।

পঞ্চানন ধূর্ত্তের ধাড়ি। সে দুষ্টবুদ্ধির জোরেই করিয়া খাইতেছে। সে প্রভুর ইঙ্গিত আঁচে বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল—তার জন্যে আর ভাবনা কি? আমাদের তরফ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটা দরখাস্ত পড়ুক যে প্রজা বিদ্রোহী হয়েছে, খাজনা আদায় দিচ্ছে না, ডিহির কাছারী লুট করবার আর দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবার ভয় দেখাচ্ছে; অতএব শান্তিভঙ্গ নিবারণের জন্যে ওদের মাতব্বরদের মুচলেকা নেওয়া হোক। তখন উভয়পক্ষের শুনানি হবে—আমাদের সাক্ষীর অভাব হবে না। ইতিমধ্যে আপনারা রিপোর্ট করে দিন, প্রজাদের উক্তি সম্পূর্ণ সর্ব্বৈব মিথ্যা, জমিদার বাকী বকেয়া আদায় করবার চেষ্টা করছেন, তা না-দেবার ফন্দীতে দুর্ভিক্ষের ওজুহাত তুলে তারাই বিদ্রোহ করছে এবং কয়েকজন গুণ্ডা মিলে এই

সুযোগে লোক ক্ষেপিয়ে ডাকাতি করবার আয়োজন করছে। স্থানে স্থানে ফসল ভালো না হওয়াতে লোকের একটু অন্নকষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু জমিদার সেইসব জায়গায় চাউল বিতরণের ব্যবস্থা করছেন বোলে আমরা আর কোনো রিপোর্ট করিনি।......আপনারা এই-রকম লিখে পাঠান, ইতিমধ্যে আমরাও দরখাস্ত পাঠাই, আর দু-চারটে ডিহি থেকে দুচার মণ চাল বিলি করবার ব্যবস্থা করে দি।

পঞ্চাননের প্যাঁচোয়া বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া গুণময়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল আর হংসেশ্বরের ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটা বিস্ময়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া কাঁকড়ার চোখের মতন মুখ ছাড়িয়া যেন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঘর একেবারে নিস্তব্ধ।

এমনি যখন সকলের অবস্থা ঠিক তখনই বাড়ীর দিকের যে দরজা চতুর ভেজাইয়া দিয়া গিয়াছিল সেই দরজাটা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল রাজবালা!

হংসেশ্বর দারোগার বিস্ফারিত চোখ দুটি ছিটকাইয়া সেই রূপের প্রতিমার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে চাহিল। হংসেশ্বর চেয়ার ঘড়ঘড় করিয়া পিছনে ঠেলিয়া লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। রাজবালা হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া আলো-আঁধারে বুঝিতে পারে নাই ঘরে অপর কেহ লোক আছে। হংসেশ্বরের অকস্মাৎ লম্ফে সে চকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মাত্র একটি মুহূর্ত্ত নিষ্কম্প মোমবাতির শিখার মতন সেই রূপসী হংসেশ্বরের বিস্মিত চোখের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেই রূপশিখা নিবাইয়া দিয়া চলিয়া গেল—কিন্তু হংসেশ্বরের মনে জ্বালা ও কালি লাগাইয়া চোখে ধোঁয়ার অঞ্জন বুলাইয়া দিয়া গিয়াছিল। হংসেশ্বরের মনে হইতে লাগিল সেই তন্বী যেন একটি মাত্র চন্দ্ররশ্মি, কপাটের

আসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ মিলাইয়া গেল। সে আপনার ইন্দ্রিয়কে আপনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, মানুষ কি এমন সুন্দর হয়!

দারোগা দাঁড়াইয়াই আছে দেখিয়া পঞ্চানন বলিল—বসুন দারোগা-বাবু।

হংসেশ্বর যেন নিশিতে পাওয়া অবস্থায় হঠাৎ জাগিয়া উঠিল এমনি ভাবে চমকিয়া বলিল—আর বসব না, আমি যাই।

—তা এ বিষয়ের মীমাংসা ঐ-রকমই ঠিক হবে ত।

—আমি এখন ঠিক বুঝতে পারছিনে; দুদিন ভেবে বলব।······

এমন সময় মায়া দৌড়িয়া আসিয়া কপাট ঠেলিয়া হাসিমুখে ঘরে একটু উঁকি মারিয়া আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল।

হংসেশ্বর বলিল—আমি এখন তবে যাই আজ্ঞে।

গুণময় ক্ষীণস্বরে বলিলেন—আচ্ছা।

পঞ্চাননও উঠিল। গুণময় বলিলেন—পাঁচুদা, তুমি আর-একবার এসো।

—হ্যাঁ, আমি এই দারোগা-বাবুকে এগিয়ে দিয়েই ফিরে আসছি।—বলিয়া দারোগাকে লইয়া পঞ্চানন বাহির হইয়া গেল।

(৩১)

রাজবালা গুণময়ের ঘরে হংসেশ্বরকে দেখিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়াই খুব হাসিতে-হাসিতে মায়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। মায়া তখন টেবিলের ধারে একখানা চেয়ারে বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া সুর করিয়া পড়িতেছিল—

"রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা ;
দুজনে দেখা হত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা !"......

এই বইখানি তাহাকে তাহার বীরেন-দাদা দিয়াছিল বলিয়া যখন-তখনই সে এই বইখানি টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিত। রাজবালা হাসিতে-হাসিতে ঘরে আসিল দেখিয়া মায়া বই হইতে চোখ তুলিয়া তাহার দিকেই অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। রাজবালা এতদিন এ বাড়ীতে আসিয়াছে, মায়া তাহাকে একদিনও হাসিতে দেখে নাই ; আজ তাহার চোখে মুখে কৌতুক যেন ঝলমল করিতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া মায়া জিজ্ঞাসা করিল—কি মাসী, কি হয়েছে ?

রাজবালা বলিল—ওরে মায়া, তোর বাবার ঘরে একটা কেমন মজার জানোয়ার এসেছে !

মায়া তড়াক করিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া পড়িয়া রাজবালার কাছে ছুটিয়া আসিয়া উৎসুক মুখ তাহার দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি জানোয়ার মাসী ?

রাজবালা হাসিতে-হাসিতে বলিল—নাম ত জানিনে তার।

মায়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমার জীবজন্তু কি পশুপক্ষী বইএ সে-রকম ছবি দ্যাখোনি ?

রাজবালা হাসির কৌতুককে গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরাইয়া বলিল—না।

মায়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সেটাকে দেখতে কেমন ?

রাজবালা গম্ভীর মুখে বলিল—ধড়টা উটের, মুখখানা বাঁদরের, চোখ দুটো কাঁকড়ার, কান দুটো গাধার, আঙুলগুলো ভাল্লুকের আর চুলগুলো

সজারুর! সে আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠেছিল। তাই আমি পালিয়ে এসেছি।

ইহা শুনিয়া মায়ার কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল, সে "আমি দেখে আসি" বলিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজবালা হাসিতে-হাসিতে চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তাহার মুখ হাসির আভায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

মায়া তখনই আবার ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল, ঘরে ঢুকিয়াই খুব হাসিতে-হাসিতে বলিল—ওমা মাসী! ঐ বুঝি তোমার জানোয়ার! ও ত হংসেশ্বর দারোগা!

রাজবালা হাসির অবকাশে একটু দম লইয়া বলিল—কি জানি মা, ও হংসেশ্বর না বক্রেশ্বর! আমার মনে হল ওটা উট্‌ট্র!

উষ্ট্র শব্দটাকে বিকৃত করিয়া বলাতে উষ্ট্রের কদর্য্যতা আরো স্পষ্ট হইল কি না বলা না গেলেও, মাসী-বোনঝিতে তাহাতে এমন কৌতুক অনুভব করিল যে একজন টেবিলে এলাইয়া পড়িয়া ও অপরজন মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া হাসিতে-হাসিতে পেট চাপিয়া ধরিয়া উঃ উঃ করিতে লাগিল ও চোখের জল মুছিতে লাগিল।

হংসেশ্বরকে উপলক্ষ্য করিয়া দুটি কিশোরী যখন হাসিতে লুণ্ঠিত হইতেছিল, তখন হংসেশ্বর বাহিরে যাইতে-যাইতে শুষ্কমুখে ইতস্তত করিতে-করিতে পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—দেওয়ানজী-মশায় ঐ যে মেয়েটি ঘরে এসেছিল ওটি কে?

হংসেশ্বর পঞ্চাননকে হয় নায়েব-মশায় নয় ভটচার্য্যি-মশায় বলিয়া সম্বোধন করিত; আজ তাহাকে দেওয়ানজী করিয়া তোলাতে ধূর্ত্ত পঞ্চানন হংসেশ্বরের মতলব বুঝিয়া মুখ ফিরাইয়া ঠোঁটের হাসি জিভ দিয়া মুছিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল—ওটি বাবুর মেয়ে!

হংসেশ্বর একবার ঠোঁট চাটিল, দুবার ঢোক গিলিল বনীয় অঘটনও ঘটা
ঠাটা গলার সামনে দুবার উঠানাম করিল ; একবার সে হংসেশ্বরের মুখের
বলিল—হ্যাঁ, ওকে ত চিনি। ঐ যিনি আগে এ

পঞ্চানন যেন আর কাহাকেও আসিতে ছাখে ঙ্গে আমার বিয়ে
লিল—আগে এসেছিলেন? কৈ আমি ত আর তখন বিয়েতে
াবুর মাস্-শাশুড়ী বোধ হয়…

হংসেশ্বর পঞ্চাননের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—না না, াস্-শাশুড়ী গোচের চেহারা মোটেই নয়। চমৎকার সুন্দরী, অল্প বয়স…

যেন অল্প বয়সের সুন্দরী কাহারো মাস-শাশুড়ী হইতে পারে না। পঞ্চানন হংসেশ্বরের কথায় মনের মধ্যেকার অট্টহাস্য মনেই গোপন রাখিয়া বলিয়া উঠিল—ও! তবে সে ঐ মাস-শাশুড়ীর মেয়ে, বাবুর শালী'…ওর সঙ্গেই বাবুর বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে!

শেষের কথাটা বলিয়াই পঞ্চানন হংসেশ্বরের মুখের দিকে চাহিল। হংসেশ্বরের মুখ শুকাইয়া কালো আর এতটুকু হইয়া উঠিয়াছে। হংসেশ্বর আবার দুবার ঢোক গিলিল, কণ্ঠাটা ঘটঘট শব্দ করিয়া উঠানামা করিল, তারপর ক্ষীণ স্বর কণ্ঠ হইতে বাহির হইল,—ও—ও!

অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা বলিল না। হংসেশ্বর ক্রমশ জমিদার গুণময়ের উপর মনে মনে ভয়ানক চটিয়া উঠিতেছিল—লোকটা যে বাস্তবিকই ভয়ানক অত্যাচারী স্বার্থপর পরস্ব-অপহারী সে বিষয়ে হংসেশ্বরের আর কিছু মাত্র সন্দেহ রহিল না। সে ঐ অত্যাচারী চোর জমিদারের বিরুদ্ধে কি বলিয়া রিপোর্ট খুব জোরালো করিবে মনে মনে তাহারই মুসাবিদা করিতে লাগিল।

বাড়ীর সদর-দরজায় হংসেশ্বরকে পৌঁছাইয়া দিয়া পঞ্চানন বলিল—

রাজু, তুমি বড় সুন্দর! ভাগ্যিস আমার অসুখ করেছিল, তাই ত তোমাকে এমন কোরে পেতে পারলাম।

ঘরে যে কেহ কোনো কথা বলিতেছে বা সেইসব কথা তাহারই কাছে প্রণয়-নিবেদন তাহা যেন রাজবালা শুনিতেও পায় নাই এমনি ভাবে কাচের গেলাসে একদাগ ঔষধ ঢালিয়া গুণময়ের মুখের কাছে হাত বাড়াইয়া ধরিল। গুণময় হাত বাড়াইয়া ঔষধের গেলাস না ধরিয়া রাজবালার গালে হাত দিলেন। রাজবালা চমকিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার বিস্তারিত হাতের উপর গুণময়ের অবলম্বনহীন বিস্তারিত মোটা ভারী হাতখানা হঠাৎ আসিয়া পড়াতে রাজবালার হাত হইতে ঔষধ-সুদ্ধ কাচের গেলাসটা ছিটকাইয়া মেঝেতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল; রাজবালা সন্ত্রস্ত হইয়া পিছু হঠিতে গিয়া ঔষধের-শিশি-বোতল-সুদ্ধ একটা ছোট হাল্কা টেবিল ঝনঝন করিয়া উল্টাইয়া ফেলিল।

গুণময় অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিলেন—থাকগে যাকগে—আবার ওষুধ আনিয়ে নিলেই হবে। তুমি আমার কাছে থাকলে আমার আর ওষুধেরই বা দরকার কি!······

সে যে এত শিশি বোতল ভাঙিল, ঔষধ অপচয় করিল, তাহার জন্য একটুও কুণ্ঠিত না হইয়া দৃপ্ত গম্ভীর মুখে ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া রাজবালা বলিল—আপনাকে দিদির ঘরে গিয়ে থাকতে হবে, নইলে আপনাকে ওষুধ পথ্যি দেওয়া আর আমার সুবিধা হবে না।

গুণময় মনে করিলেন দুই ঘরে দুই রোগীর সেবা করার অসুবিধার কথাই রাজবালা বলিল বোধ হয়। তিনি মুচকি হাসিয়া রসিকতা করিয়া বলিলেন—তোমার দিদির সেবা করবার তোমার দরকার কি? ও ত মরার দাখিল হয়েই আছে, ওকে চটপট মরতে দাও না। আমি

একটু ভালো হয়ে উঠলেই আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে, আমরা দুটিতে জোড়ের পায়রা হয়ে থাকব।......

রাজবালার মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিল—আপনাকে আমি বিয়ে করব মনে করেছেন? কক্‌খনো না! যে লোক বারবার স্ত্রীহত্যা করেছে, তার স্ত্রী হয়ে দগ্ধে মরার চেয়ে বিয়ের আগেই নিজেই মরা ভালো।......

সেই ঘরের ঠিক বাহিরের দালানে রাজবালার মা বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন। শিশি বোতল ভাঙার শব্দ শুনিয়া তিনি মনে করিলেন উহা কন্যার সহিত জামাতার কোনো-রকম রসিকতার ফল; কন্যা-জামাতার রসিকতায় শিশি-বোতলগুলো অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেও সেদিকে কান দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নহে বলিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়াই ছিলেন। কিন্তু যখন কন্যার উচ্চ তীব্র কণ্ঠস্বর কানে গেল, তখন তাঁহার আর উদাসীন থাকা চলিল না। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া বঁটিতে হাত কাটিয়া ফেলিলেন। সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি দরজার কাছে ছুটিয়া আসিয়া চাপা গলায় তিরস্কার ভরিয়া বলিতে লাগিলেন—ওলো আবাগী শতেকখোয়ারী! তোর চোপা থামিয়ে বেরিয়ে আয়! ওলো শুনছিস্! বেরিয়ে আয়......

তাঁহার হাত হইতে টপটপ করিয়া রক্তের ফোঁটা দরজার সামনে পড়িয়া জমা হইতেছিল।

এমন সময় পঞ্চানন ঘরের অপর দিকের দরজার কাছে আসিয়া গলা-খাঁখারি দিল। রাজবালা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাজবালা মায়ের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দৃপ্তভঙ্গিতে ঋজুভাবে দয়াদেবীর ঘরে চলিয়া গেল; রাজবালার মা বরাবর রক্তের ফোঁটা ফেলিতে ফেলিতে তাহার পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে বলিতে

লাগিলেন—ওলো রাজু, দাঁড়া দাঁড়া···নিজের হিত বুঝবিনে, মায়ের সলা শুনবিনে, আর যে তোর শত্রু সেই হলো তোর আপনার···ওলো একটা কথা শুনে যা······

রাজবালা একবার ফিরিয়াও না তাকাইয়া দয়াদেবীর ঘরে ঢুকিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। দয়াদেবী নীরবে হাত বাড়াইলেন; রাজবালা সেই স্নেহাশ্রয়ে শান্তি পাইবার জন্য দয়াদেবীর বুকের কাছে বিছানায় মুখ চাপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দয়াদেবী তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে মমতাবিগলিত স্বরে বলিলেন—মানুষের জীবন, রাজু, ফুলের মতন; দিনে দিনে একটি একটি করে তার পাপড়ি খোলে; আমাদের ঝরে যাবার সময় হয়েছে, তোদের জীবনের কুঁড়ি সবে ফুটছে; জীবনের দলগুলি ত হাসি-কান্নার স্তবকেই সাজানো; জীবনের অতীত দিয়েই ভবিষ্যৎকে গড়া হয়; আজকের দুঃখ কষ্ট তুই যতখানি সহ্য করতে পারবি, কাল তোর কষ্ট দুঃখ ততখানি কম লাগবে; শান্ত ধীর হয়ে দুঃখ সইতে শেখো ভাই, ধীর হয়ে সইলে দুঃখ কষ্ট বেশী লাগে না।

তখনো বাহিরে রাজবালার মা বকবক করিতেছিলেন—নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা। হাতে যে ওঁর সুখ গিলছে তা বুঝতে পারেন না।—এখনো ত আর কচি খুকীটি নেই! পরে পস্তাতে হবে—কে বন্ধু কে শত্রু পরে বুঝবেন!

(৩৩)

পঞ্চানন ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। গুণময় কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া নিস্পন্দ হইয়া শুইয়াই রহিলেন। পঞ্চানন রাজবালার কথা শুনিতে

াইয়াছিল; তাহাতে সে মনে মনে খুসীই হইয়াছিল যে ইহাতে ংসেশ্বরের প্রস্তাবটা পাড়া তাহার পক্ষে সহজ হইবে এবং গুণময়কে সই প্রস্তাবে সম্মত করাইতেও বেশী বেগ পাইতে হইবে না। পঞ্চানন যেন কিছুই শোনে নাই বা ঘরে ভাঙাচুরা শিশিবোতল ছড়াইয়া নাই, টবিলটা উল্টাইয়া পড়িয়া নাই, ঘরময় ঔষধ মলম মালিশ থইথই করিতেছে না, এমনিভাবে অতি সহজে পূর্ব্বকথার অনুবৃত্তির মতন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—হংসেশ্বর দারোগা ত বেঁকে বসেছে!

"কেন?"—বলিয়া গুণময় তৎক্ষণেই পঞ্চাননের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

—তার ভয়ানক খাঁই!

—কত চায় আবার সে?

পঞ্চানন মিথ্যা কথা অসঙ্কোচে বলিল—টাকা যা দেবার কথা হয়েছে তার ওপরে সে অপর-রকমের বকশিশ চায়। আমি অনেক কোরে বোঝালাম যে সে হবার জো নেই—তার বদলে তোমাকে বরং দশ হাজার টাকা দেওয়া যাবে! কিন্তু সে থোট ধোরে বসেছে, হয় সে যা চায় তাই দিতে হবে, নয় সে বিরুদ্ধ রিপোর্ট করবে।

—কি চায় সে?

পঞ্চানন একটু ইতস্তত করিয়া বলিয়া ফেলিল—সে তোমার শালীকে বিয়ে করবে বলে ঝুঁকে পড়েছে!

—রাজবালাকে?

—হ্যাঁ। আমি যদিও হংসেশ্বরকে বলে দিয়েছি সে-সব হবে-টবে না, তবু তোমাকে বলতে কি, ও মেয়েকে বিয়ে করা তোমার ঠিক হবে না—দেখছ না কতরকম বাধা পড়ছে!......সুন্দর ডাগর মেয়ের অভাব কি?...

গুণময় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—আমি প্রাণ থাকতে রাজুর আশা ত্যাগ করতে পারবো না।

পঞ্চানন বলিল—জোর কোরে প্রজা বশ করা যায় ভায়া, কিন্তু জোর কোরে মন ত বশ করা যায় না, বিশেষ কোরে মেয়েমানুষের মন।

গুণময় আবার একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি তার পায়ে আমার জীবন যৌবন ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি সব ঢেলে দিয়েও কি তার মন পাবো না?

গুণময়ের যৌবনের কথা শুনিয়া পঞ্চাননের অত্যন্ত হাসি আসিল। সে কষ্টে হাসি দমন করিয়া বলিল—তাতেও ত সে বাগ মানছে না; আর হংসেশ্বর বিরুদ্ধ হলে ঐশ্বর্য্য সম্পত্তিই বা থাকবে কোথায়?

গুণময় উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—একটা দারোগা বিরুদ্ধ হলেই আমার ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি সব যাবে?

পঞ্চানন বলিল—প্রজারা সব বেঁকে বসে আছে, দারোগা তাদের পৃষ্ঠবল হলে তারা আর কি আমাদের আমল দেবে? প্রজার পয়সা নিয়েই ত জমিদারদের নাচন-কোঁদন?

গুণময় বলিয়া উঠিলেন—তুমি এত লোককে খুন করতে পেরেছ আর আমার সুখের কাঁটা ঐ দারোগাটাকে সরিয়ে ফেলতে পারবে না?

পঞ্চানন জিভ কাটিয়া বলিল—বাপরে! ওরা সরকারী লোক।

গুণময় একেবারে দমিয়া গেলেন; হতাশ কাতর স্বরে বলিলেন—তবে কি হবে পাঁচুদা!

পঞ্চানন বলিল—দারোগাকে হাত করা ছাড়া আর উপায় নেই।

গুণময় বলিলেন—তাকে বলো দশ হাজার বিশ হাজার টাকা দেবো,······

পঞ্চানন বলিল—তা ত আমি আগেই বলেছি, কিন্তু সে ও-কথা কানেই তোলে না।......

গুণময় বলিলেন—আচ্ছা আমি দুদিন ভেবে পরে বলবো।

পঞ্চানন চলিয়া গেল। গুণময় কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি? একদিকে তাঁহার এই পঞ্চান্ন বৎসরের মমতা দিয়া ঘেরা জমিদারীতে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা, প্রজাদের কাছে হার মানিয়া উঁচু মাথা হেঁট করা, আর অপর দিকে এই দুইমাসের লালসার তাড়নায় সকল-ভুলানো রাজবালা হাতছাড়া হইয়া যাইবার আশঙ্কা; কাহার বিয়োগে তাঁহার মনে অধিক আঘাত লাগিবে তাহা তিনি ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না।

পঞ্চানন বাহির হইয়া চলিয়া গেলে রাজবালার মা গুণময়ের ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় গুণময় কড়িকাঠের দিকে মুখ করিয়াই হাঁকিয়া বলিলেন—চতুর, একবার রাজুকে ডেকে দে ত।

সেই কথা শুনিয়া রাজবালার মা যে-পাখানি ঘরের চৌকাঠের ওপারে ফেলিয়াছিলেন তাহা নিঃশব্দেই সরাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি আড়ালে চলিয়া গেলেন। উঁকি মারিয়া দেখিলেন একটু পরেই রাজবালা হনহন করিয়া গিয়া গুণময়ের ঘরে ঢুকিল।

রাজবালা ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—জামাইদাদা আমায় ডেকেছেন?

গুণময় কথায় আদর গলাইয়া ঢালিয়া দিয়া মোটা গলায় সুর করিয়া বলিলেন—

তোমার ক্ষণেক অদর্শনে প্রাণ যে করে পালাই পালাই,
নয়ন-পুতলি তুমি চোখের আড়াল হতে নাই।
যে অবধি হেরিয়াছি......

রাজবালা বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। গুণময় ব্যস্ত হইয়া গান থামাইয়া বলিলেন—রাজু রাজু শোনো, বিশেষ দরকারী কথা আছে……

রাজবালা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গুণময় কণুইয়ের উপর ভর করিয়া বিছানার উপর একটু উঁচু হইয়া উঠিয়া বলিলেন—আমার জীবন যৌবন…

রাজবালা হাসিয়া ফেলিল, বলিল—থাক্ জামাইদাদা, বুড়োর মুখে ঐসব কথা ভালো শোনায় না।

গুণময় চটিয়া উঠিলেন—কী আমি বুড়ো!

রাজবালা হাসিয়া বলিল—একশো বার! অসুখে পোড়ে অবধি চুলে কলপ পড়েনি, চুলগুলো যে শণের নুড়ি হয়ে উঠেছে সেদিকে খেয়াল আছে?

গুণময়ের বুকে যেন শেল বাজিল—তাইত! এতদিন অসুখে পড়িয়া থাকিয়া তিনি ত বিশ্বাসঘাতক চুলগুলোর কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়া ছিলেন! এতবড় পরাজয়ের ধ্বজা তাঁহারই মাথার উপর উড়িতেছে সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, আর তাহা দেখাইয়া দিল কি না সেই যাহাকে যৌবনের মোহে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন! গুণময় মুখ কালো করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বেশ! আমার যা আছে তা আছে। তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না বলো।

রাজবালা হাসিমুখেই বলিল—কতবার বলবো? না, না, না, কক্‌খনো না।

গুণময় সেই ব্যঙ্গের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—তোমায় আমি জোর কোরে বিয়ে করবো, একবার মন্তর কটা পোড়ে ফেললে তখন কি করবে?

রাজবালা শান্তস্বরে বলিল—তার পরদিনই বিষ খেয়ে মরবো।

গুণময় বলিলেন—তোমার ভারী অহঙ্কার হয়েছে! জানো আমি ইচ্ছে করলে তোমার মতন একশো সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারি?

—সেটা বাহাদুরী নয়। আর সেই একশো আমার মতন হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে আমি থাকবো না, নিশ্চয়।

যে গুণময়কে সকল লোক বাঘের মতন ভয় করে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া সমানে জবাব করিতেছে একটা মেয়ে! গুণময়ের জ্ঞানগোচরে এমন ঘটনা এই প্রথম। তাঁহার আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল, তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—তোমায় আমি নাকের জলে চোখের জলে কোরে ছাড়বো।

—তা এ বাড়ীতে পা দিয়ে অবধিই আরম্ভ হয়েছে, ও আর বেশী কি ভয় দেখাচ্ছেন!—বলিয়া রাজবালা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গুণময়ের গর্জ্জন শুনিয়া ও রাজবালাকে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া রাজবালার মা আবার গুণময়ের ঘরের দিকে চলিলেন, কিন্তু আবার তাঁহার যাওয়ায় বাধা পড়িল, গুণময় হাঁকিলেন—চতুর, পাঁচুদাকে ডাক।

পঞ্চানন আসিয়া দাঁড়াইতেই গুণময় বলিয়া উঠিলেন—হংসেশ্বরকে বলে দাও তাই হবে। ও শালী রাজরাণী যখন হবে না তখন দারোগার হাতেই ও পড়বে, এই ওর কপালের লিখন!······আর তুমি একটি বেশ ভালো দেখে মেয়ের খোঁজ কর।······

পঞ্চানন খুসী হইল—হংসেশ্বর দারোগা হাতে রহিল ও তাহাকে ঘুষ দিবার জন্য মঞ্জুরী দুই হাজার টাকাটা নিজের হাতে আসিল!—এক ঢিলে যদি এমন সুন্দর দুটি পাখী মরে ত মন্দ কি!

পঞ্চানন বলিল—তা মেয়ে আমি শিগগিরই ঠিক করে ফেলব।

আপাতত আগে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্তটা করে দিতে হয়; আর জেলায় একজন উকিল নিযুক্ত করে রাখতে হয় যে খবরাখবর নিয়ে খবরদারী করবে।

গুণময় বলিলেন—বীরে জেলায় আছে শুনেছি; তাকেই এখানে আসতে টেলিগ্রাম করো, মোকাবেলায় সব তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ো, এখন তাকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নাও, বিনা পয়সায় কাজ হয়ে যাবে। পরে উকিল দিলেই হবে।

"আচ্ছা" বলিয়া পঞ্চানন বিদায় লইল।

পঞ্চানন চলিয়া গেলে কন্যার উদ্ধত অবিনয়ের মার্জ্জনা অনুরোধ করিবার জন্য রাজবালার মা গুণময়ের ঘরে আসিয়া মাথার ঘোমটা একটু নামাইয়া দিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন আছ বাবা?…ওমা, সব ওষুধ-পত্তর ছড়াছড়ি!…বাছারে! সকাল থেকে একদাগও ওষুধ পেটে পড়েনি! আ আমার পোড়া কপাল!…ও মোহিনী মোহিনী, চতুরকে ডেকে দে ডাক্তারখানা থেকে চট করে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসুক।……

গুণময় চুপ করিয়া পড়িয়াই রহিলেন, রাজবালার মায়ের দিকে একবারও চাহিলেন না।

তাহা দেখিয়া রাজবালার মা বলিলেন—তুমি ত বাবা জ্ঞানমান বুদ্ধিমান, রাজু বালা-স্বভাব থেকে যদি কিছু অন্যায়ও বলে থাকে তাতে তুমি কিছু মনে কোরো না। রাজু আমার বড় ভালো মেয়ে গো, ও শুধু ঐ দয়ার কুপরামর্শ শুনে এমন বিগড়ে দাঁড়িয়েছে—রাজু পাছে তার সতীন হয় এই হিংসেতেই দয়া গেল! আরে বাছা, তুই ত মরতে বসেছিস, তোর এত সোয়ামী আগলানো কেন? বরং সোয়ামীকে থিতু করে সংসার বজায় রাখিয়ে সোয়ামীর হাসিমুখ দেখতে-দেখতে তুই মর না কেন!……

গুণময় এইবারে কথা কহিলেন—আমি এই মাসেই দয়াকে সতীন দিয়ে ওর সব নষ্টামি ভাঙব তবে আমার নাম গুণময় রায় ! আমার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, দয়া ত কোন্ ছার।

রাজবালার মা খুসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ বাবা, শুভ কর্ম্মটা এই মাসেই সেরে ফ্যালো ; বিয়েটা হয়ে গেলে রাজু শান্ত হয়ে যাবে। দেখলে ত বাবা তোমার ব্যামোতে আহারনিদ্রা ছেড়ে কি সেবাটাই করলে ! দিন কি স্থির হয়েছে ?

—হ্যাঁ, রাজুর বিয়ের দিন স্থির হয়েছে এই ২৪এ মাঘ, আর বর স্থির হয়েছে হংসেশ্বর দারোগা—আমি নই ;—আমাকে স্বামী পেলে যে ভাগ্য বলে মানবে এমন অপর মেয়ে খোঁজা হচ্ছে।

গুণময়ের এই কথা বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতন রাজবালার মায়ের দারুণ বলিয়া মনে হইল, তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কথাটা উপলব্ধি করিয়া কপালে নির্ঘাত এক চড় মারিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—এত আশা দিয়ে শেষ কালে রাজুর কপাল এমনি করে ভাঙবে বাবা ?

গুণময় গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে বলিলেন—যার সঙ্গে যার ভবিতব্য !

রাজবালার মা কাঁদো-কাঁদো হইয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—রাজুর হয়ে আমি তোমার কাছে ঘাট মানছি বাবা।...

—এর আর নড়চড় হবার জো নেই মাসী...হংসেশ্বরকে আমি কথা দিয়েছি।

রাজবালার মা ঘর হইতে দালানে বাহির হইয়া আছড়াইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—ওরে বাবারে আমার একি সর্ব্বনাশ হলো রে !......

তাহা শুনিয়াই দয়াদেবী কপালে চোখ তুলিয়া ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল স্বরে

জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ……কি হলো? ওঁর কি কিছু হলো?……

দয়াদেবীর দুর্ব্বল হৃদ্‌যন্ত্র অল্পেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল! তিনি মূর্চ্ছা যাইবার অবস্থায়।

তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি রাজবালা বলিয়া উঠিল—দিদি দিদি, ওসব কিছু নয়, এই আমি দেখে আসছি জামাইদাদা বেশ ভালো আছেন তুমি স্থির হও।…মায়া তুই একটু হাওয়া কর, আমি ছুটে দেখে আসি……

রাজবালা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, সম্মুখেই দেখিল মোহিনী আসিতেছে, ভয়ব্যাকুল শুষ্ক মুখে উদ্বিগ্ন স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি মোহিনী, কি হলো?

—বাবু হংসেশ্বর দারোগার সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করেছেন তাইতে……

রাজবালা আর বেশী কিছু শুনিবার জন্য না দাঁড়াইয়া হাসিমুখে ছুটিয়া দয়াদেবীর ঘরে ফিরিয়া গেল।

তাহাকে হাসিমুখে ফিরিতে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া দয়াদেবী রাজবালার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন। রাজবালা হাসিতে হাসিতে বলিল—জামাইদাদা হংসেশ্বর দারোগার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করেছে তাই আমার মা মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছেন।

মায়া শুনিয়া কৌতুকের হাসিতে লুণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিল—তোমার সেই হাঁসজারু বকচ্ছপ জানোয়ারটার সঙ্গে বিয়ে হবে?

রাজবালা তেমনি হাসিতে-হাসিতে বলিল—হাঁরে!

—সেই তোমার বক্রেশ্বর?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—তুমি মাসী বরের নাম করেছ ?

—আরে এখনো ত বিয়ে হয়নি—বিয়ের পর বক্রেশ্বর বলে ডাকব।

—আমি ভাই মাসী তোমার বরকে মেশোমশাই বলতে পারব না।

রাজবালা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—মেসো-মশাই কেন বলতে যাবি ? বকচ্ছপ কি হাঁসজারু বলবি।

দয়াদেবী এতক্ষণ একদৃষ্টে রাজবালার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। একটু দম লইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—রাজু, তুই হাসছিস ? তোর হাসি দেখে আমার কেমন ভয় হচ্ছে।

—দিদি, তুমিই ত এখনি বল্লে, হাসিমুখে সকল অবস্থাকে সয়ে যেতে হবে; তাই আমি হাসছি—বলিতে-বলিতে রাজবালা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আবার বীরেন্দ্রকে দয়াদেবীর মনে পড়িল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মমা, তোর মাসীকে আমার কাছে সরিয়ে নিয়ে আয়।

বাহির হইতে রাজবালার মায়ের আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছিল—আমি এমন হতভাগা মেয়েও পেটে ধরেছিলাম—কোথায় রামের অধিবাস, না রাম চললো বনবাস !...

(৩৪)

বীরেন টেলিগ্রামে গুণময়ের আহ্বান পাইয়া মহা সমস্যায় পড়িল। টেলিগ্রাম লোককে শুধু ইঙ্গিত করে, হুকুম করে, কোনো কথা সে খুলিয়া ত বলে না, এমনি তাহার ব্যস্ততা আর এমনি তাহার গুমোর ! বীরেন বুঝিতেই পারিতেছিল না, অকস্মাৎ হাতিকান্দায় কেন তাহার ডাক পড়িল।

দয়াদেবী কি তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন ? কিংবা তিনি কি মারা
গিয়েছেন ? তা ত বোধ হয় নয়, টেলিগ্রামের চারটি কথা Come shar
important business ত সে-রকমের কোনো আভাস দিতেছে না
ঐ businessটা কি ? রাজবালার সঙ্গে কি তাহার বিবাহ দেওয়
হইবে ? হে ভগবান ! তা যদি হয় ! মায়ার সঙ্গে কি ? তাহা
পৈত্রিক সম্পত্তি তাহাকে কি ফিরাইয়া দিবে ? কিংবা গুণময় উই
করিবেন, তাহার সাক্ষী হইতে হইবে বা ট্রষ্টি হইতে হইবে ?······

এইরূপ হাজারো অনুমান বীরেনকে ভাবাইয়া তুলিল। কি
সেইসঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল তাহার হাতীকান্দায় ফিরিয়া যাওয়
উচিত কি না। সে যে অপমানিত হইয়া একরকম প্রতিজ্ঞা করিয়
সে-বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, এই দুদিন আগেই ত তাহাকে
সে-বাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিয়া পত্র আসিয়াছিল, আজ আবার
আমন্ত্রণ কেন ? আবার সেইসঙ্গে যাইবার লোভও দুর্দ্দমনীয় হই
উঠিতেছিল—গেলে একবার রাজবালার সঙ্গে দেখা হয়, দয়াদেবীকে
দেখিতে পায়, মায়াকে দেখিতে পায়, আর কিসের জন্য ডাক পড়িয়াছে
তাহাও সে জানিতে পারে।······আর মায়ের মৃত্যুর স্থান নিজের ভিটাটি
উপর একবার মাথা ঠেকাইয়া আসিতে পারে······

লোভ ও কৌতূহলে পড়িয়া বীরেন যাওয়াই ঠিক করিল। যেম
ঠিক করা আর অমনি একটা ব্যাগে থানকতক কাপড় জামা ভরি
বাহির হইয়া পড়া, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব আর সহিল না।

রাজবালা গুণময়ের মুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় নিজের মনের ক
প্রকাশ করিয়া শুনাইয়া কাল হইতে গুণময়ের ঘরে আর পা দ্যায় না
গুণময়ও ডাকিয়া পাঠান নাই। গুণময় এখন চতুর-খানসাম
হেফাজতে।

পরদিন রাজবালা গুণময়ের ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিল, শুনিতে পাইল চতুর-খানসামা গুণময়কে বলিল—বীরেনদাদাবাবু এসেছেন।

রাজবালা চমকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল, বীরেন দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বুঝিবা।

গুণময় চতুরকে বলিলেন—ডেকে আন বীরেনকে।

রাজবালার মুখ একবার উজ্জ্বল হইয়া ম্লানতর হইল, পরক্ষণেই লজ্জার আভা তাহার মুখে পূর্ব্বাকাশে অরুণছটার মতন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। রাজবালা গুণময়ের ঘরে ঢুকিয়া-পড়িয়া বলিল—জামাইদাদা, সকালে ওষুধ খাওয়া হয়নি ? দেবো ?

গুণময় বলিলেন—দাও, আজ শেষ দিন তোমার একটু সেবা পেয়ে নি। কাল থেকেই ত তুমি হংস-দারোগার। রাজবালা তোমার নাম, রাজরাণী হলে কেমন মানাত! তা না, তুমি হচ্ছ হংসেশ্বরের রাজহংসী !......

রাজবালা গেলাসে ঔষধ ঢালিয়া লজ্জিত মুখে গুণময়ের দিকে হাত বাড়াইয়া ধরিল।

বীরেন ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। দুটি বড় বড় চোখের বিষণ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টি পরম আগ্রহে তাহারই পথের দিকে তাকাইয়া ছিল। তাহাদের চারিচোখের দৃষ্টি পরস্পরকে মধ্যপথে আলিঙ্গন করিল। অতুল আনন্দ ও বিপুল ব্যথা বীরেন্দ্রের বক্ষে তুফান জাগাইয়া তুলিল। এই চার মাসের অদর্শনের ফাঁকেই সেই রূপের প্রতিমা অনেকখানি দীর্ঘতর ঋজুতর সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে। এ যে অপরূপ !

গুণময় রাজবালার হাত হইতে গেলাস লইয়া ঔষধটা গলায় ঢালিয়া রাজবালার হাতে গেলাস ফিরাইয়া দিলেন, ঔষধটা গিলিয়া বিকটভাবে মুখ বিকৃত করিয়া গুণময় বীরেন্দ্রকে বলিলেন—তোমাকে 'একটু কাে

জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। পতে হাড়িটা প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুল্‌ছে ; ওদের ঢিট করে দিবে হতে ; ওরা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে দরখাস্তও করেছে ; আমরাও ওদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত নালিশ যত-রকম পারি রুজু করে ওদের জেরবার করে ফেলব। তুমি নতুন পাশ করে ওকালতীতে বসছ ; আমাদের এই-সবের তদ্বির তদারক করবে তুমি—অভিজ্ঞতাও বাড়বে, লোকের কাছে পরিচয়ও হবে……

বীরেনের আর গুণময়কে প্রণাম করা হইল না। সে জোরে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—এ ভার ত আমি নিতে পারব না।

গুণময় তাহার স্থিরসংকল্পের দৃঢ় উত্তর শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন ?

—আমি প্রজাদের পক্ষে অনেক দিন আগে থেকেই নিযুক্ত হয়েছি।

—আমার বিরুদ্ধে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

গুণময় ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া বিছানায় জোর করিয়া উঠিয়া বসিয়া খাটো খাটো ফুলো হাতে তাকিয়া বালিশের উপর গোটাকতক ঘুঁষি জোরে কষাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—বেইমান নিমকহারাম ! আমি কি দুধকলা দিয়ে কাল-সাপ পুষেছিলাম ? পাঁচুদা তখনি বলেছিল—ঋণের শেষ, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ রাখতে নেই,—যে পথে ওর মা গেছে সেই পথে ওর ছাঁকেও পাঠিয়ে দাও। আমি বললাম…আহা ছেলেমানুষ, থাকুক। কি বলব, আজ আমি পড়ে রয়েছি, নইলে ঐ মুখ জুতিয়ে ভাঙতাম ! বেরো আমার বাড়ী থেকে।……চতুর ! এর কান ধ'রে বার কোরে দে ত……

হেফ.বীরেন্দ্র একবার রাজবালার দিকে চাহিয়া নীরবে ফিরিয়া চলিয়া

যাইতেছিল; রাজবালা তাড়াতাড়ি বলিল—একবার দিদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

বীরেন বিষণ্ণ কাতর স্বরে বলিল—মাকে বোলো তেমন পুণ্য আমার ভাগ্যে নেই।

বীরেন্দ্র আবার চলিয়া যায় দেখিয়া রাজবালার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইল; সে দুই পা আগাইয়া গিয়া বলিল—কালকে আমার গায়েহলুদ!

বীরেন থমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একবার গুণময়ের দিকে চকিতে চাহিয়া রাজবালাকে বিস্ময়-পূরিত ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কালই?

রাজবালা তাহার প্রশ্নের মানে বুঝিয়া বলিল—হ্যাঁ। বিয়ে হবে হংসেশ্বর দারোগার সঙ্গে।

"ও!"—বলিয়া বীরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাজবালাও গুণময়ের ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার দুঃখদিনের একমাত্র আশ্রয় দয়াদেবীর ঘরে ঢুকিল। আস্তে আস্তে দয়াদেবীর কাছে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বীরেন্দ্র বারান্দা দিয়া নীচে নামিবার পথে যাইতে যাইতে দেখিল অপর দিক হইতে বধূবেশে সজ্জিতা মায়া আসিতেছে। মায়া তাহাকে দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে বীরেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে-হাসিতে মায়া জিজ্ঞাসা করিল—বীরেন-দা, তুমি কখন এলে?

বীরেন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—এই আসছি ভাই।

তখনই মায়ার মনে হইল নিশ্চয় বীরেন-দা তাহার বিবাহ-উপলক্ষ্যে ভোজ খাইতে আসিয়াছে; তাহার লজ্জাও হইল, রাগও হইল—বীরেন-দা তাহাকে বিয়ে করিল না, বিয়ে হইবে কি না সেই বুড়োটার সঙ্গে! মায়া বীরেনের গায়ে মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইল।

বীরেন দুই হাতে মায়ার দুই বাহু ধরিয়া সামনের দিকে একটু ঠেলিয়া ধরিয়া বলিল—মায়া, ছাড় ভাই, আমায় এখনি যেতে হবে……

মায়া আশ্চর্য্য হইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখনি এসে এখনি যাবে কি?

—তোমার বাবার হুকুম।

মায়ার অনেক পুরাতন কথা মনে পড়িল; একরকম সে-ই তাহাকে এ বাড়ী হইতে তাড়াইয়াছে। সে বড় ম্লান মুখে বিষণ্ণ স্বরে বলিল—আমি মাসীর হিংসেতে বাবাকে বোলে এই কাণ্ডটি করেছি! আমি ঘাট মানছি বীরেন-দা!

বীরেন একবার চারিদিকে চাহিয়া মায়ার গালে চুম্বন করিল।

মায়ার মন তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—মায়ের সঙ্গে দেখা করেছ?

—না ভাই, সে সুখ আমার অদৃষ্টে নেই।

—মাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছে? সে তোমার জন্যে [illegible] কাঁদে……

বীরেন মায়াকে ছাড়িয়া দিয়া তীরের মতন সিঁড়ি [illegible] ছুটিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মায়া মাকে ও মাসীকে বীরেন-দাদার আগমনের সংবাদ দিতে চলিল।

রাজবালা দয়াদেবীর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে-থাকিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি, বীরেন এসেছিল।

দয়াদেবী পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কৈ, কৈ বীরেন? তাকে ডাক, তাকে একবার দেখি। বীরেন এখনো যে আমার কাছে এল না?

—জামাইদাদা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সে বোলে গেল, মাকে বোলো তাঁকে দেখতে পাবো তেমন পুণ্য আমার ভাগ্যে নেই!

দয়াদেবী চোখ বুজিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মায়া ঘরে ঢুকিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল—মা, মাসী, বীরেনদাদা এসেছিল, চলে গেল।

দয়াদেবী বা রাজবালা কেহই কোনো কথা বলিতে পারিল না।

রাজবালা দয়াদেবীর ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবে বলিয়া যেমন ফিরিয়াছে, বাহির দিকের জানলা দিয়া দেখিতে পাইল বীরেনদের বাড়ী যেখানে ছিল সেইখানে একটা শিউলি-গাছের তলায় মাটিতে পড়িয়া বীরেন ধূলার উপর মুখ গুঁজিয়া আছে, বোধ হইল কাঁদিতেছে। বীরেনদের বাড়ী ভাঙিয়া সেই ইটে গুণময় হরিমতি-বষ্টমীর সুন্দরী মেয়ে কাঞ্চনের জন্য বাড়ী তৈরী করিয়া দিয়াছেন, বীরেনদের ভিটা এখন সমভূম; তাহার মা যে-গাছটিতে গলায় দড়ি দিয়াছিলেন, সে গাছটি এখনো তেমনি আছে; বীরেন তাহারই তলায় যেন মায়ের কোলে শুইয়া কাঁদিতেছে। রাজবালা দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—দিদি, বীরেন তার ভিটের ধূলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে!

"আহা বাছারে!" বলিয়া দয়াদেবী ধীরে ধীরে চেষ্টা করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন ও মায়াকে বলিলেন—মায়া এই জানলাটা খুলে দে ত।

বিছানার কাছের জানলাটা দিয়া বীরেনের ভিটা ও তাহার মায়ের ফাঁশির গাছটা দেখা যায় বলিয়া দয়াদেবী সেটি খুলিতে দিতেন না। আজ তাহা খুলাইয়া বীরেনের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন—আহা বাছারে!

কিছুক্ষণ পরে মাটি হইতে মাথা তুলিয়াই বীরেনও দেখিতে পাইল জানলা হইতে দয়াদেবী রাজবালা ও মায়া ম্লান বিষণ্ণ মুখে তাহাকেই দেখিতেছে। বীরেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ধূলার উপর মাথা রাখিয়া উদ্দেশে দয়াদেবীকে প্রণাম করিল; তারপর সেদিকে আর না চাহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দয়াদেবী আস্তে-আস্তে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

বীরেন্দ্র আপনার ভিটা হইতে উঠিয়া সাঁড়াশিয়া গ্রামের দিকে চলিল —সে গ্রাম হাতীকান্দা হইতে বেশী দূর নয়, একবারে লাগাও।

বীরেন্দ্র গ্রামে ঢুকিয়াই দেখিল যে আজ সাঁড়াশিয়ার হাট; হাটে বেশ লোক জমিয়াছে, কিন্তু সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রক্ষাকালীর মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া আছে, যেন একজন কাহারও কথা মন দিয়া শুনিতেছে। কৌতূহলী হইয়া বীরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া গিয়া ভিড়ের পশ্চাতে দাঁড়াইল— দেখিল পতিত হাড়ি বক্তৃতা করিতেছে। পতিত সকলকে বুঝাইতেছে— জমিদারের যেমন ডিহিতে-ডিহিতে এক-একজন তহশীলদার থাকে, সে তার এলাকার রায়তদের খাজনা আদায় করে' সদরে জমা স্থায়, তেমনি জমিদার স্বয়ং গভর্মেণ্টের তহশীলদার মাত্র; ইংরেজ যখন রাজা হল তখন খাজনা আদায় করবার জন্যে দেশময় লোক নিযুক্ত করে জমিদারী সৃষ্টি করলে; তারপর দশ-শালা বন্দোবস্তে ইংরেজ গভর্মেণ্ট তার তহশীলদার জমিদারদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করলে যে তোমাকে এত টাকা শালিয়ানা লাটের খাজনা দিতে হবে—হাজা শুখা ফৌত মৌত অনাদায় সকল ঝুঁকি তোমাদের। এই সুবিধে পেয়ে জমিদাররা কষে প্রজাপীড়ন করে বেশী-বেশী খাজনা আদায় সুরু করে দিলে; যার লাটের খাজনা দিতে হয় বিশ হাজার, সে শালিয়ানা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতে লাগল একলক্ষ টাকা। এই-রকমে বছর বছর খরচখরচা বাদে জমিদার হাজার-হাজার টাকা নিজের মালখানায় জমাতে লাগল। জমিদার পরের টাকায় পোদ্দারী করে বিলাসে অপব্যয় করতে লাগল; তাদের ভুঁড়ির বহর যত বাড়তে লাগল, আমরা গরিবেরা পেটের ভাতের জন্যে ততই কাঙাল হয়ে উঠতে লাগলাম। ওরা আমাদের কাছ থেকে

টাকা নিয়ে গাড়ীজুড়ী হাঁকায় আর আমাদের কাচ্চা-বাচ্চারা না খেতে পেয়ে মারা যায়। এই ছাখো সেদিন তোমাদের জমিদারের মায়ের শ্রাদ্ধে কত টাকা খরচ হল। সে টাকা জমিদার কোথায় পেয়েছিল? তোমাদের কাছ থেকে। জমিদার নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে কাদের? তারই মতন পেটমোটা জমিদারদের, আর তোমরা যারা টাকা জোগালে তোমরা রইলে উপবাসে। যখন তোমরা ঘরে ঘরে দুতিন দিন ধরে উপোষ করে হা অন্ন জো অন্ন করছিল তখন কলকাতার একটা বেশ্যা-কীর্ত্তনওয়ালী এসে তোমাদের কাচ্চাবাচ্চার মুখের গ্রাস থেকে কেড়ে হাজার টাকা—দশ শো টাকা—নিয়ে চলে গেল! সেই দশ শো টাকা তোমরা পেলে দশ শো লোক চার পাঁচ দিন খেয়ে বাঁচতে! কালকে যে জমিদারের মেয়ের বিয়ে হবে তাতে তোমাদের কয়জনের নিমন্ত্রণ হয়েছে? কিন্তু বেগার খাটতে ধরে নিয়ে গেছে কত জনকে? সুতরাং আমরা জমিদারকে তার হক পাওনার বেশী কেন দেবো?—জমিদার আমাদের পথঘাট করে দিচ্ছে না, স্কুল-পাঠশালা করে দিচ্ছে না, জলকষ্ট অন্নকষ্ট নিবারণ করবার কোনো উপায়ই করে না; তবে তাদের বংশানুক্রমে বিলাস আর বদমায়েসী করবার সুবিধের জন্যেই কি আমরা বংশানুক্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বুকের রক্ত জল করব! কক্‌খনো না—কক্‌খনো না! জমিদারের অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়ে আর আমরা মাথা নীচু করে থাক্‌ব না……

অমনি জনতা হইতে বিপুল রব উঠিল—না, না। মারো জমিদারদের—ফাঁসাও তাদের ভুঁড়ি—জান্ কবুল, তবু একপয়সা বেশী জমিদারকে দেবো না……

জনতা চঞ্চল হইয়া অল্পে-অল্পে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ পতিতের নজর পড়িল বীরেন্দ্রের দিকে—সে স্মিত উজ্জ্বল মুখে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পতিত কালীমন্দিরের রক হইতে

তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া খুব নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল "বীরেন-বাবু, আপনি কতক্ষণ?"

বীরেন্দ্র পতিতকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—পতিত, তুই আমাকে প্রণাম করছিস কিরে? আমি তোর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করব।

পতিত জিভ-কাটিয়া বলিল—অমন কথা মুখে আনবেন না, আমি অন্ত্যজ হাড়ি!

তুই হাড়ি নোস পতিত, তুই ক্ষত্রিয়—অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছিস; তুই ব্রাহ্মণ—আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোরে দুঃখ বরণ করেছিস। পেঁচো ব্রাহ্মণ, আর তুই হাড়ি? এ যে বলে বলুক, আমি স্বীকার করব না।

পতিত লজ্জিত হইয়া সে কথা চাপা দিবার জন্য বলিল—আপনি এদিকে এসেছেন কোথায়?

—তোর কাছেই। আচ্ছা পতিত, যখন আমরা স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম তখন তুই আমাকে আপনি বলতিস? আজ অকস্মাৎ আপনি বলতে আরম্ভ করলি কেন? আপনি-টাপনি চলবে না বলে দিচ্ছি।

পতিত হাসিয়া বলিল—তুমি এখন বিদ্বান উকিল হয়েছ······

বীরেন পতিতের গালে আস্তে একটি চড় মারিয়া হাসিয়া বলিল—তাতে আমার পদ বেড়েছে—দ্বিপদ ছিলাম চতুষ্পদ হয়েছি?

পতিত হাসিতে-হাসিতে বলিল—তুমি আমাকে বারবার ছুঁচ্ছ, সবাই অবাক হয়ে দেখছে।

—দেখুক না, আমরা স্কুলে এক বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসতাম মনে আছে?

পতিতের মন বাল্যস্মৃতিতে আনন্দিত হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি জেলা থেকে কখন এলে ?

—এই ঘণ্টা দুই হবে। গুণময় তোদের সঙ্গে মকদ্দমা করবে, তাই আমায় মকদ্দমার তদ্বির করবার ভার দেবে বোলে ডেকেছিল।

—তবে তুমি আমাদের এখানে যে ?

—আমি গরিব, গরিবের মকদ্দমারই তদ্বির করব বোলে সে পক্ষ ছেড়ে দিয়েছি। গুণময় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে তাই তোর আশ্রয়ে এসেছি।

—তাহলে খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়নি ? চলো, বেলা হয়েছে। আমাদের গোয়াল-ঘরে তোমার রান্নার জোগাড় করে দেবো, দুটো সেদ্ধ করে নাবিয়ে নিতে পারবে ত ?

—আমি সেদ্ধ করতে যাব এমন কি দায় পড়েছে। তোর বাড়ীতে অতিথি, তোর বউ আমায় রেঁধে দেবে। তোদের রান্নাঘরের চেয়ে গোয়ালঘরটা নিশ্চয় বেশী পরিষ্কার নয় ?

পতিত হাসিয়া বলিল—তুমি একেবারে কালাপাহাড় হয়ে উঠেছ দেখছি !

(৩৬)

পঞ্চাননের নিকট খবর পৌছিল পতিত কি বলিয়া প্রজাদের বিদ্রোহী করিতেছে এবং কেমন করিয়া তাহার সহিত বীরেন্দ্র গিয়া জুটিয়াছে। পঞ্চাননের বীরত্ব অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি গুণময়কে গিয়া বলিল—এমন করলে ত জমিদারী করা চলে না ! তুমি হুকুম দাও ভায়া, ঐ ছোঁড়া দুটোর কাঁচা মাথা কেটে নিয়ে আসি !

গুণময়ের মনের মধ্যেও ক্রোধের আগুন তখনো জ্বলিতেছিল; তিনি হুকুম দিলেন—তুমি পতে হাড়ি আর বীরে ছোঁড়াকে যেমন করে পার জব্দ কর—তাতে লক্ষ টাকা খরচ হলেও পিছপাও হয়ো না।

প্রভুর দরাজ হুকুম পাইয়া পঞ্চানন রণসজ্জার আয়োজন করিতে গেল।

রাজবালা বাহিরে দাঁড়াইয়া পঞ্চানন ও গুণময়ের কথা কয়টা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল।

বীরেনের প্রতি রাজবালার অনুরাগ জন্মিয়াছিল মাত্র চারটি দিনের পরিচয়ে দুঃখের সমবেদনায়। তার পর ছাড়াছাড়ি হইয়া অদর্শনে বীরেনের উপর রাজবালার মনের টান অনেকটা শিথিল হইয়া আসিতেছিল; তবে সে জেদী মেয়ে বলিয়া নিজে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহাই কর্ত্তব্যবোধে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল। সে যে এখনও গুণময়কে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিতেছিল তাহার কারণ—গুণময়ের অভদ্র ব্যবহার, গুণময়কে তাহার অপছন্দ ও দয়াদেবীকে কষ্ট দিবার অনিচ্ছা যতটা, বীরেনের উপর অনুরাগ ঠিক ততটা নহে। কিন্তু আজ আবার অকস্মাৎ বীরেনের সঙ্গে দেখা হইয়া যাওয়াতে রাজবালার মনের ভিতরকার থিতানো ভাবগুলি আলোড়িত হইয়া উঠিল; বীরেনের কাতর ম্লান দৃষ্টি, তাহার নির্ব্বাক দুঃখ, তাহাকে গুণময়ের নূতন অপমান, পোড়ো ভিটার ধুলায় পড়িয়া মায়ের জন্য তাহার কান্না, দেখিয়া রাজবালার মন অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বেদনা প্রবলতর বোধ হইতেছে এইজন্য যে সে বীরেনকে একটিও সান্ত্বনার কথা বলিবার অবকাশ পাইল না। এই যে তরুণ সুকুমার সুশ্রী যুবক বীরের মতন দুঃখ সহিতেছে, তাহার সহিত গুণময়ের তুলনা করিয়া রাজবালার অনুরক্ত মন অতি সহজেই তার অধিকতর পক্ষপাতী হইয়া উঠিল।

তাহার তুলনায় হংসেশ্বর দারোগাকেও কত ক্ষুদ্র কত নীচ কত কুৎসিত মনে হইতে লাগিল। এই বীরেন্দ্রকে পীড়ন করিবার জন্য রাজবালা হইতেছে হংসেশ্বরের ঘুষ! রাজবালা পরোক্ষভাবে বীরেন্দ্রকে পীড়ন করিবার সহায়তা করিবে!—ইহা মনে করিয়া রাজবালার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল, তাহার নিজের প্রতি ধিক্কার আসিতে লাগিল, সে নিরুপায়ের উদ্বেগে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

কাল সকালেই তার গায়ে-হলুদ, কাল রাত্রেই তার বিয়ে! কেমন করিয়া সে নিজেকে বাঁচাইবে, কেমন করিয়া সে বীরেনকে রক্ষা করিবে, এই ভাবনাতে সে অস্থির হইয়া উঠিল। সে মরিলে সকল গোল মিটিয়া যায়। কিন্তু মরিতে তার বড় ভয়; আর মনে হইল অপঘাতে মৃত্যু দেখিয়া দয়াদেবী মৃতকল্প হইয়া আছেন, আবার সে মরিয়া তাঁহাকে একেবারে বধ করিবে হয়ত।

সমস্ত দিন সে বাদলা দিনের মতন থমথমে বিমর্ষ হইয়া কাটাইল। সন্ধ্যাবেলা মাকে খুঁজিতে গেল। হংসেশ্বরের সঙ্গে রাজবালার বিবাহ স্থির হইয়াছে শুনিয়াই রাজবালার মা যে আগা-গোড়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছেন, আর তিনি উঠেন নাই। রাজবালা মায়ের শিয়রে বসিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল—মা।

রাজবালা মায়ের কোন সাড়া পাইল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আবার ডাকিল—মা।

তবু মায়ের সাড়া নাই।

রাজবালা আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—মা, এর চেয়ে চল না আমরা বাড়ী চলে যাই।

তাহার মা কোনো সাড়া দিলেন না।

আবার রাজবালা বলিল—মা, চল, হোবপুরে চলে যাই।

এবার তাহার মা লেপের ভিতর হইতেই উত্তর দিলেন—তোর যেখানে খুসি যেতে হয় যা, আমাকে জ্বালাসনে।

রাজবালা চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আস্তে-আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি তখন প্রায় দুটো। রাজবালা বিছানায় উঠিয়া বসিল, ভাবনায় তাহার ঘুম আসিতেছিল না। বিছানায় একটুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বিছানা ছাড়িয়া সে উঠিল। আনলা হইতে নিজের র‍্যাপারখানি লইয়া গায়ে দিয়া দয়াদেবীর খাটের কাছে গেল।

দয়াদেবীর রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, প্রায়ই জাগিয়া থাকেন, অল্প তন্দ্রা আসিলেও অল্প একটু শব্দেই তন্দ্রা ভাঙিয়া যায়। রাজবালাকে অতি সন্তর্পণে তাঁহার খাটের কাছে আসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে রাজু ?

নিশীথ রাত্রে সেই ক্ষীণ স্বর শুনিয়াই রাজবালা খুব বেশী-রকম চমকাইয়া উঠিল, যেন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছে এমনি তার মুখের ভাব হইল। তাহা দেখিয়া দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমার কাছে আয় রাজু।

রাজবালা আস্তে আস্তে গিয়া দয়াদেবীর পায়ে মাথা রা[illegible] প্রণাম করিল।

দয়াদেবী রাজবালাকে বলিলেন—দেখ্ রাজু, কোনো দুঃখকেই ভেবে ভেবে বড়-করে তুলতে নেই। বীরেনকে তোর ভালো লেগেছিল, সে ক দিনের কতটুকু পরিচয়ে? যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তাকে এখন ভালো লাগছে না, কিন্তু ক্রমে পরিচয় হলে দেখবি সেই তোর সবার চেয়ে আপন হয়ে উঠবে। ভবিতব্যের ওপর ত মানুষের হাত নেই ভাই। মিছে মন খারাপ করিসনে, যা ঘুমুগে যা।

রাজবালা আস্তে আস্তে বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাজবালা পা টিপিয়া টিপিয়া নীচে নামিল, তারপর খিড়কীর দরজা সন্তর্পণে খুলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথে পড়িয়াই রাজবালার বুকের মধ্যে দুরদুর করিয়া উঠিল, গা ছমছম করিতে লাগিল। শীতকালের স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কিন্তু এ-সমস্ত কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া রাজবালা এক-রকম ছুটিয়া চলিল। কোথায় যাইতেছে তাহা সে জানে না, পথঘাট সে চেনে না; তবু সে ছুটিয়া চলিয়াছে বন্দীশালা হইতে দূরে গিয়া পড়িবার জন্য। তারপর দিনের বেলা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া পথ জানিয়া লইয়া সে তাহাদের বাসগ্রাম হোবপুরে চলিয়া যাইবে।

রাজবালা কতক্ষণ চলিয়াছে তাহা ঠিক নাই। ভয়ে উদ্বেগে ও ক্লান্তিতে সে হাঁপাইতেছে। তবু সে ছুটিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল সেই পথের বিপরীত দিক হইতে কে একজন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে। রাজবালার মনে হইল—যাঃ! বাড়ীতে জানাজানি হইয়া গিয়াছে, গুণময়ের চর তাহাকে ধরিতে ছুটিয়াছে।

রাজবালা থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পিছন দিকে ছুটিয়া গেলেও ঘোড়ার সঙ্গে ত সে ছুটিয়া উঠিতে পারিবে না; সে পথের ধারে পগারে নামিয়া পড়িয়া ঝোপের আড়ালে লুকাইবে ঠিক করিল। সে এই-সমস্ত ভাবিয়া ঠিক করিতে-না-করিতে ঘোড়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার সামনে পড়িল এবং সামনে কালো-র‍্যাপার-জড়ানো মূর্তি দেখিয়া ঘোড়া ভড়কাইয়া হঠাৎ পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিল। ঘোড়সওয়ার নিমেষ-মধ্যে ছিটকাইয়া মাটিতে গিয়া পড়িয়া "বাবারে!" বলিয়া কাতর

চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ঘোড়া ভার-মুক্ত হইয়া ও ছাড়া পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

রাজবালার আর পলায়ন করা হইল না, তার করুণ নারীহৃদয় তখনি নিজের কথা ভুলিয়া বিপন্নের দুঃখে কাতর হইয়া উঠিল, না জানি লোকটির কত চোটই লাগিয়াছে! সে তাড়াতাড়ি পতিত লোকটির কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াই চমকাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল—সে যে হংসেশ্বর দারোগা!

হংসেশ্বরের ঘোড়া ভড়কাইয়া খাড়া হইয়া উঠিতেই হংসেশ্বর ঘোড়ার পিছনেই সরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সেজন্য তাহার বেশী চোট লাগে নাই, সে আতঙ্কেই চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সে মাটিতে পড়িয়া থাকিয়া অনুভব করিয়া দেখিয়া লইতেছিল তাহার চোটটা কি পরিমাণ লাগিয়াছে। সেই সময় তাহার মুখের উপর রাজবালার সুন্দর মুখখানি করুণায় উদ্বেগে ব্যাকুল হইয়া নত হইয়া আসিতেছে দেখিয়াই হংসেশ্বর আঘাত বিপদ সব ভুলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল— "আপনি……তুমি এখানে? তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?"

রাজবালা একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—আমি হোবপুরে যাচ্ছিলাম।

হংসেশ্বর গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—একলা তুমি হোবপুরে যাচ্ছিলে!……রাত পোয়ালেই না আমাদের বিয়ে হবার কথা?……আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই বলে আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন?

রাজবালা অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল—হ্যাঁ।

হংসেশ্বর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনাকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে বলেই যে আপনার আমাকে ভালো লাগবে তার কোনো মানে নেই। বেশ! আপনি হোবপুরেই যাবেন; কিন্তু

একলা যাবেন না, পথে বিপদ-আপদে পড়তে পারেন। এখন আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনার সঙ্গে একজন মেয়েলোক আর জন দুই চৌকীদার দিয়ে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।

রাজবালা অবাক হইয়া হংসেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইল। হংসেশ্বর রাগ করিল না, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিবার কোনো কথা বলিল না, বরং উল্টা লোক সঙ্গে দিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিবে! ইহা রাজবালার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য্য ঠেকিল। এতদিন গুণময়ের যে ব্যবহার সে দেখিয়া আসিয়াছে তাহাতে পুরুষের উপর তাহার বড় একটা বিশ্বাস ছিল না, তাহাতে আবার এই হংসেশ্বর তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। রাজবালার মনে হইল হংসেশ্বর হয়ত তাহাকে স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া বন্দী করিবার ফন্দি করিয়াছে। কিন্তু রাজবালা ভোরের আলোতে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল, তথাপি হংসেশ্বরের মুখে দুষ্ট অভিসন্ধির আভাস দেখিতে পাইল না, হংসেশ্বরের কথাতেও প্রতারণার স্বর সে ধরিতে পারে নাই।

রাজবালাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভাবিতে দেখিয়া হংসেশ্বর বলিল—আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না? বিশ্বাস করুন আমাকে, আপনি যা হুকুম করবেন আমি তাই করব। বাড়ীতে গিয়েই ঝি সঙ্গে নিয়ে আমিই না হয় আপনাকে রেখে আসব।

রাজবালা আর-একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল—তবে শিগ্‌গির চলুন, বেলা হলে রায়-মহাশয় টের পাবেন।

হংসেশ্বর পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিল। দুজনেই নির্ব্বাক।

কাল একটা খুনের তদন্তে হংসেশ্বর গ্রামান্তরে গিয়াছিল। আজ তাহার বিবাহ বলিয়া সে রাতারাতি ঘোড়া ছুটাইয়া থানায় ফিরিতেছিল, পথে সাক্ষাৎ তাহারই ভাবী বধূর সঙ্গে। ব্যাপারটা একেবারে উপন্যাসের

উপযুক্ত। কিন্তু তাহা যে এমন বিয়োগান্ত হইবে তাহা হংসেশ্বর ভাবে নাই। যে মেয়েটিকে তাহার ভালো লাগিয়াছে সে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অসহায় অবস্থায় পলাইতেছে, তাহার সামনে না পড়িলে নাজানি কোন্ বিষম বিপদে পড়িতে পারিত। এই চিন্তাতে হংসেশ্বরকে এমন উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল ও সে নিজের কাছে ও রাজবালার কাছে এমন একটা লজ্জা অনুভব করিতেছিল যে সে আর কিছু ভাবিতেছিল না, কেবল ভাবিতেছিল কেমন করিয়া গুণময়ের অজ্ঞাতসারে রাজবালাকে তাহার বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে পারিবে। রাজবালাকে হাতে পাইয়া বাধ্য করিয়া বিবাহ করিবার সম্ভাবনা দেখিয়াও সে দেখিতে চাহিল না।

হংসেশ্বর আপনার বাড়ীর উঠানে গিয়া ঢুকিল, পিছনে পিছনে ঢুকিল রাজবালা। হংসেশ্বরের মাতৃহীন শিশু-পুত্রটি উঠানের যে-পাশে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে সেখানে খেলা করিতেছিল, তাহার পাশে তাহার ঝি বসিয়া তাহাকে আগলাইতেছিল। বাবাকে আসিতে দেখিয়াই শিশু খেলা ফেলিয়া "বাবা এচেচে লে।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাবার কাছে ছুটিয়া যাইতে গিয়া তাহার বাবার পশচাতে আর-একজন কাহাকেও আসিতে দেখিয়া দুই বছরের খোকা থমকিয়া দাঁড়াইল। হংসেশ্বর ও রাজবালাকে আসিতে দেখিয়া ঝিও তটস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া রাজবালাকে দেখিতেছিল—এই অপরূপ রূপসী কে? খোকা এক মুহূর্ত্ত রাজবালার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে তাহার হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিয়া উঠিল—"মা এলি!" শিশু আজ মাসাধিক হইল তাহার মাকে হারাইয়া ব্যাকুল হইয়া আছে; তাহাকে প্রতিদিন এই বলিয়া ভুলাইয়া রাখা হইয়াছে যে মা অসুখ সারিতে ভালো জায়গায় গিয়াছেন, ভালো

হইলেই খোকার কাছে ফিরিয়া আসিবেন। তাই আজ এই শীতকালের প্রভাতের অস্পষ্ট আলোতে রাজবালাকে দেখিয়া মা বলিয়া ভুল করিয়া খোকা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

রাজবালা তাড়াতাড়ি সেই ব্যথিত শিশুকে কোলে তুলিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। খোকা তাহার দুই হাতে রাজবালার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গালের উপর গাল রাখিয়া মিনতির স্বরে বলিল—"মা তোল্ কোকাকে চেলে আল্ যাচ্ নে!"

এই মাতৃহীন শিশুর এই মিনতিতে রাজবালার কোমল মন আর্দ্র হইয়া গেল, তাহার অক্ষিপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল। রাজবালা সম্মুখে চাহিয়া দেখিল হংসেশ্বরের চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতেছে, ঝিও আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছে।

রাজবালা এ কোথায় আসিয়া কাহার কাছে বন্দী হইল! এই বাড়ীতে আসিবে না বলিয়াই ত সে পলাইতেছিল!

হংসেশ্বর চোখ মুছিয়া ম্লান মুখে রাজবালাকে বলিল—খোকা আজকে আবার মা-ছোড় হবে! খোকাকে হয়ত আর আমি বাঁচাতে পারবো না।

রাজবালার মন এই অচেনা শিশুর অশুভ আশঙ্কায় পীড়িত হইয়া উঠিল, সে দুই হাতে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহা দেখিয়া ভরসা পাইয়া হংসেশ্বর বলিল—তোমাকে খোকা মা বোলে এ বাড়ীতে অভ্যর্থনা করেছে, তুমি আর আপত্তি কোরো না; তুমি খোকার মা হয়েই এই বাড়ীতে এস; তুমি যদি কখনো দয়া করে আমার সম্পর্ক স্বীকার কর আমি কৃতার্থ হব, নইলে আমি তোমার থেকে পৃথক থাকব কথা দিচ্ছি।

রাজবালা হংসেশ্বরের চেহারা দেখিয়া তাহাকে যতটা কদর্য্য ভাবিয়াছিল, ব্যবহারে দেখিল সে ততটা নয়; তাহার কেমন মনে হইল

হংসেশ্বর তাহাকে ভালো বাসিয়াছে ; যদি সে হংসেশ্বরের গৃহিণী হইয়া তাহার কাছে আসে তবে হয়ত বীরেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইতেছে তাহা হইতে হংসেশ্বরকে অন্তত দূরে রাখিতে পারিবে। জমিদারের অত্যাচারের সহায় পুলিশ হইলে বীরেনের অবস্থা যত বিপদসঙ্কুল হইত, হংসেশ্বরকে নিবৃত্ত রাখিতে পারিলে ততটা হইবে না। তারপর বিবাহ যখন তার অনিবার্য্য ও বীরেনকে পাইবার যখন সম্ভাবনা নাই, তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হংসেশ্বরকে বিবাহ করাই তাহার মন্দের ভালো। এই ভাবিয়া রাজবালা হংসেশ্বরের মুখের দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—খোকার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করুন।

হংসেশ্বর ব্যথিত হইয়া বলিল—এত বড় অবিশ্বাস আমাকে, আমি পুলিশ বলে! আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, এর অন্যথা হবে না—আমার খোকার কল্যাণ এর জামিন।

রাজবালা খুসী হইয়া বলিল—আমায় জমিদার-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন তবে।......আমি খোকাকে নিয়ে যাব ?

হংসেশ্বরও আনন্দিত হইয়া বলিল—ও খোকা ত তোমারই।

(৩৭)

সকাল হইলে মোহিনী দাসী রাজবালাকে খুঁজিয়া পাইল না। দয়াদেবীর ঔষধ পথ্য দেওয়া হয় নাই, রাজবালা গেল কোথায় ? মায়া জানে না। রাজবালার মা জানেন না, তিনি লেপের মধ্য হইতে ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—কে জানে সে আবাগী কোন্ চুলোয় আছে না আছে ?

মোহিনী আসিয়া অবশেষে ভয়ে ভয়ে শুক্‌নো মুখে দয়াদেবীকে বলিল—মা, মাসিমাকে বাড়ীতে দেখতে পাচ্ছি না ত!

দয়াদেবী শঙ্কিত হইয়া বিছানার উপর কনুইএ ভর দিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ! সব জায়গা খুঁজেছিস?

—সকাল থেকেই ত খুঁজছি, কোথাও নেই।

—তাইতে সে কাল রাতে আমার কাছে বিদেয় নিয়ে গেল। রাজুও কি শেষে মরল নাকি?......

দয়াদেবী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দাসী-চাকরদের মধ্যে ছুটাছুটি লাগিয়া গেল, মায়া উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিল।

রাজবালার মা লেপের মধ্য হইতে আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—আজ বাড়ীতে বিয়ে কিনা তাই মড়াকান্না উঠেছে! কি হল আবার, দেখি।

তিনি বাহির হইয়া আসিয়া একজন দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ব্যাপার লা?

—মাসিমাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই শুনে মা মূর্চ্ছো গেছেন।

রাজবালার মা বলিয়া উঠিলেন—মরেছে! আপদ গেছে!

তিনি আবার গিয়া আগাগোড়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ক্রমে কথাটা গুণময়ের কানেও পৌঁছিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—এ সমস্ত সেই বীরে ছোঁড়ার কারসাজি! কাল এসে রাজুকে নিয়ে ভেগেছে! বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! জানে না ত গুণময় রায় কি রকম লোক!—এই চতুর, পাঁচু-দা'কে শিগ্গির ডাক্।

পঞ্চানন আসিতেই গুণময় বলিয়া উঠিলেন—শুনেছ ত বীরে ছোঁড়ার বুকের পাটার কথা। এখুনি হুলিয়া করে দাও, তার মাথাটা কেটে নিয়ে আসুক। হংসেশ্বর দারোগাকেও খবরটা পাঠিয়ে দিয়ো—পুলিশের ক্রোধ জিনিষটা যে কেমন বীরেটা একটু চেখে দেখুক।

এমন সময় সেই ঘরে হংসেশ্বর আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই গুণময় বলিয়া উঠিলেন—বীরে যে তোমার বউকে নিয়ে কাল রাতে ভেগেছে!

হংসেশ্বর বলিল—আমি তাঁকে রাস্তায় পেয়ে ফিরিয়ে এনেছি।

গুণময় জিজ্ঞাসা করিলেন—আর বীরেটা?

—তাকে ত কৈ দেখতে পেলাম না!

—সট্‌কেছে! পুলিশ লেলিয়ে গেরেপ্তার করো তাকে।

—এর মধ্যে বীরে ছিল নাকি? তবে যাই দেখি গে।

হংসেশ্বর বীরেনের উপর জাতক্রোধ হইয়া তাহাকে গেরেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করিতে গেল।

ওদিকে যখন ডাক্তার আর চাকর-দাসীরা দয়াদেবীর চেতনা ফিরাইবার জন্য নানাবিধ তাহুত করিতেছিল, তখন হংসেশ্বরের খোকাকে কোলে করিয়া রাজবালা সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই মোহিনী বলিয়া উঠিল—এই যে মাসিমা! ভালো মেয়ে বাবা তুমি! কোথায় লুকিয়েছিলে বাছা! মা যে ভির্মি গিয়ে যায়-যায় হয়েছিল!

রাজবালা লজ্জিত ম্লান মুখে আগাইয়া গিয়া দয়াদেবীর শিয়রের কাছে দাঁড়াইল। দয়াদেবী হাতের ইসারা করিয়া সকলকে ঘর হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। সকলে চলিয়া গেলে ক্ষীণ কণ্ঠে দয়াদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—ওটি কার ছেলে রাজু?

খোকা দিব্য সপ্রতিভ ভাবে রাজবালার গলা দুহাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমি মাল্ ছেলে!

রাজবালা লজ্জিত হইয়া বলিল—আমি পালিয়ে যাচ্ছিলাম দিদি। পথে পড়ে গেলাম দারোগার সামনে। তিনি সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে

গেলেন, লোক সঙ্গে দিয়ে আমায় হোবপুরে পাঠিয়ে দেবেন বলে। বাড়ীতে যেতেই খোকা আমায় মা বলে জড়িয়ে ধরলে……

খোকা বলিয়া উঠিল—মা দুত্তু! কালি কালি পালিয়ে দায়! আমি আল্ দেতে দেবো না……

বলিয়া খোকা মাথা নাড়িতে লাগিল।

রাজবালা পরম স্নেহে খোকাকে চুম্বন করিল।

দয়াদেবী বলিলেন—দেখ রাজু, ভবিতব্য যেখানে তোকে টানছে, তা তুই খণ্ডাতে চাসনে! আমাকে কথা দে, আর তুই কিছু অনর্থ ঘটাবিনে।

রাজবালা মাথা নত করিয়া বলিল—না দিদি, আমি হার মেনেছি।

মায়া আস্তে আস্তে রাজবালার কাছে আসিয়া ম্লান মুখে তাহার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মাসি, তোমাকে সেই দারোগাকেই বিয়ে করতে হবে? আমাকেও সেই বুড়োটাকেই বিয়ে করতে হবে?……

বলিতে বলিতেই মায়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাজবালা কিছু না বলিয়া মায়াকে গায়ের কাছে টানিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। দয়াদেবীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

(৩৮)

পরদিন প্রভাতে দুইজন পাইক গিয়া পণ্ডিতকে খবর দিল—নায়েব-মশায় ডাকছেন।

পণ্ডিত বলিল—আমি ত নায়েবের এক কড়াও ধারি না, নায়েবের দরকার থাকে তাঁকেই গরিবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে বলগে।

—তুমি না গেলে তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন।

—তা তোমরা ত পারবে না। কেন মিছেমিছি দাঙ্গা ফসাদ করবে।

আমরা কোনো দোষ করে থাকি নালিশ করতে বলগে, আদালত যে শাস্তি দেবে তা মাথা পেতে নিতেই হবে।

পাইক দুজন পতিতের কথা বুঝিল না বলিয়া বারণ শুনিল না, পতিতকে দুই দিক হইতে ধরিতে গেল। পতিত চকিতে একজন পাইকের হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। পাইক দুজন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

অল্পক্ষণ পরেই স্বয়ং পঞ্চানন কয়েকজন লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া পতিতকে শিক্ষা দিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বোধ হইল সে নিকটে কোথাও প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

পতিতকে দাঙ্গায় জড়াইবার আয়োজন দুতিন দিন হইতেই হইতেছিল। সুতরাং গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল যে নায়েব পতিতের সঙ্গে দাঙ্গা করিবে; তাই যে যেখানে ছিল লাঠি-সোঁটা সংগ্রহ করিয়া পতিতকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিতেছিল। জমিদারের লাঠিয়াল ও ক্ষিপ্ত প্রজাদের মধ্যে মহা দাঙ্গা বাধিয়া গেল।

পতিত ও বীরেন্দ্র তাড়াতাড়ি দাঙ্গা থামাইতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু গণ্ডগোলে কে বা তাহাদের কথা শোনে।

হঠাৎ দেখা গেল পুলিশের জমাদার ও রাইটার কনষ্টেবল থানার সমস্ত কনষ্টেবল ও চৌকীদার লইয়া বড় বড় লাঠি কাঁধে করিয়া ছুটিয়া সেই দিকে আসিতেছে। তাহারাও দাঙ্গা বাধিবার প্রতীক্ষায় নিকটেই কোথাও লুকাইয়া ছিল।

পুলিশের লাল পাগড়ী দেখিয়াই প্রজাদের যুদ্ধস্পৃহা দূর হইয়া গেল; সকলে লাঠি গুটাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বিপরীত দিকে দৌড় মারিল।

যুদ্ধক্ষেত্র মুক্ত দেখিয়া জমিদারের লাঠিয়ালেরা হুঙ্কার করিয়া পতিত ও বীরেন্দ্রকে ঘেরাও করিল।

পঞ্চানন হুকুম দিল—বাঁধ ওদের পিঠমোড়া করে!

একা পতিত লাঠি ধরিয়া অসংখ্য লাঠিয়ালের আঘাত হইতে বীরেনকে ও আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে। ভাইকে বিপন্ন দেখিয়া ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পতিতের ভগিনী একটা বন্দুক ভরিয়া আনিয়া পঞ্চাননের দিকে ফিরাইয়া নিশানা করিতেছিল, কিন্তু তাহার গুলি করিবার আগেই থাকো তাঁতিনী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া একটা শাবলের বাড়ি পঞ্চাননের মাথায় সজোরে এক ঘা কষাইয়া দিল। পঞ্চানন "বাপরে" বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। এই দুই রণরঙ্গিণী স্ত্রীলোকের আবির্ভাবে ভয় পাইয়া লাঠিয়ালেরা থতমত খাইয়া হঠিয়া পিছাইয়া গেল; এবং সেই ফাঁকে ছাড়া পাইয়া পতিত ছুটিয়া গিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত রক্তাক্ত পঞ্চাননকে ধরিয়া তুলিয়া কোলে শোয়াইল এবং বীরেন্দ্র গিয়া পতিতের ভগিনীর হাত হইতে বন্দুকটা কাড়িয়া লইল। আর অমনি পুলিশের জমাদার আসিয়া তাড়াতাড়ি পতিত ও বীরেন্দ্রের হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল। থাকোকে সেখানে দেখিতে পাওয়া গেল না। একজন চৌকীদার পতিতের ভগিনীকে ধরিতে যাইতেছিল; পতিত বলিল—খবরদার, মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিও না, তাহলে ভয়ানক খুনোখুনী হবে।

কি ভাবিয়া জমাদার বলিল—মেয়েদের ছেড়ে দাও, এই দুজন প্রধান আসামী গেরেপ্তার [illegible] এতেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

(৩৯)

কাল রাত্রে মায়া ও রাজবালার চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে; আজ বরকনে বিদায় হইবে। তাহাদের জন্য জমিদার-

বাড়ীর সদর দরজায় চারখানা পাল্কী অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারই একখানা আনাইয়া পঞ্চাননকে ধরাধরি করিয়া তাহাতে উঠাইল, এবং সেই পাল্কীর পিছনে পিছনে হাতকড়ি-দেওয়া বন্দী বীরেন্দ্র ও পতিতকে পুলিশের লোকেরা ঘিরিয়া লইয়া চলিল।

গাঁটছড়া-বাঁধা মায়া ও রসময় এবং রাজবালা ও হংসেশ্বর পাল্কীতে চড়িবে বলিয়া যেমন দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে ঠিক সেই সময় বীরেন ও পতিতকে পুলিশের লোকেরা হাতকড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইয়া সেখানে আসিয়া পৌছিল। রাজবালা ও মায়ার মুখের দিকে লজ্জিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বীরেন মুখ নত করিল। তাহা দেখিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুসাগর গোপন করিবার জন্য রাজবালা মুখের উপর খুব বড় করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল। হংসেশ্বর জমাদারকে বলিল—ওদের নিয়ে গিয়ে হাজতে বন্ধ করে রাখগে, আমি এখনি যাচ্ছি।

বরকনেকে বিদায় দিবার জন্য গুণময় লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া নীচে নামিয়াছিলেন; রাজবালার মা সেই যে লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিলেন যথাসময়ে স্নানাহার করিতে ওঠা ছাড়া তিনি আর শয্যা ত্যাগ করিতেন না। গুণময় বীরেনকে দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—এইবার পতিতের ওকালতী করতে চললে ত?

বীরেন সে কথার কোনো উত্তর দিল না।

ইতিমধ্যে মোহিনী ঝি বীরেনকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া দয়াদেবীকে বলিল—মা গো মা, বীরেন-দাদাবাবুকে পুলিশে হাতকড়ি দিয়ে ধরে এনেছে!

দয়াদেবী হঠাৎ এক দমকে বিছানা হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় রে?

মোহিনী বলিল—সদর দেউড়ীতে।

দয়াদেবী পাগলের মতন সদর দেউড়ীর উদ্দেশে ছুটিলেন। মোহিনী পিছনে পিছনে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল—ওমা, তুমি পড়ে যাবে! ওমা, তুমি পড়ে যাবে!

দয়াদেবী এক ছুটে একেবারে সদর-দেউড়ীতে গিয়া বীরেনকে দূর হইতেই দেখিতে পাইয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—"বাবা বীরেন!" তারপর সকল লোককে ঠেলিয়া সরাইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া বীরেনের গলা জড়াইয়া-ধরিতে গেলেন। বীরেনের বুকের উপর তাঁহার দেহ এলাইয়া ঢলিয়া পড়িল। বীরেন তাড়াতাড়ি হাতকড়ি-বাঁধা যুক্ত করে কোনোরকমে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া আস্তে-আস্তে বসিয়া নিজের কোলের উপর শোয়াইল। চাকরদাসীরা ছুটাছুটি পাখা জল ডাক্তার আনিতে গেল।

ডাক্তার আসিয়া বলিল, যে দয়াদেবীকে ধরিয়া বিছানায় বসাইতে হইত, তিনি অকস্মাৎ উত্তেজনায় এতখানি পথ দৌড়িয়া আসার শ্রম সহ্য করিতে না পারাতে তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

বীরেন তাহা শুনিয়া বলিয়া উঠিল—মা, আমাকে আবার মাতৃহীন করে গেলে!

এই কথা শুনিয়া রাজবালা দয়াদেবীর বুকের উপর আছাড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—দিদিগো!……

রাজবালার কান্না দেখিয়া মায়াও কাঁদিয়া উঠিল। মোহিনী ডুকরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজবালার মা লেপ একটু সরাইয়া কান পাতিয়া কান্না শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ভ্যালা জ্বালাতন! একটু নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোবার জো নেই!

গুণময় মোহিনীকে ধমক দিয়া উঠিলেন—থাম্ না মাগী, কী হাঁউমাঁউ করে চেঁচাচ্ছিস !······রাজু, মড়া ছেড়ে ওঠো, এই সময় আবার মড়া ছোঁয়া হল !···মায়া, আঃ ! থাম্ বলছি ! কি পিঁপিঁ করে কাঁদিস !······

তারপর রসময়কে ও হংসেশ্বরকে বলিলেন—তোমরা পাল্কীতে উঠে চলে যাও। আমরা তারপর সৎকারের ব্যবস্থা করছি। গিন্নি গেছেন ভালোই গেছেন, হাতের নো সিঁথের সিঁদুর নিয়ে গেলেন। তবে দুদিন আগে গেলেই সব দিকে ভালো হত ! যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি !···তোমরা পাল্কীতে উঠে পড়, উঠে পড়।···

রসময় মায়াকে এবং হংসেশ্বর রাজবালাকে টানিয়া জোর করিয়া পাল্কীতে চড়াইয়া দিল। রাজবালা পাল্কীতে চড়িয়াই দেখিল তাহার পাল্কীময় রক্ত। সেই পাল্কীতে করিয়া জখমী পঞ্চাননকে উঠাইয়া আনা হইয়াছিল।

দয়াদেবীর মৃতদেহ সমাগত লোকেরা ধরাধরি করিয়া তুলিয়া বাড়ীর উঠানে লইয়া আসিল।

হংসেশ্বর দারোগার পাল্কীর পিছনে-পিছনে হাতকড়ি-বাঁধা বীরেন্দ্র ও পতিত থানায় চলিল।

রাজবালা পাল্কীতে বসিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে ভাবিতেছিল—চমৎকার বিবাহ ! চারিদিকে রক্ত মৃত্যু বন্ধন ! সে যেখানে স্বামীর ঘর করিতে যাইতেছে, বীরেন্দ্র যাইতেছে সেইখানেই বন্দী হইয়া !

(৪০)

মারপিট দাঙ্গা খুন জখমের দায়ে বীরেন্দ্র ও পতিত দায়রায় অভিযুক্ত হইয়াছে।

পতিত বক্তৃতা দিয়া প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল; বীরেন্দ্র গুণময়ের খাইয়া মানুষ, তবু সে নিমকহারামী করিয়া তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া পতিতের দলে গিয়া ভিড়িয়াছিল;—ইহা সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল এবং পতিত ও বীরেন্দ্রও এ কথা অস্বীকার করিল না।

নায়েব পঞ্চানন বিদ্রোহী প্রজার আক্রমণের ভয়ে সর্ব্বদা আরদালী লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া ফিরিত; সেদিন জমিদারবাড়ীতে বিবাহ ছিল, বরকন্যার বিদায়ের আয়োজন করিবার জন্য সে পতিতের বাড়ীর সামনে দিয়া যাইতেছিল; বিনা কারণে অকস্মাৎ পতিত চড়াও হইয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া দ্যায় ও বীরেন বন্দুক লইয়া গুলি করিতে আসে; পুলিশের জমাদার সেই সময় সেই পথে দারোগার বিবাহের পর দারোগাকে আনিতে যাইতেছিল; সে আসিয়া বন্দুক-সুদ্ধ বীরেন্দ্রকে ও পতিতকে গেরেপ্তার করে, নতুবা আরো খুনখারাপী হইত।

পতিত ও বীরেন্দ্র জমিদার-পক্ষের এই উক্তির কতক স্বীকার করিল, কতক করিল না। পতিত পঞ্চাননকে মারে নাই বলিল; কিন্তু কে মারিয়াছে তাহা সে বলিল না। বীরেন্দ্রের হাতে গুলিভরা বন্দুক ছিল ইহা সে স্বীকার করিল, কিন্তু কাহাকেও মারিবার জন্য নহে, বাঁচাইবার জন্য; কেমন করিয়া সে বন্দুক তাহার হাতে আসিল তাহা সে কিছুতেই বলিল না। বন্দুক পতিতেরই, তাহা উভয়েই স্বীকার করিল।

আসামীরা অপরাধ স্বীকার না করিলেও তাহাদের অপরাধ পাকে প্রকারে প্রমাণ হইয়া গেল। বিচারে পতিতের যাবজ্জীবন ও বীরেন্দ্রের দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হইল।

সেইদিন গুণময় ও পঞ্চানন উল্লাসের আতিশয্যে কালীকে জোড়া পাঁঠা দিয়া পূজা দিয়া খুব ধুম করিয়া ভোজ দিল।

রাজবালা স্বামীর মুখে খবর শুনিয়া লুকাইয়া-লু[illegible] খুব কাঁদিল।

গুণময় এতকাল পরে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন [illegible]দেবী মরিয়াছেন, বীরেনটা দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরে গিয়াছে, হয়ত আর ফিরিতে হইবে না। পতিতের অভাবে সকল প্রজা কাবু হইয়া বশ মানিতেছে। এখন তিনি বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া একটি মেয়ে দেখিতে মন দিবার অবসর পাইয়াছেন। তিনি হাসিমুখে পঞ্চাননকে বলিলেন—পাঁচুদা, আর কতকাল গৃহশূন্য হয়ে থাকবো? ছোট ভাইটির একটা হিল্লে লাগিয়ে দাও।

পঞ্চাননও হাসিভরা মুখে বলিল—সে আর আমায় মনে করিয়ে দিতে হবে না ভাই।

(৪১)

বীরেন্দ্রের দশবৎসরের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ড হওয়ার বছর ছয় পরে কাৎলামারী গ্রামের পথ দিয়া প্রভাতে একটি তরুণ সুকুমার প্রিয়দর্শন সন্ন্যাসী যাইতেছিল; তাহার কৃশ ঋজু গৌর দেহ, বড় বড় চোখ দুটি বিষাদে আনত, প্রিয়দর্শন সুন্দর মুখখানি দুঃখে ম্লান; দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামানো, সেজন্য বয়সের চেয়েও তাহাকে তরুণ দেখাইতেছিল —বয়স ২৬।২৭ বৎসরের বেশী হইবে না। তাহার এক হাতে একটি ছোট পোঁটলা, একহাতে একগাছি লাঠি। সে পথ চলিতে চলিতে আপন মনে গুনগুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল—

> "তুমি শ্যামল ব্রজ ছেড়ে কেন শ্যাম এলে এই পুরে?
> তোমার পথ-পাথরে নাই যে তৃণ ওগো রস দূরে দূরে!—
> হেথায় পথ-পাথরে নাই যে তৃণ হেথায় রস দূরে দূরে!

হেথায় বসে তোমার সিংহাসন কঠিন পাষাণে,
হেথা কোমল ব্রজের তৃণের রেখা না দেখি নয়ানে,
হেথা কোমল ব্রজের শ্যামল তৃণ না দেখি নয়ানে ;
হেথায় কতই শোভা মনোলোভা তোমার রতন মণি,
আমার নীরস ভূঁয়ে প্রাণ কাঁদে যে হেথায় মরণ গণি !"

তাহার সুমধুর কণ্ঠ, সুশ্রী চেহারা, আর তরুণ বয়স পথের ও পথপার্শ্বের সকল লোকেরই মন মুগ্ধ করিতেছিল। সন্ন্যাসী একজন চাষীকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ ভাই, তুমি বলতে পারো এখানকার থানার দারোগার নাম কি ?

সন্ন্যাসী তাহার সহিত কথা কহিয়াছে এই গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া সে ব্যগ্রভাবে বলিল—এজ্ঞে, হংসেশ্বর দারোগা !

—তিনি কি এখানে সপরিবারে থাকেন ?

—হ্যাঁ, তানার ইস্তিরী আর ছেলে থানার বাসাতেই আছেন।

—তারা বেশ ভালো আছে ?

এ কথার উত্তর কি দিবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী সনাতন চাষার সঙ্গে কথা কহিতেছে দেখিয়া সেখানে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা আসিয়া জড়ো হইয়াছিল। সনাতন তাহাদের মুখের দিকে চাহিল। ক্ষান্ত জেলেনী বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, দারোগা-বাবুর বাড়ীতে সবাই ভালো আছে ; আমি রোজ মাছ বেচতে যাই। গিন্নি খুব ভালো লোক। তবে দারোগা-বাবুর গরিবের পর দয়াটা কিছু কম……

সনাতন ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—তুই চুপ থাক না, তোর ওসব কথায় কাজ কি ?

ক্ষান্ত লজ্জিত হইয়া চুপ করিল।

সন্ন্যাসী ক্ষান্তর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দারোগা-বাবুর ছেলেপুলে কি ?

ক্ষান্ত বলিল—বেটের কোলে একটি খোকা, বছরসাতেক বয়েস হল, তারপর আর হয়নি—মিন্সে ত অমন বৌকে দেখতে পারে না…

সন্ন্যাসী সেইখানে গাছতলায় মাটিতে বসিল।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোথায় যাবা ?

—এইখানেই থাকবো ভাই।

—খাবা কি ?

—যা তোমরা দেবে।

—তবে আমাদের বাড়ী চলেন, পাক-সাক করে খাবেন।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—আমি পাক-সাক করতে পারবো না ভাই, তোমাদের পাক-সাক ত হবে, তাই দুটি দুটি দিয়ো।

সনাতন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমাদের ছোঁয়া খাবা ? তুমি কি জাত ?

সন্ন্যাসী মিষ্ট হাসিতে সকলকার মন ভুলাইয়া বলিল—আমি ভাই মানুষ, সকল মানুষই আমার জাতভাই, আমি সকলকার ছোঁয়াই খাই।

বেণী ময়রা পরম বিজ্ঞভাবে সনাতনকে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—লোকে তবে তোদের চাষা বলবে কেন যদি এই কথাই তুই জানবি, সন্ন্যাসীরা পৈতে পুড়িয়ে ভগবান হয় জানিস ?

পৈতা যে পুড়াইতে পারে সে যে ভগবান হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। সকলে সবিস্ময় সম্ভ্রমে সন্ন্যাসীর স্মিত প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিল।

সনাতন হাত জোড় করিয়া বলিল—ঠাকুর, তবে গা তুলে অধমের বাড়ীতে চলেন।

সন্ন্যাসী উঠিয়া সনাতনের কাঁধে হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিল—অধম কি রে! যে লোক পথ থেকে অচেনা অতিথিকে ডেকে নিয়ে ঘরে আশ্রয় দিতে পারে সে ত উত্তম।

সকলে ভাবিল সনাতনের অদৃষ্টে খুব শুভগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছে, সনাতন এইবার রাং হইতে সোনা করা শিখিয়া লইবে। কিন্তু বেণীময়রা বিজ্ঞভাবে বলিল—বেটা পাকা জোচ্চোর! নইলে যার অমন সুন্দর চেহারা সে কি কখন সন্ন্যাসী হয়। সনাতন ঘরে ঠাঁই দিলেন, শেষে পস্তাতে হবে! তোমরা সব বৌ ঝি একটু সাম্‌লে রেখো।...

সন্ন্যাসী সনাতনের বাড়ীতে গিয়া দাওয়ায় বসিয়া আপনার পোঁটলাটি খুলিল; তাহার মধ্যে কি শিকড়-বাকড় জড়ি-বটী আছে দেখিবার জন্য ছেলে-বুড়ো সবাই ঝুঁকিয়া পড়িল; পোঁটলায় আছে খান দুই কাপড়, খান দুই উত্তরীয়, খানকতক বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বই, একটা ছোট কাঠের বাক্স, আর একটা বিস্কুটের কৌটা। সন্ন্যাসী কৌটাটি খুলিয়া কিছু লোজেঞ্জেস বাহির করিয়া সমাগত উৎসুক শিশুদের হাতে হাতে বণ্টন করিয়া দিল। মিষ্টির ঘুষ দিয়া দিয়া এক একটি ছেলেমেয়েকে বশ করিয়া কাছে টানিয়া টানিয়া সন্ন্যাসী তাহাদের সহিত গল্প জুড়িয়া দিল—বাঘের রাক্ষসের ভূতের গল্প, কত দেশ-বিদেশের কাহিনী। অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ন্যাসী শিশুদের প্রিয় হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিল—তোমাদের মধ্যে যে যে আমার কাছে রোজ সকালে বিকালে পড়তে আসবে তাদের আমি রোজ খেতে দেবো, গল্প বলবো, বাঁশী পুতুল ঘুড়ি তৈরী করে দেবো......

অমনি সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—ঠাকুর, আমি আসবো।

গাঁয়ে খবর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; দলে দলে লোক আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী হাসিয়া সকলকে বলিল—আমি ভাই, তোমাদেরই মতন সামান্য গরিব মানুষ; বেশী কাপড় নেই বলে পথ হাঁটবার কাপড়খানা গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে নিয়েছি। তোমরা প্রণাম করে করে আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ; অল্পক্ষণ পরে আমার মনেও ধারণা হবে যে আমি একটা মহাপুরুষ। আসলে আমি ভাই অতি সামান্য লোক!

সকলে বলিয়া উঠিল—আপনি দেবতা! আমাদের কিছু উপদেশ দিতে হবে আপনাকে!

সন্ন্যাসী একটু ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা, তোমরা একটা জায়গা ঠিক কোরো, আমি রোজ সন্ধ্যেবেলা কথকতা করবো। আজ থেকেই সুরু করে দেওয়া যাবে, কি বলো?

সকলে কৃতার্থ হইয়া বিদায় লইল।

সনাতনের বাড়ীর সামনে পথে খানিকটা জায়গায় কাদা জমিয়াছিল; যত লোক আসা-যাওয়া করিতেছিল সেই কাদা ভাঙিয়া; গাঁয়ের বৌঝিরা ঘাটে জল আনিতে যাইতেছিল সেই কাদা ভাঙিয়া; বোঝাই গরুর গাড়ীর চাকা সেই কাদায় বসিয়া গিয়া গরুগুলির ক্লেশ হইতেছিল। সন্ন্যাসী বসিয়া বসিয়া দেখিয়া ছেলেদের বলিল—ওরে বাঁদররা খেলা করবি?

"করবো ঠাকুর!" বলিয়া সকলে লাফাইয়া নাচিয়া উঠিল।

—তবে খানকতক কোদাল জোগাড় কর।

তৎক্ষণাৎ কোদাল হাজির। স্বয়ং সন্ন্যাসী ও জনকয়েক বড় ছেলে পথের নয়নজুলিতে মাটি কাটিতে লাগিয়া গেল; ছোট ছোট ছেলেরা সেই মাটি ঝুড়িতে ভরিয়া রাস্তার কাদার উপর ঝুপঝাপ ফেলিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে রাস্তা মেরামত হইয়া উঠিল।

সনাতন তাড়াতাড়ি আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—প্রভু,

আমাদের অপরাধ হবে যে, আপনি কোদাল রাখুন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—না সনাতন, এই কাদা তোমার বাড়ীর সামনে এতদিন থেকে জমে রয়েছে, কত লোকের কষ্ট হয়েছে, তোমাদের ত হুঁস হয়নি।......আমরা এমনি করে গাঁ-ময় খেলা করে বেড়াবো রোজ, কি বলিস রে বাঁদররা!

ছেলেরা উল্লসিত হইয়া নাচিতে নাচিতে বলিল—হাঁ ঠাকুর!

বিকেল বেলা ছেলেমেয়ে গাঁ ঝাঁটাইয়া আসিয়া জড়ো হইল। সন্ন্যাসী সকলকে এক-একবার দুই হাতে কোলের কাছে টানিয়া, কাহারো কান ধরিয়া নাড়িয়া, কাহারো গোঁজ খোঁপাটা ঘুরাইয়া দিয়া হাসিয়া বলিল—এইবার আমাদের পাঠশালা বসবে। তোদের মধ্যে যে যে পড়তে জানিস ছুটে ঐ গাছতলায় গিয়ে দাঁড়া।

দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে গেল; আর সকলে ক্ষুণ্ণ লজ্জিত দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী পরিচয় লইয়া জানিল—একটি ছেলে বেণী ময়রার, আর অপর ছেলে ও মেয়ে গয়েতদের।

সন্ন্যাসী তাহাদের বলিল—আচ্ছা তোরা সর্দার পোড়ো হবি। বসে সব।......

সন্ন্যাসী প্রত্যেকের হাতে দুটি করিয়া লোজেঞ্জেস ও একখানি করিয়া প্রথম ভাগ দিয়া পাঠশালা পত্তন করিয়া বসিল।

হাসি-গল্প-মস্করার মধ্যে শিশুদের বর্ণপরিচয় হইতেছে, সনাতন আসিয়া বলিল—ঠাঁই হয়েছেন, বারোয়ারি তলায় কথকতা হবেন।

সন্ন্যাসী ছেলেদের বলিল—আজ এখন তবে ছুটি; কাল সকালে সবাই আবার আসবি। বই সব আমার কাছে রেখে যা। কাল

নাইতে যাবার সময় আমরা বনকাটা খেলা করবো, কি বলিস রে বাঁদররা!

—হাঁ ঠাকুর! হাঁ ঠাকুর!—বলিয়া ছেলেরা উল্লসিত হইয়া নাচিতে নাচিতে সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া লইয়া বারোয়ারি-তলার দিকে চলিল।

সন্ন্যাসী বারোয়ারি-তলায় গিয়া দেখিল অনেক মেয়ে পুরুষ সমবেত হইয়াছে। সে বেদীতে গিয়া বসিল। গ্রামের পুরোহিত জনার্দ্দন একছড়া ফুলের মালা দুই হাতে বিস্তারিত করিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল—অনুমতি করুন।

সন্ন্যাসী হাসিয়া গলা বাড়াইয়া মালা পরিল।

জনার্দ্দন পাশের সিধার ডালা ও সন্দেশের রেকাবী দেখাইয়া বলিল—দেবতাকে নিবেদন করে দেন—আপনার যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা।

সন্ন্যাসী হাসিয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমার বাঁদররা হাজির আছিস?

"আছি ঠাকুর" বলিয়া জনতার মধ্য হইতে অনেকগুলি কচি কচি হাসিমুখ উঁচু হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী ডাকিল—তোরা সব আয়, সন্দেশ খাবি।

সকলে ভয়ে-ভয়ে একএকবার নিজেদের বাপখুড়ার মুখের দিকে চাহিল।

সন্ন্যাসী আবার ডাকিল—আয় না রে!

বাপখুড়া বারণ করিল না দেখিয়া সকলে গুটিগুটি গিয়া হাসিমুখে সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী তাহাদের ও সন্দেশের সংখ্যা গণিয়া সমান ভাগ করিয়া বাঁটিয়া দিতে লাগিল।

জনার্দ্দন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—আগে নারায়ণকে ভোগ দিলেন না?

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—ওরাই আমার নারায়ণ!......ওরে এই চাল-ডালগুলো কি হবে জানিস? কাল আমাদের চড়িভাতি হবে!

শিশুদের মুখ উৎসাহের আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কথকতা আরম্ভ হইল। পুরাণকথার মধ্যে মধ্যে আধুনিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিজ্ঞানতত্ত্ব ভূগোল ইতিহাস সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্ব সুযোগ-মত সংযোগ করিয়া সুললিত কণ্ঠে ব্যাখ্যা ও গান চলিতে লাগিল, শ্রোতারা মুগ্ধ হইয়া শুনিল।

কথকতার শেষে সকলে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—তোমরা তাড়িয়ে না দিলে আমি আপনি যাবো না ভাই।

বেণীময়রা জিভ কাটিয়া বলিল—হরেকেষ্ট! অমন কথা বলবেন না ঠাকুর, আমাদের অকল্যেণ হবে!

(৪২)

সকালে মাছের পেথে কাঁকালে করিয়া ক্ষান্ত জেলেনী থানার দারোগা-বাবুর বাসার উঠানে গিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—মাঠাকরুণ কোথায় গো, মাছ নেবে এস।

ঘর হইতে ম্লান কাতর মুখে রাজবালা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—আজ আর মাছ নেবো না ক্ষান্ত, আমার খোকার গায়ে বসন্ত বেরিয়েছে।

ক্ষান্ত ব্যথিত হইয়া বলিল—আহা বাছারে! তা মা ভয় কোরো না, মায়ের কৃপা হয়েছে, মা-ই পদ্মহস্ত বুলিয়ে আরাম করে দেবেন।...... তা মা, এক কাজ করো, গাঁয়ে একজন সন্ন্যেসী এসেছে—তার কিবে রূপ! গা থেকে যেন সূর্য্যের আভা বেরুচ্ছে! কোনো শাপ-ভ্রষ্ট

দেবতা হবে! উত্তম কৈবর্ত্তর ছেলেটা পেটের দরদে কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করছিল, একরতি এতটুকু শিশি থেকে কোন্ দেবতা-পীরের চরণামেৱ্ত কি জলপড়া একফোঁট্টা একটু জলে দিয়ে খাইয়ে দিলে আর ছেলেটা অমনি চাঙ্গা হয়ে উঠে বসলো। আমাদের বংশীর বৌএর ওপর ভূতের নজর ত লেগেই আছে, কত রোজা গুণী কত ঝাড়ফুঁক করে তাগা মাতুলি দিয়ে কিছু করতে পারেনি; কাল যেমন তার ওপরে ভর হওয়া আর অমনি সন্ন্যেসী ঠাকুর গিয়ে যেই সেই জল পড়া একফোঁটা দেওয়া······

রাজবালা অধীর হইয়া বাধা দিয়া বলিল—খোকা ভালো হয়ে উঠলে একদিন তোর সন্ন্যেসীর গল্প শুনবো ক্ষান্ত; আজ আর দাঁড়াতে পারছি না, খোকা আমার কাতরাচ্ছে।

ক্ষান্ত জিভ কাটিয়া বলিল—অমন হেনস্তা কোরো না মা—দেবতা গোঁসাইরা মনের কথা টের পায়। কাল ঠাকুর গাঁয়ে ঢুকে সকলকার আগে তোমাদের কথাই জনে জনে পুছ করেছে—সেও আসা আর খোকার ওপর মায়ের কৃপাদিষ্টি হওয়া, এ ত সামান্যি নয়—হয়ত মা-শীতলা তাঁর বাহনকে সন্ন্যেসীর রূপ ধরে খোকাকে ভালো করবার জন্যেই পাঠিয়েছেন!

রাজবালা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সন্ন্যেসী আমাদের কথা জিজ্ঞেস করছিল? তাকে কি-রকম দেখতে? বয়েস কত?

—কাঁচা বয়েস গো একেবারে কাঁচা, এক-কুড়ি দু-কুড়ি বছর হবে আর কি! দেখতে যেন রাজপুত্তুর—বাঁশের কোঁড়ার মতন সোজা ছিপছিপে!

এমন সময়ে কায়েত-গিন্নি আসিয়া বলিলেন—সন্ন্যেসীর কথা হচ্ছে বুঝি! আহা! কাল কি কথকতাই কইলে—গলা নয়ত যেন মা-সরস্বতীর

হাতের বীণা! কী দুঃখে সে সন্ন্যেসী হল জানিনে! মুখে হাসি লেগেই আছে, কিন্তু সে হাসিতে যেন প্রাণ নেই।

রাজবালার কেমন মনে হইল সে তাহাকে চিনে। সে জিজ্ঞাসা করিল—তার বাঁ দিকের কপালে রগের কাছে একটা কালো তিল আছে?

ক্ষান্ত বলিয়া উঠিল—হাঁ গো হাঁ, তবে তুমি তানাকে চেনো!

রাজবালা আবার জিজ্ঞাসা করিল—মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া বড় বড় চুল—অল্প গোঁপ-দাড়ির রেখা দেখা দিয়েছে?

কায়েতগিন্নি বলিল—না মা, মাথায় চুল নেই বল্লেই হয়, গোঁপদাড়ি ত কিছু দেখলাম না; তার তিলের কথাও যা বল্লে তাও ত কৈ ঠাহর করে দেখিনি। তুই দেখেছিস্ ক্ষান্ত?

ক্ষান্ত বলিয়া উঠিল—হ্যা গ্যাখো কায়েতদিদির কথা, তা আবার দেখিনি? এই ঠিক এমন জায়গায় তিল রয়েছে!

রাজবালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কায়েতগিন্নিকে বলিল—মাসী, আমার খোকার গায়ে বসন্ত বেরিয়েছে—আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে।

কায়েতগিন্নি বলিয়া উঠিল—আহারে! তা বাছা, তুমি ঐ সন্ন্যাসীকে ডেকে একবার দেখাও—আমার ছেলে যে তার পাঠশালার সর্দ্দার পোড়ো হয়েছে; বলো ত তাকে ডেকে দিতে বলি।

রাজবালা বলিল—দেখি ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে।

ক্ষান্ত বলিল—তুমি দারোগা-বাবুকে জোর করে বোলো মা—সন্ন্যেসী-ঠাকুর তোমার খোকার পেরমাই নিয়েই এ গাঁয়ে এসেছে; নইলে তোমাদের কথা অত করে জিজ্ঞেস করবার মানে কি?

রাজবালার মনের মধ্যে অস্বীকৃত সংশয় ও অকথিত কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল—এই সন্ন্যাসী কে?

হংসেশ্বর দারোগা হাতীকান্দা থানা হইতে এই কাৎলামারী থানায় বদলী হইয়া আসিয়াছে। কাৎলামারীও গুণময়-বাবুর এলাকা ; সুতরাং হংসেশ্বর-দারোগা জমিদারের ভায়রা-ভাই হইয়া দ্বিগুণ প্রতাপে নিরীহ শাসন ও দুর্ব্বল দমন করিতেছে। সে সকালে উঠিয়াই থানায় গিয়াছিল ; স্নানাহারের বেলা হইলে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—খোকা কেমন আছে ?

রাজবালা অত্যন্ত কাতর স্বরে ম্লান মুখে বলিল—খোকার গায়ে বসন্ত লেপে বেরিয়েছে।

হংসেশ্বর তাহার কাঁকড়ার মতন ড্যাবা ড্যাবা চোখ বিস্ফারিত করিয়া উটের মত গলা বাঁকাইয়া আঁৎকাইয়া উঠিল—অ্যাঁ ! বসন্ত !

তারপর একটু সহজস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—পানি-বসন্ত বুঝি ?

—না, আসল বসন্ত বলেই বোধ হচ্ছে।

—অ্যাঁ ! আসল !—বলিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়া হংসেশ্বর একবার দুই হাত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল তার গায়েও বাহির হইয়াছে কি না ; একবার জামার মধ্যে অঙ্গটাকে সঞ্চালিত করিয়া অনুভব করিয়া দেখিল গায়ে ব্যথা আছে কি না, গা পিটপিট কুটকুট করিতেছে কি না। তারপর সেখান হইতে সরিয়া পড়িবার উদ্যম করিল।

রাজবালা বলিল—তুমি একবার এসে দেখ-দেখি।

হংসেশ্বর চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—ও আর আমি কি দেখবো ? আমি ত ঠিক চিনি না। আমাকে আবার এক্ষুণি মফস্বলে যেতে হবে……

রাজবালা ভীত হইয়া বলিল—তুমি চলে গেলে আমি একলাটি খোকাকে নিয়ে কেমন করে থাকবো ?

—আমি হাতীকাঁদা থেকে তোমার মাকে আনতে লোক পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্ছি……

রাজবালা ব্যাকুল হইয়া বলিল—খোকার চিকিচ্ছের কি হবে?

—ওর আর চিকিচ্ছে কি? শীতলার বামুন একজন আনতে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।……আর হ্যাঁ ছাখো, শুনছি গাঁয়ে একজন সন্ন্যাসী এসেছে—সে নাকি অনেক ওষুধ-বিষুধ মন্তর-তন্তর জানে, সবাই বলছে। তাকেও ডেকে পাঠাচ্ছি—ও-সব রোগের দৈব ওষুধই চিকিচ্ছে!

রাজবালা জিজ্ঞাসা করিল—তুমি ভাত খাবে না?

হংসেশ্বর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে, বলিল—না, বড় জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে, ভাত খাবার সময় হবে না।

হংসেশ্বর চলিয়া গেল। রাজবালা চোখে কাপড় দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৪৪)

তরুণ সুন্দর সন্ন্যাসী একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় বসিয়া তাহার পাঠশালার ছাত্রছাত্রীদের পড়াইতেছিল। তাহার পোড়োর দলে বড় বড় বয়সের চাষারাও যোগ দিয়াছে; এবং গুরুদক্ষিণার সর্ত্ত এই ঠিক হইয়াছে যে প্রত্যেক ছাত্র নিজের নিজের বাড়ীতে মা-বোন-মাসী-পিসীদের পড়াইবে ও বই পড়িয়া পড়িয়া শুনাইবে।

সন্ন্যাসী বলিল—আজ এইখানে থাক! এখন চলো খানিকটা বন কাটা যাক; বন জঙ্গল সাফ হয়ে গেলে গাঁয়ের মাঝখানে একটা ইঁদারা খুঁড়তে হবে আর সনাতন দাসের বাড়ীর সামনে যে মজা ডোবাটা

আছে, সেটা ঝালিয়ে পুকুর করে তুলতে হবে। সেই পুকুরে আমরা রোজ সাঁতার দেবো, মাছ ধরবো। কেমন পারবি ত রে।

ছেলেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—খুব পারবো ঠাকুর।

বড় বড় যে-সব চাষা ছাত্র ছিল তাহারা লজ্জিত হইয়া বলিল—ঠাকুর আপনি ওসব করতে যাবে কেন? আমাদের আপনি হুকুম কোরো, বন কাটা হবেন, কূযো হবেন, পুকুর হবেন, সব হবেন; আমাদের গতর আছে, মগজ ত নেই, আপনারা ভদ্দর নোকে একটু বাৎলে দিয়ে দেখো দেখি আমরা কি না করতে পারি।

সন্ন্যাসী খুসী হইয়া তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তোরা সব করতে পারিস ভাই, সব করতে পারিস, তোদের ক্ষমতা আছে বলেই ত আমার ভরসা; কিন্তু তোদের হুকুম করবার আমি কে ভাই, আমিও যে তোদেরই একজন!

—আপনি দেবতা!—বলিয়া তাহারা সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলো লইতে উদ্যত হইল।

সন্ন্যাসী সরিয়া গিয়া হাসিমুখে চোখ রাঙাইয়া তিরস্কার করিয়া বলিল—ফের অমন করবি ত আমি তোদের গাঁ থেকে চলে যাবো!

ছেলেরা চারিদিকে সন্ন্যাসীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—আমরা যেতে দিলাম আর কি!

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—নে এখন চ, আমাদের জঙ্গলঝোরার খেলা সুরু হোক! আমাকে আবার সনাতনের ক্ষেতে লাঙল দিতে যেতে হবে।

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—সে কি ঠাকুর! তুমি লাঙল দেবে কি!

সন্ন্যাসী বলিল—আমি যে সনাতনের খাচ্ছি, তার কাজ করে দেবো

না? কোনো কাজই ত লজ্জার নয়; যা থেকে লোকের অন্ন বস্ত্র ধন দৌলত, সে কাজ কি কম গৌরবের।

উত্তম কৈবর্ত্ত বলিল—তবে ভদ্দর লোকে চাষা বলে গাল ভায় কেন?

—যারা চাষা তারা লেখাপড়া করে না, তাই তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম হয়, তাই চাষা মানে অসভ্য নির্বুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন তোদের ছেলেমেয়েরা এম-এ বি-এ পাশ করে ক্ষেতখামারের কাজ করবে তখন জমিদারও তাদের ভয় করবে, তারাও ভদ্র চাষা হবে, ভদ্রলোকেও আর চাষা বলে ঠাট্টা করতে পারবে না।

উত্তম গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—নিব্যস!

এমন সময় একজন পুলিশ-কনষ্টেবল আসিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে খানিকটা গাঁজা রাখিয়া বারকতক জোড় হাত একবার মাটিতে ঠেকাইয়া তারপর নত অবস্থাতেই কপালে ঠেকাইয়া বলিল—পাঁও লাগি বাবা!

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—গেরুয়া কাপড়খানার ত খুব জোর দেখছি—যারা মানুষকে মানুষই জ্ঞান করে না সেই পুলিশও গেরুয়া কাপড়খানার কাছে মাথা নত করে! মানুষটাকে যাতে ঢেকে রাখে সেই খোলসটা আজই ছেড়ে ফেলতে হল।......কনষ্টেবল সাহেব, গাঁজা কি হবে?

—আপকা সেবা-কা লিয়ে বাবা।

—আমি ত গাঁজা-সেবা করি না।

—তব কৈসা সাধু?

—সাধু হলে কি আর পুলিশের নজর পড়ে? আমি গাঁজাখোরও নই, সাধুও নই! অতএব তুমি তোমার গাঁজাটুকু নিয়ে যেতে পারো।

—দারোগা-সাহেব আপকো সেলাম দিয়া।

—কেন বলো ত? আমি কিসের আসামী?

—আরে রাম রাম! উ নেহি। দারোগা-সাহেবকা লেড়কাকা গুটি নিকলা হ্যায়; আপ আগর কুছ দাবা আউর দোআ দেঁ……

সন্ন্যাসী অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হইয়া উঠিয়া বলিল—দারোগা-বাবুর ছেলের বসন্ত হয়েছে? চলো আমি যাচ্ছি!

উত্তম কৈবর্ত্ত বলিল—নেয়ে খেয়ে গেলে হত না ঠাকুর?

—না ভাই, নাবার খাবার সময় আমার এখন নেই।—বলিয়া সন্ন্যাসী একরকম দৌড়িয়া থানার দিকে চলিয়া গেল।

উত্তম সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবতা!

(৪৫)

সন্ন্যাসী দারোগার বাড়ীতে আসিয়া ঘরের দরজার বাহিরে লজ্জিত স্মিতমুখে দাঁড়াইল।

রাজবালা চমকিয়া ফিরিয়া বলিল—বীরেন তুমি! আমার শুনেই সন্দেহ হয়েছিল—

বীরেন বলিল—চুপ! বীরেন দ্বীপান্তরে! আমি এখানে নতুন নাম পেয়েছি—ঠাকুর! বীরেনের কথা না তোলাই ভালো।

—তুমি এখন ছাড়া পেলে কি করে?

—নতুন রাজার অভিষেকের জন্যে।

রাজবালা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গলায় আঁচলখানি ফিরাইয়া দিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—খোকার বাবা তোমার কাছে অপরাধী! তুমি তাঁর অপরাধ ক্ষমা করো—আমি তাঁর হয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি। তুমি প্রসন্ন না হলে খোকা আমার বাঁচবে না!

বীরেন রাজবালার হাত ধরিয়া বলিল—ও কি রাজু! আমি

দ্বীপান্তর গিয়ে নূতন জীবন লাভ করে এসেছি, বুঝতে পেরেছি আমাদের সমাজের সাধারণ লোকের মধ্যে কি চমৎকার পদার্থ আছে, অশিক্ষায় কুশিক্ষায় অত্যাচারে অবিচারে তারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি তাদের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতে শিখে এসেছি। এর জন্যে আমি সুখী, কারো ওপর আমার বিদ্বেষ নেই। তোমার খোকা ভালো হবে, ভয় কি? তোমার স্বামী কোথায়?

রাজবালা বিষণ্ণ ভাবে বলিল—খোকার বসন্ত হয়েছে শুনেই তিনি পালিয়েছেন। তুমি আমার খোকাকে দেখো।

বীরেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খোকার বিছানার পাশে বসিল। আজ কতকাল পরে রাজবালার সাক্ষাৎ পাইল, সে আনন্দ কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় মলিন বিবর্ণ! রাজবালা খোকাকে দেখিবার জন্য স্বামীকে জোর করিয়া বলিতে পারে নাই, কিন্তু বীরেনকে সে অনায়াসেই জোর করিয়া বলিতে পারিল।

(৪৬)

বীরেন্দ্রের ঐকান্তিক সেবা ও যত্নের জোরে রাজবালার খোকা সারিয়া উঠিয়াছে; বীরেন্দ্রের সাবধানতায় গ্রামে আর কাহাকেও ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে নাই। খোকা যত ভালো হইয়া উঠিয়াছে, বীরেন তাহার কাছে যাওয়া তত কম করিয়াছে; এখন আর সে মোটেই যায় না। ইহাতে গ্রামের লোকেরা খুসী হইয়াছে,—এই কয়দিন ঠাকুরকে একরকম তাহারা দেখিতেই পায় নাই; দেখিতে যদি বা একবার পাইয়াছে, কিন্তু ঠাকুর তাহাদিগকে কাছে যাইতে দেয় নাই। ঠাকুরকে তাহারা ফিরিয়া পাইল, কিন্তু এ যেন সে ঠাকুর নয়।

ছেলেদের আর সে কথায় কথায় আদর করিয়া বাঁদররা বলিয়া ডাকে না, তাহাদের পুকুর কাটার খেলা আর তেমন জমিতেছে না, ঠাকুর কেমন গম্ভীর বিষণ্ণ অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে। গাঁয়ের লোকে ভয়ে-ভয়ে চুপিচুপি বলাবলি করিতে লাগিল—ঠাকুরের এখানকার কাজ হয়ে গেল, এইবার উনি অন্তর্ধান করবেন।

রাজবালার মা একদিন রাজবালাকে বলিলেন—রাজু, তোর ছেলে ভালো হয়ে উঠলো, তবু তোর মুখে হাসি নেই কেন ?

রাজবালা মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার চোখের কোলে জল টলটল করিতেছিল, কিন্তু তাহা সে কিছুতেই ঝরিতে দিতে চাহিতেছিল না।

কন্যার হৃদয়ের নিগূঢ় বেদনা মাতা বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বীরেন আর একবারও আসে না কেন ? বড় ভালো ছেলেটি ! আহা ওকে বিয়ে-থা করে সংসারী হতে বলিসনি কেন রাজু, এই বয়সে কি সন্ন্যাসী হওয়া ওকে মানায় !

রাজবালা মায়ের মৌখিক মমতায় বিরক্ত হইতেছিল। তবু সে বিরক্তি চাপিয়া বলিল—বলেছিলাম, সে বল্লে, আমার দণ্ড হয়েছিল, আর ত ওকালতি বা চাকরী করতে পাবো না, বিয়ে করে খাওয়াব কি ? জীবনটা গোড়াতেই ভেঙে গেছে, এমনি করেই জীবনটা কোনো রকমে ফুঁকে দিতে হবে।

রাজবালার মাতা মমতায় আর্দ্র স্বরে বলিলেন—আহা বাছারে ! দয়া যদি বেঁচে থাকতো।

দয়াদেবীর নামটিকে অবলম্বন করিয়া রাজবালার রুদ্ধ অশ্রু ঝরিয়া বাঁচিল। রাজবালা বলিল—দিদির মতন লোক হবে না ! বড় কষ্ট পেয়ে মরেছেন, জুড়িয়েছেন !

এমন সময় হংসেশ্বর কুণ্ঠিত মুখে চোরের মতন সেখানে আসিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? খোকা কেমন আছে?

রাজবালার মা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

একটি বসন্ত-লাঞ্ছিত বালক দৌড়াইয়া আসিয়া হংসেশ্বরের হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল—বাবা, আমি ভালো হয়েছি, সন্ন্যেসী-ঠাকুর আমাকে ভালো করে দিয়েছে।

হংসেশ্বর তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিল—সোনার খোকা এমন হয়ে গেছে?

রাজবালা অভিমান-মিশ্র তিরস্কারের স্বরে বলিল—তুমি যে হঠাৎ এলে?

হংসেশ্বর পলাইয়া গিয়া অবধি একখানা চিঠি পর্য্যন্ত স্ত্রীকে লিখিয়া খোকার কুশল জিজ্ঞাসা করে নাই; ভয়, পাছে চিঠির মধ্যে বসন্তর বিষ সেখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করে। স্ত্রীর প্রশ্নে কুণ্ঠিত হইয়া হংসেশ্বর বলিল—যে কাজের ঝঞ্ঝাটে পড়ে গিয়াছিলাম! এখনো ঝঞ্ঝাট মেটেনি, ফেলে রেখেই আসতে হলো—এখানে আবার কাৎলামারী বিলের দখল নিয়ে বংশী জেলের সঙ্গে জমিদারের দাঙ্গা বাধবার সম্ভাবনা হয়েছে। পাঁচু-বাবু আসছেন......

রাজবালা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—আবার জমিদারে প্রজায় দাঙ্গা! পেঁচো আসছে! বীরেন যে এই গাঁয়ে আছে!

হংসেশ্বর আশ্চর্য্য হইয়া বিরক্তি ও তাচ্ছিল্য দেখাইয়া বলিল—সে ছোঁড়া এর মধ্যে খালাস পেলে কেমন করে? এত দেশ থাকতে এখানে এসে জুটেছে কি মতলবে?

রাজবালা মনের ব্যথা গোপন করিয়া বলিল—সেই ত সন্ন্যাসী, সেই ত খোকাকে ভালো করলে।

হংসেশ্বর ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—তিনি আবার সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে বুজরুকী জুড়ে দিয়েছেন বুঝি!

রাজবালা উঠিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। একজন চাকর আসিয়া হংসেশ্বরকে খবর দিল—জমিদার-বাবুর নায়েব মশায় এসেছেন।

(৪৭)

শশীজেলে কাৎলামারী বিল জমিদারী নিলামে সবার বেশী চূড়া ডাকে জমা লইয়াছিল! পাঁচশত টাকা পাটা-সেলামী ও আঠারো শত টাকা জমা, চার কিস্তিতে শোধ করিবার কথা। হঠাৎ জমিদারের হুকুম হইল—জমা ও সেলামীতে মিলাইয়া পূরা তিন হাজার টাকা আগাম দিতে হইবে। শশীজেলে জমীদারের কাছে দরবার করিল; গুণময় বলিলেন—নূতন রাজার অভিষেকে চেরাকবাতি আর আতসবাজি জ্বালাইতে এবং উৎসবে চাঁদা দিতে অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, সে টাকা তাঁহার তুলিয়া লইতে হইবে ত!

শশীজেলে হাতজোড় করিয়া বলিল—হুজুর সেটা কি এই গরিবদের গলার মাস কেটে তুলতে হবে?

ছোটলোকের মুখে এই ব্যঙ্গ শুনিয়া গুণময় চটিয়া গিয়া বলিলেন—তোদের কাছে ত আমি ভিক্ষে চাই নি; আমার বিল নিয়েছিস, যা চাইব সেই টাকায় জমা নিতে হবে; না পারিস বিল ছেড়ে দে, আমি দোসরা বন্দোবস্ত করব।

শশীজেলে হাত জোড় করিয়া বলিল—আমি নিলামের ডাকে যাতে পেয়েছি তার বেশী আর কেন দেবো, আর বেশী দিতেই বা পাবো

কোথায়? বিল আমি বাড় দিয়ে ঘিরেছি, তাতে আমার খরচ হয়েছে; এ বছর আমি বিল ছাড়তে পার্‌ব না।

গুণময় হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—তুই ত তুই, তোর বাপ যে সে ছাড়বে!

শশী জেলে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াই নিজের ছেলে ভাইপো জ্ঞাতি গোষ্ঠীদের ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। সকলেই বলিল—বিল কিছুতেই ছাড়া হইবে না; জমিদারের খামখেয়ালী অত্যাচার যত সহ্য করা যাইতেছে তত তাহার অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে! এতজন জেলের হাত হইতে বিল অমনি ছাড়াইয়া অপরকে দিলেই হইল! দেখি কে দখল লইতে আসে!

শশী বলিল—তবে তোরা সবাই একটু হুঁসিয়ার থাকিস, লাঠিগুলো হাতের মাথায় ঠিক রাখিস।

[illegible]লিয়ার বশীর মিঞা তিন হাজার টাকায় বিল জমা লইয়া দখল করিতে আসিয়াছিল। শশী তাহাদের মারিয়া ভাগাইয়া দিয়াছে। তাই এখন স্বয়ং পঞ্চানন পুলিশের সাহায্য লইয়া বিল দখল দেওয়াইতে আসিয়াছে।

পঞ্চানন হংসেশ্বরকে লইয়া বিলের ধারে গিয়া দেখিল শতাবধি জেলে বড় বড় লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হংসেশ্বর তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া বশীর মিঞাকে বলিল—তোমার জাল ফেলাও।

বশীর মিঞার লোক জাল লইয়া অগ্রসর হইল। অমনি জেলেরা চিলের মতন ছোঁ মারিয়া সেই জাল কাড়িয়া লইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল।

হংসেশ্বর কনষ্টেবল-চৌকীদারদের হুকুম দিল—ওদের গেরেপ্তার করো।

জেলেরা লাঠি উঁচাইয়া দাঁড়াইল।

হংসেশ্বর কনষ্টেবলদের হুকুম দিল—থানা থেকে বন্দুক নিয়ে এসে বন্দুক চালাও!

পুলিশের লোক সরিয়া যাইতেই শশী বলিয়া উঠিল—ওরে আমরা ত মরেইছি, ঐ পেঁচো-বামনা আর রাজহাঁসটা কি অমনি যাবে?

অমনি সকল জেলে মার মার করিয়া হংসেশ্বর ও পঞ্চাননের উপর পড়িল। হংসেশ্বর পলায়ন করিল, পঞ্চানন ধরা পড়িল। শশীর এক ভাইপো হাসুয়া-দা দিয়া পঞ্চাননের গলা হাঁসাইয়া ছায় আর কি!—শশী বাধা দিয়া বলিল—বামনাকে প্রাণে মারিসনে; ওর দুকান কেটে ছেড়ে দে!

বলিতে না ফলিতে। তৎক্ষণাৎ পঞ্চাননের দুটি কান কাটিয়া তাহার দুই হাতে দুটি কান দিয়া তাহাকে জেলেরা বলিল—যা বেটা, তোর জমিদারকে সেলামী দিগে যা!

একশত জেলের অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি প্রকা[illegible]লের উপর দিয়া হাহা করিয়া ছুটিয়া গেল।

দুই কান দুই হাতে মুঠা করিয়া ধরিয়া প[illegible] তড়াক তড়াক করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল—এইবার আর যাবে কোথায়? সব বেটাকে জেলখানায় পূরবো!

এমন সময় হংসেশ্বর বন্দুক লইয়া ও কনষ্টেবল চৌকীদারেরা বন্দুক শড়কী লইয়া আসিতেছে দেখা গেল। শশী বলিল—ওরে, শালারা আসছে! ওরা বন্দুক চালাবার আগে ওদের ওপর গিয়ে পড়ি চ!

জেলের দল ঝড়ের মতন ছুটিয়া গিয়া পুলিশের উপর পড়িল; পুলিশের লোকেরা মনে করিয়াছিল বন্দুক দেখিয়াই জেলেরা ভাগিবে,

তাহারা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রথম চোটে পুলিশের লোকেই বেশী মার খাইল ও হটিয়া পলাইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ক্ষান্ত জেলেনী দৌড়িয়া গিয়া বীরেনের পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল—বাবাঠাকুর, আমার শশীকে তুমি বাঁচাও! জেলেরা ধনে প্রাণে মারা যেতে বসেছে!

বীরেন তখন তাহার বৈকালী কথকতা করিতে যাইতেছিল। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন, কি হয়েছে?

ক্ষান্ত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল—বিলের দখলী স্বত্ব লইয়া জমিদারে জেলেতে দাঙ্গা বাধিয়াছিল, জেলেরা পঞ্চাননের দুকান কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, এখন পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা লাগিয়াছে, পুলিশ বন্দুক আনিয়াছে!

বীরেন এই খবর পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে বিলের দিকে ছুটিল। গিয়া দেখিল দাঙ্গা চলিতেছে।

তাহাকে আসিতে দেখিয়াই জেলেরা উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। শশী বলিয়া উঠিল—ঠাকুর এসেছে, আর আমাদের পায় কে?

জেলেরা দ্বিগুণ উৎসাহে পুলিশের লোকদের আক্রমণ করিল। বীরেন ছুটিয়া দুই হাত তুলিয়া সেই মারামারির মধ্যে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—ওরে শশী তোরা থাম, হংসেশ্বর-বাবু আপনার লোকদের থামতে বলুন।......

দুই দলের মাঝে পড়িয়া বিষম আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া বীরেন মাটিতে পড়িয়া গেল। শশী চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে তোরা লাঠি থামা, ঠাকুর জখম হয়েছে!

জেলেদের লাঠি হঠাৎ থামিয়া গেল এবং সেই সুযোগে পুলিশের লোক পলায়ন করিল।

শশী বলিল—এখনি শালারা আবার আসবে, ঠাকুরকে উঠিয়ে নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালাই চ।

অজ্ঞান বীরেন্দ্র ও নিজেদের দলের জখমী লোকদের বহন করিয়া লইয়া জেলেরা গাঁ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

জেলেরা ভাগিয়াছে জানিয়া পঞ্চানন বশীর মিঞাকে বিলের দখল দিয়া কাটা কানের চিকিৎসা করাইতে কলিকাতায় গেল।

হংসেশ্বর-দারোগা আসামী গেরেপ্তার করিবার ফন্দি আঁটিতে লাগিল।

(৪৮)

জেলেরা এমন লুকাইয়াছিল যে পুলিশ তাহাদের পাত্তাই পাইতেছিল না। জেলেরা নানান জায়গা ঘুরিয়া নীলমহানি গ্রামের পোড়ো নীল-কুঠিতে গিয়া আশ্রয় লইল। দেশের সকল লোকই জেলেদের পক্ষ; পুলিশ আর তাহাদের কোনো সংবাদই পাইতেছিল না।

গুণময় হংসেশ্বরকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া বলিলেন—বীরে ছোঁড়া ফিরে এসে জেলেদের সঙ্গে জুটে দাঙ্গা করেছিল নাকি?

—হ্যাঁ, তাইত শুনছি।

—সেও কি ফেরার হয়েছে?

—হাঁ, দাঙ্গার পরে আর তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি।

—তাকেও আসামী করবে ত?

—লোকে বলছে সে দাঙ্গা থামাতে গিয়েছিল, দাঙ্গা করতে যায়নি।

—লোক মানে ত জেলেদের তরফের লোক! বীরেকে ছেড়ে দিলে তোমার সে সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে, তা বুঝতে পারছ?

হংসেশ্বর কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমার আর কি সর্ব্বনাশ করবে ?

গুণময় বলিলেন—খালাস পেয়েই এত রাজ্য থাকতে কাংলামারীতে গিয়ে জুটেছিল কেন, খোঁজ রাখ কি ?

হংসেশ্বর সন্দিহান হইয়া বলিল—না।

—রাজুর সন্ধানে ! রাজুর ওপর ওর মন পড়েছিল বলেই না আমি ওকে বাড়ী থেকে দূর করে দি ! রাজুকে ও এখনো ভুলতে পারেনি ; রাজুরও ওর ওপর বিলক্ষণ টান আছে !

হংসেশ্বরের বুকের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল। এই এতদিন তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু রাজবালার মন ত সে এখনো পাইল না ; রাজবালা তাহার বাড়ীতে থাকে, ঘরকন্নার সব কাজ করে, তাহার ছেলের সে মা, কিন্তু তাহার ছেলেকে লইয়া সে পৃথক ঘরে থাকে। হংসেশ্বরের তখন মনে হইল, সে যখন বসন্তর ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, তখন সে নিজেই তাহার স্ত্রীর প্রেমাস্পদকে স্ত্রীর কাছে ডাকিয়া দিয়া গিয়াছিল ! তাহার অনুপস্থিত সময়ে তাহারা প্রত্যহ একত্র হইয়াছে ! তাহার মনে পড়িল, তাহার মুখে দাঙ্গা হইবার খবর শুনিয়া রাজবালা কি-রকম ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—বীরেন যে এই গাঁয়ে আছে !

হংসেশ্বরকে চুপ করিয়া ভাবিতে দেখিয়া গুণময় মনে মনে খুসী হইয়া বলিলেন—এইসব বুঝে শুনে কাজ কোরো—আমি আর বেশী কি বলবো।

হংসেশ্বর কিছু না বলিয়া বিদায় লইল ; গুণময় তাহাতে আরো খুসী হইলেন। বীরেনকে ভালো বাসিয়া রাজবালা যে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এই অপমানের ক্রোধ গুণময় কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না। তাই হংসেশ্বরের মনে ঈর্ষা জাগ্রত করিয়া তুলিয়া

পুলিশের বেড়াজালে ফেলিয়া বীরেনকে নির্য্যাতন করিবার সম্ভাবনায় গুণময়ের মন খুসী হইয়া উঠিতেছিল।

হংসেশ্বর গম্ভীর হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। রাজবালা প্রথম সাক্ষাতেই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—বীরেনের কোনো খোঁজ পেলে?

হংসেশ্বর গম্ভীর হইয়া বলিল—না। এইবার ভালো করে খোঁজ করা হবে।

রাজবালা বীরেনের সংবাদ পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল।

সকালবেলা মাছের পেথে কাঁকালে করিয়া ক্ষান্ত জেলেনী রাজবালার সঙ্গে দেখা করিয়া এদিক-ওদিক ভয়ে-ভয়ে তাকাইয়া চুপিচুপি অনুযোগের স্বরে বলিল—এ কি করলে মা? যে ঠাকুর নিজের প্রাণের মায়া ছেড়ে তোমার খোকাকে বাঁচালে, গরীবদুঃখীদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে জখম হল, সেই লোকের নামে ওয়ারেণ্টো জারি করলে!

রাজবালা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—তার নামেও ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে?

ক্ষান্ত দুঃখকাতর স্বরে ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে তাকাইয়া বলিল—হ্যাঁ মা। শশী বলছিল, ঠাকুরের ওয়ারেণ্টো দারোগাবাবু ফিরিয়ে নিক, তাহলে আমরা সবাই আপনি এসে ধরা দেবো।

রাজবালা একটু ভাবিয়া বলিল—ক্ষান্ত, তুই একবার করে রোজ আমার কাছে আসিস। দেখি আমি কি করতে পারি।

ক্ষান্ত কতকগুলা মাছ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল; যেন সে মাছ বেচিতেই আসিয়াছিল।

রাজবালা গিয়া হংসেশ্বরকে বলিল—বীরেনের নামেও ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে নাকি?

হংসেশ্বর অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া উঠিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—হুঁ।

—কেন, তার কি অপরাধ?

—দাঙ্গা খুন করেছে।

—মিথ্যা কথা।

রাজবালার এই তীব্র প্রতিবাদে হংসেশ্বর রুষ্ট হইলেও থতমত খাইয়া গিয়া বলিল—দাঙ্গার মধ্যে ছিল; দাঙ্গায় জখম হয়েছে; তারপর ফেরার হয়ে আছে; এই ত তার প্রমাণ।

রাজবালা রূঢ় তীব্র ভাষায় উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—তোমরা দাঙ্গা খুন করতে গিয়েছিলে সেজে-গুজে, সে তোমাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে জখম হয়েছিল; তোমার ছেলের বসন্ত হলে তুমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে ছিলে আর সে প্রাণের মায়া ছেড়ে আহার নিদ্রা ভুলে চিকিৎসা আর সেবা করে তোমার ছেলেকে বাঁচিয়েছিল; তার এই পুরস্কার যে তাকে হাতকড়ি দিয়ে থানায় টেনে আনবে, নির্দ্দোষকে জেল খাটাবে!

তিরস্কারে অভিভূত হইয়া হংসেশ্বর কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—নির্দ্দোষ হয়, বিচারে খালাস পেয়ে যাবে।

—যেমন খালাস পেয়েছিল সেবার! ও কথা আমি শুনব না—বীরেনকে তুমি আসামীর দলে ফেলতে পারবে না। বীরেনকে ছেড়ে দিলে জেলেরা সব আপনি এসে ধরা দেবে বলেছে।

হংসেশ্বর বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—বীরেনের দূত তোমার কাছে আনাগোনা করছে বুঝি? কাউকে আমি ছাড়বও না, কাউকে আপনি ধরা দিতেও হবে না।

রাজবালা স্বামীর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া এবার কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এমন অধর্ম্ম কোরো না।

হংসেশ্বর পা ছাড়াইয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—অধর্ম্ম কি, এ ত কর্ত্তব্য!

রাজবালা চট করিয়া চোখের জল পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পুলিশের দারোগার হৃদয় আছে মনে করে আমি ভুল করেছিলাম !

রাজবালা যতই বীরেন্দ্রকে মুক্ত করিবার জন্য আগ্রহ ও বেদনা প্রকাশ করিতেছিল, হংসেশ্বরের সঙ্কল্প তত দৃঢ়তর হইতেছিল, বীরেনের উপর ক্রোধ তত বাড়িয়া চলিয়াছিল, স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ তত ঘনাইয়া উঠিতেছিল, অথচ সে মনে মনে রাজবালার দৃপ্ত তেজস্বিতাকে ভয় করিত, মুখ ফুটিয়া তাহার কাছে কিছু বলিতেও পারিতেছিল না।

রাজবালা অনেক দিন পরে মায়াকে চিঠি লিখিতে বসিল—

স্নেহের মায়া,

তোমার বীরেন-দাদাকে তুমি ভুলে যাওনি বোধ হয়। তিনি দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এসেছেন। আবার তিনি দাঙ্গার আসামী। সেবারকার মতন বিনা দোষে দণ্ড পেতে দেওয়া আমাদের উচিত হবে না। মকদ্দমা চালাতে টাকার দরকার। আমার নিজের কিছুই নেই। দিদি বেঁচে নেই। তাই তোমাকে জানাচ্ছি ! আমাকে সাহায্য করতে যদি পারো।

—তোমার মাসী রাজবালা।

(৪৯)

সকাল-বেলা ক্ষান্ত জেলেনী আসিয়া ডাকিল—মাঠাকরুণ, মাছ নেবে এস।

ক্ষান্তর গলা শুনিয়া রাজবালা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল; চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিল—তোদের ঠাকুরের কিছু খবর পেলি ক্ষান্ত।

ক্ষান্ত ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—ঠাকুরের বড় অসুখ; চিকিচ্ছে আর তাহত বিনা মারা যাবে। গতরে দরদ হয়েছেন, তার ওপর জ্বর হতে লেগেছেন, বেহুঁস বে-চৈতন্য হয়ে আবোল-তাবোল বকতে থাকে—ওরে শশী, তোরা হংসেশ্বর-দারোগাকে খুন করিসনে, সে যে রাজবালার স্বামী! আমায় না খুন করে তোরা হংসেশ্বরের গায়ে হাত দিতে পারবিনে!……সারাক্ষণ কেবল রাজু রাজু করছে—রাজু কি তোমার নাম মা?……

রাজবালা সে কথার উত্তর না দিয়া মলিন বিবর্ণ মুখে পাল্টা প্রশ্ন করিল—ক্ষান্ত, আমায় বলতে পারিস, তোদের ঠাকুর কোথায় আছে এখন?

ক্ষান্ত জিভ কাটিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—ঐ কথাটি জিজ্ঞেস কোরো না মা, বলতে পার্‌বো না।

—তোর কিছু ভয় নেই। আমি ঠাকুরের সেবা করতে যাবো। আমি তাকে আগলে থাকলে দারোগার সাধ্য হবে না তাকে গেরেপ্তার করবে।

—তুমি কি করে যাবে?

—আমি দারোগাকে লুকিয়ে যাবো—হাতীকাঁদা যাচ্ছি বলে যাবো।

—আচ্ছা, আমি শশীকে জিজ্ঞেস করি আগে; সে যদি বলতে বলে, বলবো এসে।

ক্ষান্ত চলিয়া গেলে রাজবালা চিন্তাকুল মুখে তাহার মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজু, তুই অমন মুখ ভার করে আছিস কেন?

—বীরেনের বড় অসুখ, মা। চিকিৎসা কি সেবা কিছুই হচ্ছে না।

—কোথায় আছে সে? এইখানে তাকে নিয়ে আসা না, আমরা ত রয়েছি, দেখি শুনি।

—তা হবার জো নেই মা। তাকে খুনের দায়ে ফেলে তার নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে, হুলিয়া হয়েছে ; ধরতে পারলে তার জেল হবে।

রাজবালার মাতা উৎসাহশূন্য হইয়া বলিলেন—তবেই ত !

রাজবালা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—মা, তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। তোমা হতেও তার ঢের ক্ষতি হয়েছে, তার একটু প্রায়শ্চিত্ত করো।

তাহার মা লজ্জিত ও আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি করবো ?

—তুমি কাল বাড়ী চলে যাও ; আমিও তোমার সঙ্গে যাবো ; পথে যেখানে বীরেন লুকিয়ে আছে সেখানে একবার তাকে দেখে যাবো। তুমি এখন ওকে কিছু বোলো না, পরে আমি সব বলবো। এইটুকু তোমাকে করতে হবে মা।

রাজবালা যেমন কাতর ভাবে সমস্ত প্রাণের আবেগ ঢালিয়া কথা কয়টা বলিল তাহাতে এবং বীরেনকে একমাস ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখিয়া তাহার প্রতি একটা মায়া পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া রাজবালার মা রাজবালার প্রস্তাবে সম্মত হইবার পূর্ব্বাভাসের স্বরূপে বলিলেন—জামাই টের পেলে রাগ-টাগ করবেন না ত ?

—সে তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা, সে আমি বুঝবো।

রাজবালার মা আর কিছু বলিলেন না, কারণ তিনি দেখিতেন তাঁহার জামাই তাঁহার মেয়ের কি-রকম অনুগত।

রাজবালা গিয়া হংসেশ্বরকে বলিল—মা কালকে বাড়ী যেতে চাচ্ছেন।

হংসেশ্বর গম্ভীর হইয়া বলিল—আচ্ছা।

—আমিও দিন কতকের জন্যে মার সঙ্গে যাবো ?

হংসেশ্বর একবার রাজবালার মুখের দিকে চাহিল। একটু ভাবিল।

তাহার মনে হইল—এখানে রাজবালা থাকিলে বীরেনের গেরেপ্তার লইয়া ঘ্যানরঘ্যানর করিবে, তার চেয়ে দিনকতক দূরে যায় ত মন্দ না। এই ভাবিয়া গম্ভীর ভাবে শুধু বলিল—আচ্ছা।

এত সহজে নিষ্কৃতি পাইয়া রাজবালা অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রভাতে রাজবালা ও তাহার মা যখন পাল্কীতে চড়িয়া রওনা হইল তখন ক্ষান্ত জেলেনী তাহাদের পাল্কীর কাছে আসিয়া রাজবালাকে চুপিচুপি বলিয়া গেল—বেহারারা সব আমাদেরই দলের লোক; তারা তোমাকে ঠিক নিয়ে যাবে।

রাজবালার পাল্কী নীলমগানি গ্রামের পোড়ো নীলকুঠির কাছে গিয়া নামিল। রাজবালা পাল্কী হইতে নামিয়া মাকে বলিল—মা, তুমি খোকাকে নিয়ে বাড়ী চলে যাও; বীরেন একটু ভালো হলে তাকে নিয়ে কাৎলামারীতে ফিরে গিয়ে খোকাকে আনিয়ে নেবো।

তাহার মা আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন—সে কি লো! এই জঙ্গলে একলা তুই থাকবি কি? জামাই এর পর তোকে ঘরে নেবে কেন?

রাজবালা সহজ ভাবে বলিল—যদি না নেয় ত এখনো নেবে না তখনো নেবে না। কিন্তু সেজন্যে তুমি ভেবো না মা, আমি সব ঠিক করে নেবো। আমি ছেলের মা; আমার ছেলেকে যে বাঁচিয়েছিল তাকে আমাকে বাঁচাতে দাও।

রাজবালার সমস্ত চেহারায় ও কথায় এমন একটা অসাধারণ দৃঢ়তা ও আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল যে তাহার মা আর তাহাকে বারণ করিতে পারিলেন না, শুধু বলিলেন—কি জানি বাছা এ সব তুই কি করছিস। কি অলক্ষণ যে আগাগোড়া লেগেছে! শেষে যে কি সর্ব্বনাশ হবে কিছু বুঝতে পারছিনে।

রাজবালা ক্ষুব্ধ ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—অর্থ দেখে তুমি মেয়ে বেচতে চেয়েছিলে, আমার সুখের দিকে ত চাওনি মা, এখন সর্ব্বনাশের ভয় করলে কি হবে। সুখ গেছে, এখন ধর্ম্ম রাখতে দাও। সব গিয়েও ধর্ম্ম যদি থাকে তবে সর্ব্বনাশ হবে না।

রাজবালা মায়ের আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজবালার মা অনির্দ্দেশ্য অমঙ্গলের আশঙ্কা বক্ষে বহিয়া বন ছাড়িয়া রওনা হইলেন।

তখন জেলেরা বসিয়া স্বরচিত গানে রাজবালার স্বামী হংসেশ্বর-দারোগারই উদ্দেশে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া চাপা গলায় গাহিতেছিল—

পেঁচার পরামর্শ শুনে হংস বেচারা
প্রাণে বুঝি যায় মারা রে যায় মারা!

রাজবালাকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া গান থামাইয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাজবালা গিয়া বীরেন্দ্রের শয্যার শিয়রে সন্তর্পণে বসিল। বীরেন্দ্র চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। রাজবালা আস্তে আস্তে তাহার কপালে হাঁত দিল। বীরেন সেই স্পর্শে আরাম বোধ করিয়া বলিল—আঃ!

রাজবালা জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছ?

বীরেন চমকিয়া "রাজু!" বলিয়া চোখ মেলিয়া মাথা তুলিয়া তাহার দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

রাজবালা বলিল—অমন করে তাকাচ্ছ কেন, আমি তোমার সেবা করতে এসেছি।

বীরেন মাথা বিছানায় রাখিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। রাজবালা এক হাত তাহার কপালে রাখিয়া আর-এক হাতে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বীরেন বলিল—আমার মনে

হচ্ছিল আমি বিকারের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি। তুমি এসেছ!......তোমার আসা ভালো হয়নি রাজু! আমার জন্যে যদি তোমার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় তবে......তবে এখন তোমার আসাতে আমার যে আনন্দ তা চিরকাল আমাকে তিরস্কার করবে!

রাজবালা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—তবে কি আমি ফিরে যাবো?

বীরেন আবার চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল—না এলেই ভালো করতে। এসেছ যখন তখন অনিষ্ট যা হবার হয়ে গেছে......এখনি তুমি চলে যেয়ো না, একটু পরে যেয়ো।

বীরেন্দ্রের শেষ কথায় এমন অসহায়ের বেদনা-ভরা মিনতি বাজিল যে রাজবালা গভীর মমতায় তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরম স্নেহের সহিত বলিল—আমি তোমার ভালো করে তুলে তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবো।

বীরেন আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজবালার কোলের কাছে মাথাটিকে সরাইয়া গুঞ্জনের মতন অস্ফুট স্বরে বলিল—মনে পড়ে রাজু, আমি মধ্য-অন্বেষার ছুতো করে তোমার কাছে লুকিয়ে থেকে কি লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলাম! তুমি কি তারই শোধ দিতে এসেছ! তোমার বিয়ের দিনে আমি হাতকড়ি পরেছিলাম; এবার আবার স্বেচ্ছায় হাত-কড়ি পরে তোমার স্বামীর পায়ে ধরে তোমার মিলন ঘটিয়ে দিয়ে যাবো, তুমি কিছু ভয় কোরো না!

রাজবালা বীরেনের মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া পরম স্নেহে কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে দৃঢ়তার সহিত বলিল—তোমার হাতে হাতকড়ি পড়তে দেবো না বলেই ত আমি এসেছি—

বীরেন আর কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না, রাজবালার স্পর্শ ও তাহার কথার মাদকতার নেশায় সে অভিভূত হইয়া শুধু রাজবালাকেই অনুভব করিতেছিল, আর কিছু নয়।

সমস্ত দিন এইভাবে কাটিল। সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল। শশী আসিয়া ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল।

রাজবালার মা খোকাকে লইয়া নিজের বাড়ীতে যাইতে পারেন নাই, মেয়ের আচরণ দেখিয়া তাঁর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছিল, আর জামাই যখন জানিতে পারিয়া ভাবিবে যে এতে তাঁরও যোগসাজুস ছিল তখন মেয়েকে বাঁচানো কঠিন হইবে ভাবিয়া তাঁহার মনের মধ্যে ছমছম করিতেছিল। তিনি কাৎলামারীতে ফিরিয়া গিয়া জামাইকে খবর দিলেন তাঁর কন্যা কি কাণ্ড করিয়াছে। তাঁর কাছে ফেরারী আসামীদের সন্ধান পাইয়া রাগে আর খুসীতে উৎসাহিত হইয়া হংসেশ্বর আসামীদের সঙ্গে রাজবালাকে গেরেপ্তার করিতে ছুটিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে হংসেশ্বর-দারোগা বনের ধারের কামরাঙা-গাছের উপরে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। পোড়ো বাড়ীতে আলো জ্বলিতে দেখিয়া তাহারই অনুসরণ করিয়া আসিয়া হংসেশ্বর দরজায় ঘা মারিয়া বলিল—ঘরে কে আছ দরজা খোল।

তাহার স্বর চিনিয়া রাজবালা হাতের তাড়নায় তৎক্ষণাৎ প্রদীপটি নিবাইয়া দিল!

তারপর কি হইয়াছিল তাহা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে জানিয়াছি।

(৫০)

হংসেশ্বর বীরেনকে আনিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়াছে; রাজবালা হাতীকান্দা হইতে ডাক্তার ডাকাইয়া তাহার চিকিৎসা করাইতেছে; নিজে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার সেবা করিতেছে।

হংসেশ্বর জেলেদের জেলায় চালান করিয়া দিয়াছে, রাজবালার ভয়ে

সে বীরেন্দ্রকে চালান দিতে পারে নাই। ইহাতে তাহার মনে সুখ ছিল না—বীরেন্দ্রকে বাড়ীতে রাখিয়া সে দুই রকমের অস্বস্তি ভোগ করিতেছিল; এক, রাজবালা যেরূপ একাগ্রতার সহিত তাহার সেবা করিতেছিল তাহা তাহার ভালো লাগিতেছিল না; আর, বীরেন্দ্রকে বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়ার কথা গুণময় টের পাইলে ক্রুদ্ধ হইবেন ও আসামীকে বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়ার কথা ম্যাজিষ্ট্রেট জানিতে পারিলে তাহার চাকরীটি ত যাইবেই, অন্যরকম বিপদেও পড়িতে হইতে পারে!

চারপাঁচ দিন পরে বীরেন্দ্র অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল, এখন সে উঠিয়া অল্প অল্প চলিতে পারে।

এই কয়দিন নিরন্তর পরিশ্রমের পর বীরেনকে সুস্থ দেখার আনন্দে রাজবালা দুপুর বেলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; তাহার মুখে সন্তোষের স্মিত আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

তাহা দেখিয়া হংসেশ্বর শিকার ধরিবার সময় বিড়ালের মতন পা টিপিয়া-টিপিয়া বীরেন্দ্রের ঘরে আসিয়া চাপা গলায় বলিল—কাপুরুষ কোথাকার! মেয়েমানুষের আঁচল ধরে আত্মরক্ষা করতে লজ্জা করে না?

বীরেন্দ্র এই তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া মুখ লাল করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

হংসেশ্বর তাড়াতাড়ি বলিল—চুপ! গোল করো না। যদি এ না চাও যে রাজবালাকে আমি বাড়ী থেকে দূর করে দি, তা হলে এইবেলা চুপিচুপি আমার সঙ্গে বেরিয়ে এস—রাজবালা এখন ঘুমুচ্ছে।

বীরেন্দ্র কিছু না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

হংসেশ্বর বলিল—দাঁড়াও, দেখে আসি।

হংসেশ্বর পা টিপিয়া-টিপিয়া বাহির হইয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল

রাজবালা তখনো তেমনি ঘুমাইতেছে। হংসেশ্বর [illegible]হানি দিয়া বীরেনকে ডাকিল। বীরেন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

বীরেন যাইতে যাইতে একবার রাজবালার [illegible] মূর্ত্তির অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া লইল। গাঢ় নিদ্রার গভীর নিশ্বাসে তাহা[illegible] বক্ষ ছন্দে তালে ওঠা-নামা করিতেছিল, তাহার মুখে হাসির আভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

হংসেশ্বর বীরেনকে বাহিরে লইয়া গিয়াই বাহিরের দরজায় শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

একখানা গরুর গাড়ী প্রস্তুত ছিল; হংসেশ্বর বলিল—দেরী নয়, গাড়ীতে ওঠ। বীরেন ও হংসেশ্বর নিঃশব্দে গাড়ীতে উঠিল। হংসেশ্বরের সঙ্গে তাহার দারোগার উর্দ্দি আর গুলিভরা রিভলভারও গাড়ীতে উঠিল, এবং গাড়ী ঘিরিয়া চলিল আটজন কনষ্টেবল, ভরা বন্দুক ঘাড়ে করিয়া; হংসেশ্বরের ভয় হইতেছিল পাছে গাঁয়ের লোক বীরেনকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লয়!

রাজবালার যখন ঘুম ভাঙিল তখন একেবারে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাজবালা চোখ চাহিয়াই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া নিজের মনেই হাসিয়া বলিল—ওমা! একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বীরেনকে বিকেল বেলা কিছু খেতেও দেওয়া হয়নি।

সে আপনার এই বিশ্রাম সুখের জন্য মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গেল; উনানের ছাই ঢাকা আগুন একটু উসকাইয়া দিয়া দুধ গরম করিতে দিল; একখানা রেকাবীতে কিছু ফল সন্দেশ সাজাইয়া তাহার উপর একপাশে গরম দুধের বাটী বসাইয়া এক হাতে লইল ও অপর হাতে এক গেলাস জল লইয়া বীরেনের ঘরে গেল।

ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল বীরেন নাই। সে একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া

চারিদিকে তাকাইয়া খাবার ও জল সেইখানে নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে আসিল। বারান্দায় উঠানে ঘরে ঘরে খুঁজিল, বীরেন নাই। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল—হয়ত বা বীরেন না বলিয়া তাহার নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছে। রাজবালা মাকে আর খোকাকে জিজ্ঞাসা করিল; তাহারা ঘুমাইতেছিল, তাহারা কিছু জানে না। রাজবালা বাড়ীর চাকরকে ডাকিল—কালো কালো, ও কেলো!—কেহ উত্তর দিল না। রাজবালা ছুটিয়া দেখিতে গেল বাহির-বাড়ীতে বীরেন বা হংসেশ্বর বা কালো আছে কি না। বাহির-বাড়ীতে যাইবার দরজা বাহির হইতে বন্ধ! রাজবালা দরজা টানাটানি করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—কালো, কালো, ওরে কালো!—কেহ কোনো সাড়া দিল না। রাজবালা মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার মন অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় তোলপাড় করিতেছিল।

খানিকক্ষণ পরে ঝনাৎ করিয়া শিকল খোলার শব্দ হইল। রাজবালা দাঁড়াইয়া উঠিল। দরজা খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল কালো।

রাজবালা তাহাকে দেখিয়া সমস্ত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ ক্রোধে পরিণত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এতক্ষণ কোথায় ছিলি বাঁদর!

—আজ্ঞে আমি কেন বন্ধ করবো? বাবু নিজে বন্ধ করে দিয়ে গেছে।

—এতক্ষণ ডাকাডাকি করছি শুনতে পাস না, দরজা খুলছিলিনে কেন?

—সাতটার আগে দরজা খুলতে বাবুর মানা ছিল।

রাজবালা ক্রোধে তীব্র উচ্চ স্বরে বলিল—তোদের বাবু কোথায়?

কালো ঢোক গিলিয়া বলিল—বাবু ঠাকুরকে নিয়ে জেলায় চলে গেছে।

রাজবালা আকাট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাগে অভিমানে, আপনার অসাবধান ঘুমের জন্য পরিতাপে তার কান্না পাইতেছিল।

অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া। বীরেন নিজে ও জেলেরা সকলেই বলিয়াছে বীরেন দাঙ্গার মধ্যে ছিল না, বীরেন তাহাদের দাঙ্গা করিতে উত্তেজিত করে নাই, বা তাহার আদেশে পঞ্চাননের কান কাটা হয় নাই। কিন্তু পঞ্চানন প্রভৃতি জমিদার-পক্ষের সাক্ষীরা ও হংসেশ্বর প্রভৃতি পুলিশ-পক্ষের সাক্ষীরা বীরেনকেই মুল সর্দার বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। অধিকন্তু হংসেশ্বর ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইল যে বীরেন স্বদেশীব্রত প্রচার করে, অবৈতনিক পাঠশালা করিয়া চাষামজুরদের লেখাপড়া শেখায়, কথকতা করিয়া রাজদ্রোহ সঞ্চার করে, নিজে সংসারী হয় নাই এবং একবার দাঙ্গা করার জন্য তাহার দশ বৎসর দ্বীপান্তর হইয়াছিল। বীরেন হংসেশ্বরের সমস্ত কথাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিল, কেবল স্বীকার করিল না সে রাজদ্রোহী। তাহা স্বীকার না করিলেও যে লোক সংসারী না হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে দরিদ্রদের শিক্ষা-দীক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে এবং স্বদেশীব্রত যাহার লক্ষ্য সে ব্যক্তি যে প্রজাদিগকে জমিদার ও পুলিশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দাঙ্গা বাধাইয়াছিল সে বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের একরকম দৃঢ় ধারণা হইয়া উঠিয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের মনের ভাব বুঝিয়া বীরেন্দ্রের উকিল ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিবেদন করিল—আমাদের উপস্থিত সাক্ষীর কথায় আসামীর নির্দোষিতা যখন পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে না, তখন আদালতে অনুমতি [illegible] আমি আর-একজন সাক্ষী উপস্থিত করি—যার দ্বারা নিঃসংশয়ে আসামীর নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যাবে।

গুণময় রায়ও মোকদ্দমা দেখিতে আদালতে আসিয়া একপাশে চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। তিনি ও হংসেশ্বর উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন; পঞ্চানন বেচারার কান ছিল না বলিয়া সে উৎসুক হইয়াও উৎকর্ণ হইতে পারিল না। বীরেন্দ্রও কৌতূহলী হইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল,

এ আবার কে নূতন সাক্ষী তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে আসিতেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষী আনিতে হুকুম দিলেন।

উকিল বাহিরে গিয়া একটি অবগুণ্ঠিতা তরুণী মহিলাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। আদালত স্তব্ধ।

মহিলাটিকে দেখিয়াই বীরেন বলিয়া উঠিল—রাজবালা!

তাহার কথা শুনিয়া হংসেশ্বর ঢেলা-ঢেলা চোখ ঠেলিয়া বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল—অ্যাঁ রাজু!

গুণময় ও পঞ্চানন ঠাহর করিয়া দেখিয়া বলিল—রাজু বলেই ত মনে হচ্ছে।

রাজবালা সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখের ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল। তারপর অসঙ্কোচ দৃপ্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিল—হুজুর, আমি দারোগার স্ত্রী, গুণময়-বাবুর শালী। এঁরা আক্রোশ করে নির্দ্দোষকে বারবার বিপন্ন করছেন। তার কতক প্রমাণ আমার স্বামীর এই চিঠিতে পাওয়া যাবে······

হংসেশ্বর বাড়ী হইতে চুরি করিয়া বীরেনকে লইয়া যাওয়ার পর রাজবালাকে যে চিঠি লিখিয়াছিল রাজবালা সেই চিঠিখানি ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়া বলিল—যদি এতেও বীরেন্দ্রের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ না হয়, তবে আমি আর আমার স্বামী দোষীকে ছ দিন বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছিলাম, আমরাও তা হলে দণ্ডনীয়।

হংসেশ্বর মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া গলগল করিয়া ঘামিতে ঘামিতে ঘটঘট করিয়া ঘন ঘন ঢোক গিলিতেছিল আর তাহার কণ্ঠাটা তাড়াতাড়ি উঠানামা করিতেছিল।

বীরেন্দ্র বিস্ময়পুলকে অবাক হইয়া রাজবালার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

রাজবালা কাঠগড়া হইতে নামিয়া মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া দিল।

উকিল বলিল—আদালতের অনুমতি হলে আমি আর একটি সাক্ষী হাজির করি।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কৌতূহল অতিমাত্রায় জাগ্রত হইয়াছিল, তিনি অনুমতি দিলেন। উকিল আবার বাহির হইয়া গেল।

আবার আদালত স্তব্ধ। সকলেই ভাবিতেছিল আবার কে আসিবে?

উকিলের সঙ্গে একজন ঝিয়ের হাত ধরিয়া আদালতে প্রবেশ করিল একটি নিরাভরণা শুক্লাম্বরা ষোড়শী বিধবা!

সকলেই অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, কেহই তাহাকে চিনে না।

তরুণী বিধবা কাঠগড়ায় উঠিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দাঁড়াইল।

বীরেন বলিয়া উঠিল—মায়া! আহা মায়া বিধবা হয়েছে!

গুণময় চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—মায়া, তোর এ বেশ কেন, তুই এখানে কেন?

মায়া সেসব কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—আমার নাম মায়া, আমি জমিদার গুণময় রায়ের মেয়ে, বিলাসপুরের জমিদারের স্ত্রী।

আমার স্বামী হঠাৎ পীড়িত হয়ে অল্প কয়েক দিন পরেই মারা গেছেন; আমার বাবা তা জানতেন না, তিনি আমার স্বামীকে জীবিত মনে করে এই পত্র লিখেছিলেন; তার মধ্যে তিনি লিখছেন—বীরেনটা আমায় যেমন রাজবালা থেকে বঞ্চিত করেছে, হংসা দারোগাটা যেমন আমার হাত থেকে রাজবালাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তেমনি আমি কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার করছি; হংসাকে লেলিয়ে দিয়েছি বীরেনের পিছে, বীরেনের দাঙ্গার দায়ে জেল হবে নির্ঘাত; আর হংসাটাও হিংসার বিষে জ্বলে মরবে। পেঁচোর কান দুটো কাটা গেছে, তার জন্যে দুঃখ নেই, সে ত চিরকাল দুকান-কাটাই ছিল…